হুমায়ুন আজাদ

সীমাবদ্ধতার সূত্র

আগামী প্রকাশনী

ভূমিকা

একটি তাত্ত্বিক, এবং কয়েকটি সাহিত্যিক ও ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো *সীমাবদ্ধতার সূত্র*-এ। প্রবন্ধগুলো গত চার-পাঁচ বছরে বিভিন্ন পত্রিকায় বেরিয়েছিলো; কোনো কোনোটি, প্রকাশের আগে, উপস্থাপিত হয়েছিলো আলোচনা সভায়। 'সীমাবদ্ধতার সূত্র' উপস্থাপিত হয়েছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্রে—*মানববিদ্যা বক্তৃতারূপে* [৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১], 'কবিতা ও রাজনীতি' এবং 'বাঙলাদেশের কবিতার প্রগতিশীল ও প্রগতিবিরোধী ধারা' পড়েছিলাম জাতীয় কবিতা পরিষদের ১৯৮৮ ও ১৯৮৯র উৎসবে, 'বাঙলা গদ্যচর্চা ও বিদ্যাসাগর' পড়া হয়েছিলো বিদ্যাসাগরের মৃত্যুশতবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলা একাডেমীর সভায় [৫ অক্টোবর ১৯৯১], এবং 'বাঙলা ব্যাকরণ রচনার সমস্যা' পড়েছিলাম বাংলা একাডেমীর একুশের সভায় [১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২]। এর মধ্যে দুটি কাজ করেছিলো অনিচ্ছুক বিস্ফোরকের মতো : 'কবিতা ও রাজনীতি'তে নজরুল সম্পর্কে আমার একটি মন্তব্যকে বিকৃতভাবে দেশ জুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছিলো তখনকার অবৈধ একনায়ক রাষ্ট্রপতি, মৌলবাদীদের লাগিয়ে দিয়েছিলো আমার বিরুদ্ধে; এবং পরের বছর 'বাঙলাদেশের কবিতার প্রগতিশীল ও প্রগতিবিরোধী ধারা' প্রবন্ধটি জাতীয় কবিতা উৎসবের মঞ্চেই বিস্ফোরণ ঘটায়, মঞ্চে অশৈল্পিক আক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে, এবং আমি ছেড়ে দিই কবিতাবিরোধী জাতীয় কবিতা পরিষদ। কয়েকটি প্রবন্ধ লেখা হয়েছিলো পুস্তক সমালোচনারূপে, তবে সেগুলো পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ। 'বাংলা একাডেমীর বই : নকল, ভুল, ও বিকৃত অনুবাদের উৎসব' প্রবন্ধটি লিখতে বাধ্য হয়েছিলাম আমি, যখন এক অসৎ চক্র সংঘবদ্ধ চক্রান্তে মিলেছিলো আমার বিরুদ্ধে। প্রবন্ধটি তাদের ওপর পড়েছিলো বজ্রপাতের মতো, তারা আর প্রকাশ্যে মাথা তোলে নি, যদিও তাদের নিঃশব্দ কর্মসূচি নিরবচ্ছিন্নভাবে চলছে আমার বিরুদ্ধে। 'বাঙলা ব্যাকরণের রূপরেখা : একটি প্রস্তাব' নামেও একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম আমি, সেটি গ্রন্থিত হলো না; কেননা 'বাঙলা ব্যাকরণ রচনার সমস্যা' প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে ওই প্রবন্ধটিকে সংস্কার ক'রেই। তবে ওই প্রবন্ধটি ব্যাকরণ-উৎসাহীদের কাছে আকর্ষণীয় মনে হ'তে পারে।

হুমায়ুন আজাদ

১৪ই ফুলার রোড
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা
৮ জানুয়ারি ১৯৯৩ : ২৫ পৌষ ১৩৯৯

সূচিপত্র

সীমাবদ্ধতার সূত্র ১৩
কবিতা ও রাজনীতি ২৪
বাঙলাদেশের কবিতার প্রগতিশীল ও প্রগতিবিরোধী ধারা ৩১
শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা ৪০
ধ্বনিপ্রতীকতা ও কবিতা ৫৩
জীবন ক্রমশ ও *মায়ের কাছে যাচ্ছি* : আত্মজীবনী ও আত্মজৈবনিক উপন্যাস ৬২
বাঙলা গদ্যচর্চা ও বিদ্যাসাগর ৬৮
মানুষের ভাষা ৮০
মান বাঙলা উচ্চারণ ও উচ্চারণ অভিধান ১০৪
বাংলা একাডেমীর বই : নকল, ভুল, ও বিকৃত অনুবাদের উৎসব ১১৯
বাঙলা ব্যাকরণ রচনার সমস্যা ১৪৯

সীমাবদ্ধতার সূত্র

সীমাবদ্ধতার সূত্র

শ্রদ্ধেয় সভাপতি ও সুধীমণ্ডলি, আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষের প্রতি আমাকে আপনাদের সামনে কিছু বলার সুয়োগ দেয়ার জন্যে। একে আমি সুযোগ ব'লেই গ্রহণ করতে চাই; আর এটি যেহেতু বক্তৃতা—গবেষণামূলক মূল্যবান প্রবন্ধ নয়, তাই আমি নিতে চাই অবাধ স্বাধীনতা, অন্তত যতোটুকু আমার দরকার; অর্থাৎ বিপুল অজানা অনাবিষ্কৃত তথ্য, অসংখ্য উৎসনির্দেশ ও সম্ভ্রমজাগানো পাদটীকাকে অস্বীকার ক'রে আপনাদের সামনে আমি প্রকাশ করতে চাই এমন কিছু বোধ, উপলব্ধি, পর্যবেক্ষণ, যা আমাকে আলোড়িত করছে অনেক দিন ধ'রে। তবে আমি বিব্রত বোধ করছি একথা ভেবে যে আমার ভাবনাবেদনা হয়তো আপনাদের সামান্যও আলোড়িত করবে না। এমনও হ'তে পারে, এবং হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি যে আমি যাকে বলেছি আমার বোধ, উপলব্ধি, পর্যবেক্ষণ, তা খুবই তুচ্ছ—প্রকাশ্যে আলোচনারও অযোগ্য; বা এমনও হ'তে পারে চল্লিশ পেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আমি অর্জন করি নি কোনো তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা, পৌঁছোতে পারি নি কোনো গুরুত্বপূর্ণ বোধ বা উপলব্ধিতে; কোনো দিন পৌঁছোবো কিনা সে-সম্পর্কেও হয়তো সন্দেহ রয়েছে। তবুও আমি অনুপ্রাণিত বোধ করছি মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্রের আমন্ত্রণে, এবং আপনাদেরই আমি গণ্য করছি সে-নির্বাচিত প্রাজ্ঞ সুধীমণ্ডলি, যাঁদের সামনে অবলীলায় প্রকাশ করা চলে অজ্ঞতা। দু-দশকেরও বেশি সময় ধ'রে আমি জড়িয়ে আছি, বেশ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছি দুটি প্রক্রিয়ার সাথে, যাদের বলতে পারি সৃষ্টি ও বিশ্লেষণ। আপনারা যাঁরা ব্যর্থদেরও উপেক্ষা করেন না, তাঁদের কেউ কেউ হয়তো জানেন আমি কিছু সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছি, অর্থাৎ কিছু কবিতা লিখেছি; এবং বিশ্লেষণ করেছি কিছুটা, অর্থাৎ কবিতা ও আরো কিছু কিছু ব্যাপারের সূত্র উদঘাটনের ব্যর্থ সাধনা করেছি; এবং বাঙালির সৃষ্টি ও বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া দুটির কিছু সংবাদ রাখার চেষ্টা করেছি। সৃষ্টি ও বিশ্লেষণ দু-ই আমাকে আকর্ষণ করে; আমি বিশ্বাস করি মানুষ সৃষ্টিশীল ও বিশ্লেষণপরায়ণ। মানুষ অভাবিত সৃষ্টির প্রতিভা ধারণ করে, এবং তার রয়েছে সে-মেধা, যা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করতে পারে সমস্ত প্রপঞ্চ। মানুষের সৃষ্টি ও বিশ্লেষণের কেন্দ্র তার মস্তিষ্ক, যার দু-অংশ পালন করে পরিপূরক দু-দায়িত্ব : তার একভাগ স্রষ্টা, আরেক ভাগ বিশ্লেষক বা ভাষ্যকার। মানবপ্রজাতির কোনো কোনো সদস্যের সৃষ্টিশীলতা বেশি, তারা হয় স্রষ্টা—উদ্ভাবন করে অভিনব সামগ্রী; আর কোনো কোনো সদস্যের বিশ্লেষণশীলতা বেশি, তারা হয় বিশ্লেষক বা ভাষ্যকার;—তারা আপাতাবোধ্য প্রপঞ্চের গোপন সূত্র উদঘাটন ক'রে প্রকাশ করে অদৃশ্য সত্য। সৃষ্টি ও বিশ্লেষণের কেন্দ্র যদিও মস্তিষ্ক, তবু আমি ভাবি সৃষ্টি ও বিশ্লেষণের আরেকটি কেন্দ্রের কথা, যাকে বলতে পারি *দ্বিতীয় মস্তিষ্ক*, যার সহায়তা ছাড়া মূলকেন্দ্রটি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। মানুষের দ্বিতীয় মস্তিষ্ক

তার সমাজ। আমার ভাবনায় বার বার ফিরে ফিরে আসে বাঙালির সৃষ্টি ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া দুটির কথা; এবং আমি বার বার হতাশ হই।

বাঙালি কি মৌলিক সৃষ্টা, বাঙালি কি মৌলিক বিশ্লেষক—এমন প্রশ্ন জাগে আমার মনে; আমার বিশ্বাস এমন প্রশ্নে পীড়িত হন আপনারাও। অন্যান্য জাতির মতো বাঙালিও সৃষ্টি করছে, বিশ্লেষণ করছে; তবে ওই সৃষ্টি ও বিশ্লেষণ কতোটা মৌলিক, কতোটা মূল্যবান? বাঙালির এখনকার সৃষ্টি ও বিশ্লেষণের এলাকা দুটি ঘেঁটে এর উত্তর পেতে পারি আমরা, বা ইচ্ছে হ'লে একটু পেছনেও যেতে পারি; খুব বেশি পেছনে যাওয়ার দরকার নেই, গত দু-এক শতক ধ'রে খুঁজতে পারি এর উত্তর, পৌঁছোতে পারি সিদ্ধান্তে। যদি মৌলিক স্রষ্টা ও বিশ্লেষক হয় বাঙালি, তাহলে খুঁজতে পারি তার কারণ; আর যদি তা না হয়, তারও কারণ খুঁজতে পারি। সৃষ্টিশীলতা ও বিশ্লেষণের সব এলাকাকেই নিতে পারি আমরা উপাত্ত হিশেবে; —সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রকলাকে যেমন নিতে পারি, তেমনি নিতে পারি দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, এমনকি হিশেব ও ব্যবস্থাপনাবিদ্যাকে; নিতে পারি প্রকৃত বিজ্ঞানগুলোকে —গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতি, এবং বিচার করতে পারি এসব এলাকায় বাঙালির সৃষ্টিশীলতার স্বরূপ। আপনারা অনেকেই রয়েছেন, যাঁরা এসব বিদ্যার গভীর সংবাদ রাখেন; কিন্তু আমি যতো অসম্ভব অভিলাষই পোষণ করি না কেনো, এসবে আমার কোনো অধিকার নেই। যেমন, পদার্থবিদ্যায় বাঙালির মৌলিক অর্জন সম্পর্কে আমার অজ্ঞতা কখনো ঘুচবে না, এমনকি সঙ্গীত বা নৃত্য সম্পর্কেও আমার জ্ঞান মূঢ়েরই সমান; এবং আমার নিজের যে এলাকা—ভাষা ও সাহিত্য—তাও যে আমার একান্ত অধিকারে, এমন দাবিও কখনো ক'রে উঠতে পারবো না। অর্থাৎ বিনয় নয়, অজ্ঞতাই আমার অসামান্য; তবু আমি বাঙালির সৃষ্টি ও বিশ্লেষণ সম্পর্কে আমার পর্যবেক্ষণ উপলব্ধি পেশ করতে চাই আপনাদের সামনে। সবাই জানে দেবতারা যেখানে ভয় পায় নির্বোধেরা সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আর নির্বুদ্ধিতায় আমার সমমাপের কাউকে পাওয়া যাবে না বাঙলায়। যা আমি বলতে চাই, তার নাম দিয়েছি *সীমাবদ্ধতার সূত্র*। এখনকার, ও গত দু-শো বছরের বাঙালির সৃষ্টি ও বিশ্লেষণ কিছুটা নেড়েচেড়ে আমার মনে হয়েছে বাঙালি খুবই সীমাবদ্ধ;—সীমাবদ্ধ তার সৃষ্টিশীলতা, সীমাবদ্ধ তার বিশ্লেষণশীলতা। ভাষা ও সাহিত্য অবলম্বন ক'রেই এমন ধারণায় পৌঁচেছি আমি; যদি অন্যান্য এলাকা অবলম্বনের অধিকার আমার থাকতো, তাহলেও হয়তো পৌঁছোতাম একই বেদনাদায়ক সিদ্ধান্তে। বাঙালি, গত দু-শো বছরে, সৃষ্টি ও বিশ্লেষণে পরিচয় দেয় নি কোনো মৌলিকতার, বাঙালি উদ্ভাবন করে নি কিছু। তার সৃষ্টি ও বিশ্লেষণশক্তি বড়োই সীমাবদ্ধ, সাধারণত পরনির্ভর; বাঙালি নিজে কিছুর সূচনা করে না, করে অন্যদের অনুসরণ বা অনুকরণ। বাঙালির গত দু-শো বছরের সৃষ্টি ও বিশ্লেষণের ইতিহাস হচ্ছে সীমাবদ্ধতা ও অনুকরণের ইতিহাস। আমি এর কিছুটা পরিচয় তুলে ধরবো, চেষ্টাও করবো এর কারণ খোঁজার, যদিও বাঙালির সীমাবদ্ধতার সূত্র হয়তো আমি সুষ্ঠুভাবে রচনা ক'রে উঠতে পারবো না।

আমার পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত হবে প্রধানত ভাষা ও সাহিত্যনির্ভর; তবে সৃষ্টি ও বিশ্লেষণের অন্যান্য এলাকাগুলো সম্পর্কেও শুরুতেই সন্দেহ প্রকাশ ক'রে নিতে চাই, কেননা আমার ধারণা অন্যান্য এলাকায় সীমাবদ্ধতা আরো বেশি। উনিশবিশশতকে জ্ঞানের বিভিন্ন এলাকায় দেখা দিয়েছে যে-সব চিন্তা, প্রস্তাবিত হয়েছে যে-সব তত্ত্ব, যেগুলো আমাদের নিয়ন্ত্রণ করছে প্রত্যক্ষপরোক্ষভাবে, তার কোনোটিই বাঙালির নয়। সাধারণ ঘটনা হচ্ছে পশ্চিম কোনো তত্ত্ব প্রস্তাব করে, উদ্ভাবন করে নানা প্রণালিপদ্ধতি, আমরা তার সাথে পরিচিত হই কয়েক দশক পরে; এবং তার প্রয়োগ করতে থাকি নানাস্থলে, যখন হয়তো পশ্চিম সে-সব ছেড়ে এগিয়ে গেছে উৎকৃষ্টতর তত্ত্ব ও প্রণালিপদ্ধতির দিকে। যে-সব বিদ্যা বর্ণনাধর্মী, সেখানে বাঙালি কোনো তত্ত্ব আশ্রয় ক'রে বা না-ক'রে বর্ণনার পর বর্ণনা দিয়ে থাকে, সৃষ্টি করে বর্ণনাস্তূপ, যদিও অধিকাংশ সময় ওই বর্ণনা থেকে মূল্যবান কোনো সত্য বেরিয়ে আসে না। বাঙালির স্বভাবে রয়েছে পুনরাবৃত্তি ও বর্ণনাধর্মিতা, তার নেই মৌলিক তত্ত্ব সৃষ্টির প্রবণতা, যদিও সৃষ্টি ও বিশ্লেষণের এলাকায় তত্ত্বই মূল্যবান। একটি গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব হাতের কাছে পেয়ে গেলে সেটিকে একটু এদিক সেদিক ক'রে উপাত্ত বর্ণনা করা সম্ভব যে-কারো পক্ষে। আমাদের বর্ণনাধর্মী বিদ্যাগুলোতে পাই পশ্চিমা তত্ত্বের বিমর্ষ প্রয়োগ, অনের সময় তার প্রয়োগও সুষ্ঠু হয় না। আর যে-সব বিদ্যা বর্ণনাধর্মী নয়, উদ্ভাবনধর্মী, সেগুলোতে আমরা বর্ণনারও সুযোগ পাই না, উদ্ভাবন তো অসম্ভব। তাই আমাদের বিশ্লেষণের এলাকাগুলো পশ্চিমের বিভিন্ন ধারণা, তত্ত্ব, ও প্রণালির অনুকরণে শ্রান্ত; সেখানে কোনো প্রাণবন্ততা বা সজীবতা নেই, যেহেতু প্রাণবন্ততা ও সজীবতার জন্যে দরকার মৌলিকতা। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আমরা যা-কিছুর চর্চা করছি, লিখে চলছি যে-সব সন্দর্ভ ও অভিসন্দর্ভ, সেগুলো প্রত্যক্ষ কল্যাণে আসছে শুধু রচয়িতাদের : প্রণেতারা সেগুলো দেখিয়ে পাচ্ছেন নানা ধরনের প্রতিষ্ঠা, কিন্তু সেগুলোর আন্তর মূল্য খুবই কম।

উনিশ ও বিশশতকের সাহিত্যে দেখতে পাই বাঙলা সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ লেখক পশ্চিম থেকে নিয়েছেন সাহিত্যের মৌলিক ধারণাগুলো;—মহাকাব্যের ধারণা পেয়েছেন তাঁরা পশ্চিমে, উপন্যাসের ধারণাও পেয়েছেন পশ্চিমে, নাটক, প্রবন্ধ, ছোটগল্প প্রভৃতির ধারণাও পেয়েছেন পশ্চিমে। শুধু তাই নয়, তাঁরা পশ্চিমের অনেক রচনার অনুকরণ করেছেন সরাসরি, অনুবাদ করেছেন স্তবকে স্তবকে; বর্ণনা ধার করেছেন, উপমাউৎপ্রেক্ষাচিত্রকল্পও নিয়েছেন, বা সেগুলোকে নতুন রূপে সৃষ্টির কৌশল শিখেছেন পশ্চিমের লেখকদের কাছে। তাঁরা যে-সব বক্তব্য পেশ করেছেন, তা অনেক আগেই প্রকাশ পেয়েছে পশ্চিমের লেখকদের রচনায়। যাঁরা পশ্চিম থেকে নিয়েছেন, তাঁরাই হয়ে উঠেছেন প্রধান লেখক, তাঁরাই বদলে দিয়েছেন বাঙলা সাহিত্য ও বাঙালির মনোজগত; আর যাঁরা নেন নি, বা নেয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন নি, তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। আধুনিক বাঙলা সাহিত্য পশ্চিমের দান, যদিও লেখকেরা বাঙালি, তাঁদের বিষয় বাঙালির বাস্তব ও স্বপ্ন। উনিশশতকের প্রথমার্ধের দিকে তাকালে ধরা পড়ে যে এ-সময় কোনো মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টি হয় নি।

তখন চারদিকে কর্মীরা কাজ ক'রে চলছেন, সমাজ বদলে দিচ্ছেন, গদ্য তৈরি করছেন, পত্রিকা প্রকাশ করছেন; কিন্তু কোনো মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে না। কারণ তখন বাঙালির সাহিত্যসৃষ্টির যে-সহজাত প্রতিভা ছিলো, তা বন্ধ্যা হয়ে পড়েছে; তার শক্তি ছিলো না নতুন কালের উপযুক্ত কিছু সৃষ্টির। আর পশ্চিম থেকে ঋণ নিয়ে ঋদ্ধ হবেন যাঁরা, সমৃদ্ধ করবেন সাহিত্যকে, তখন তাঁরা জন্ম নিচ্ছেন, বাল্যকাল অতিবাহিত করছেন। উনিশশতকের প্রথমার্ধের একমাত্র কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত; তাঁর কবিতার মূল্য যতোটা ঐতিহাসিক, ততোটা কাব্যিক নয়। ঈশ্বর গুপ্ত কিছুটা নিয়েছিলেন পশ্চিম থেকে, কিন্তু সরাসরি নিতে পারেন নি, নিয়েছিলেন পরিবেশ থেকে; এবং যা লিখেছিলেন, তা অতীতের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের জন্যে অনেকটা ব্যগ্র হ'লেও নতুনকে সৃষ্টি করতে পারে নি। উনিশশতকের প্রথমার্ধে দেখতে পাই বাঙালির সহজাত মৌলিকতাও নিঃশেষ হয়ে গেছে; ওই মৌলিকতায় যা সৃষ্টি হ'তে পারে, তার মূল্য প্রায় নেই। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তকে খাঁটি বাঙালি কবি বলেছিলেন, খাঁটিত্বের প্রশংসাও করেছিলেন; এবং এও ঘোষণা করেছিলেন যে খাঁটি বাঙালি কবি আর জন্ম নেবে না, জন্ম নেয়ারও কোনো দরকার নেই। খাঁটি বাঙালি কবির অর্থ হচ্ছে অপরীক্ষিত স্বতস্ফূর্ততা, তা অন্য কোনো কবিতার সংবাদ রাখে না; শুধু নিজের মনে যে-কাঁপন লাগে, প্রকাশ করে তাই। বঙ্কিম ওই স্বতস্ফূর্ত মৌলিকতার অবসান ঘোষণা করেছিলেন, ওই মন্তব্যে রচনা করেছিলেন তার সমাধিলিপি।

উনিশশতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই দেখতে পাই মৌলিকতার বদলে লেখকেরা মন দিয়েছেন সংগ্রহ ও আহরণে; খাঁটি হওয়ার কোনো সাধ জাগে নি তাঁদের মনে। প্রায় এক শতাব্দী পরে যা বলেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—বিশ্বের সেই আদিম উর্বরতা আর নেই, কাব্যের কল্পতরু জন্মানোর জন্যে বিশ্ব জুড়ে বীজ ভিক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই—তা যেনো প্রথম বুঝেছিলেন মধুসূদন। তিনি আমাদের কাছে প্রথম প্রধান উদাহরণ হয়ে আছেন বিশ্বভিক্ষার সাফল্যের। বিশ্বভিক্ষা অবশ্য কোনো যান্ত্রিক ব্যাপার নয়, তার জন্যেও দরকার প্রতিভা; তবে প্রতিভাই যথেষ্ট নয় পশ্চিম থেকে ঋণ নেয়া ছাড়া। একজন খাঁটি শ্রীমধুসূদনের কাছে আশা করতে পারি না ওই মহাকাব্য, সনেট, ট্র্যাজেডি, প্রহসন; তিনি যতোই প্রতিভাবান হোন। আধুনিক বাঙালির প্রতিভা হচ্ছে পশ্চিম থেকে গ্রহণের প্রতিভা। যিনি গ্রহণ করতে পেরেছেন, তিনি গুরুত্বপূর্ণ হয়েছেন; যিনি পারেন নি, তিনি গৌণ হয়ে পড়েছেন। মধুসূদনের রচনাবলি হচ্ছে বাঙলায় লেখা পশ্চিমের রচনাবলি; পশ্চিমের কোনো ভাষায় লেখা হ'লে তা হয়তো মূল্য পেতো না, কিন্তু বাঙলায় তা অসাধারণ। বাঙালির অভিনব সৃষ্টিশীলতা প্রথম বিকশিত হয় মধুসূদনের রচনাবলিতে; ওই সৃষ্টিশীলতা মৌলিক নয়, বা অভিনব ধরনে মৌলিক;—তার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাঙলার ও বাঙালির। তাতে বিষয়রূপে বাঙলা ও বাঙালি রয়েছে, কিন্তু তা বিষয়; ওই বিষয়কে যা অভিনব শিল্পরূপ দিয়েছে, তা বাঙলার নয়। মধুসূদন থেকে শুরু বাঙালির এ-নতুন ঋণাত্মক সৃষ্টিশীলতা, তারপর একশো বছরের বেশি সময় কেটে গেছে, এবং আমরা দেখেছি বাঙালি কোনো মৌলিক সৃষ্টিশীলতার বিকাশ ঘটাতে পারে নি। মধুসূদনের পর যাঁরা একান্তভাবে বাঙালি, তাঁদের

রচনার মূল্য খুবই কম। মধুসূদনের পরপরই আসেন বিহারীলাল চক্রবর্তী, যাঁর কবিতার কিছু অংশ বিশুদ্ধ কবিতা। রোম্যান্টিকতা তাঁর কবিতাই প্রথম প্রকাশ পায় বাঙলা ভাষায়; কিন্তু তিনি যে মহত্ত্ব অর্জন করতে পারেন নি, তার কারণ তিনি পশ্চিম থেকে বেশি নিতে পারেন নি। তাঁর কবিতায় দেখি বাঙালির প্রথাগত স্বভাবের স্বতস্ফূর্ততা, যা কবিতাকে বেশি দূর এগিয়ে নিতে পারে না। তাঁর সমকালে, গদ্যে, বঙ্কিমচন্দ্রে পাই পুরোপুরি পশ্চিমকে;– প্রথম উপন্যাসই তিনি রচনা করেছিলেন স্কটের অনুসরণে, এবং পরবর্তী উপন্যাসে, প্রবন্ধে, ব্যঙ্গবিদ্রূপে প্রতিধ্বনি শুনি শুধু পশ্চিমের। যদিও পশ্চিমের নিন্দায় তিনি অকুণ্ঠ ছিলেন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক কোনো ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, ও পরিহাসকারী বাঙলা ভাষায় পাওয়া যেতো না যদি না বঙ্কিম উদারভাবে ধার নিতেন পশ্চিম থেকে। বিষয়কে যদি বলি শরীর, আর বিষয়বিন্যাসের কৌশলকে, তাকে শিল্পরূপ দেয়ার শক্তিকে যদি বলি প্রাণ, তবে বঙ্কিমসাহিত্যের প্রাণটি পশ্চিমের। তা বাঙালির নয়, মৌলিক নয়। কোনো খাঁটি বাঙালির বুকে কখনো দেখা দিতো না *মেঘনাদবধকাব্য*–এর স্বপ্ন ও পরিকল্পনা; তাঁর পক্ষে ওই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার কথাই ওঠে না, কোনো খাঁটি বাঙালির পক্ষে অসম্ভব ছিলো *দুর্গেশনন্দিনী* কল্পনা করা;–তা এতোই অভিনব, যার ধারণা খাঁটি বাঙালির মস্তিষ্কে প্রথম জন্ম নেয়ার কথা নয়।

রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব ও বিশালত্ব সম্পর্কে আমরা নিঃসন্দেহ, তবে রবীন্দ্রনাথ মৌলিক বাঙালি প্রতিভার বিকাশ নন; তিনি পশ্চিমেরই দাস। যে–চেতনার নাম রবীন্দ্রনাথ, তার নাম রোম্যান্টিসিজম;–ওই রোম্যান্টিসিজম ইউরোপের রক্ত থেকেই জন্ম নিয়েছে। রবীন্দ্ররচনায় পাওয়া যায় রোম্যান্টিসিজমের চূড়ান্ত পরিণতি। অনেকাংশে বিলম্বিত ছিলেন তিনি, বিলম্বিত না হয়ে উপায় ছিলো না যেহেতু জন্ম নিয়েছিলেন বাঙলায়; কিন্তু তিনি আহরণ শোষণ করতে পেরেছিলেন পশ্চিমকে তীব্র ও ব্যাপকভাবে। তাঁর কবিতায়, প্রবন্ধে, উপন্যাসে ইউরোপি রচনার প্রত্যক্ষ ছাপ দেখা যায়, এটা বড়ো কথা নয়; ইউরোপে বিকশিত আবেগ, ভাবনা, বোধগুলোই তিনি অসামান্যভাবে প্রকাশ করেছিলেন বাঙলা ভাষায়। ১৮৬১তে তিনি যদি জন্ম নিতেন ফরাশিদেশে, বা জর্মনিতে, বা যুক্তরাজ্যে, তাহলে পৃথিবী কোনো রোম্যান্টিক রবীন্দ্রনাথকে পেতো না, কিন্তু পেয়েছে, কেননা তিনি জন্ম নিয়েছিলেন পৃথিবীর সৃষ্টি ও বিশ্লেষণশীলতার কেন্দ্র থেকে সুদূর এক অঞ্চলে। রবীন্দ্ররচনার বিষয় থেকে প্রাণকে পৃথক ক'রে নিলে পাই ইউরোপের আবেগ, স্বপ্ন, ব্যাকুলতা; পাই অসামান্য ব্যক্তিতন্ত্র। ভারতীয় যেটুকু মিশিয়েছেন তিনি রচনায়, তার জন্যে রবীন্দ্রনাথ মূল্যবান নন, বরং ওইটুকু তাঁর সীমাবদ্ধতা। রবীন্দ্রনাথে কি এমন কোনো স্বপ্ন পাই, যা আঠারোশতকের শেষ থেকে উনিশশতকের ইউরোপে দেখা হয় নি, পাই কি এমন আবেগ যা বিকশিত হয় নি সেখানে, পাই কি এমন কোনো সাহিত্যবোধ, যা উনিশশতকে প্রকাশ পায় নি ইউরোপে? বাঙলা সাহিত্যকে তিনি একাই কয়েক শো বছর এগিয়ে দিয়েছিলেন যে–প্রতিভায়, তার বীজ ইউরোপি। এ–সময়ে আমরা দেখেছি, যখনি সাহিত্যের স্রোতটি আটকে গেছে, পুনরাবৃত্তিতে জড়িয়ে পড়েছে সাহিত্য, তখনই পশ্চিম থেকে

নিতে হয়েছে নতুন সাহিত্যবোধ, সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা। বাঙালি কোনো মৌলিক সাহিত্যান্দোলন সৃষ্টি করে নি, বিশের দশকের তরুণেরা যখন নতুন সাহিত্যের জন্যে ব্যগ্র হন, তখন তাঁরা সাহিত্যের প্রেরণা খোঁজেন বিদেশে। তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন যে–সাহিত্য তাঁরা চান, তার বীজ দেশের মাটিতে নেই। উনিশশতকের দ্বিতীয়ার্ধে ও বিশশতকে ইউরোপে দেখা দিয়েছে নানা সাহিত্যান্দোলন;– বাস্তবতাবাদ, প্রতীকবাদ, চিত্রকল্পবাদ, পরাবাস্তবতাবাদ প্রভৃতি উদ্ভূত হয়েছে তাঁদের প্রতিভা থেকে, বদলে গেছে কবিতা, উপন্যাস, নাটক; কিন্তু বাঙালি কোনো আন্দোলন জন্ম দেয় নি নিজের প্রতিভা থেকে। রবীন্দ্রনাথ থেকে মুক্তির জন্যে, নতুন সাহিত্যের জন্যে, তাঁরা ছুটেছেন ইউরোপের দেশেদেশে : কোথাও সংগ্রহ করেছেন বিশশতকের কবিতার ধারণা, কোথাও পেয়েছেন নতুন আবেগ, বোধ, সংবেদনশীলতা। তাঁরা যে সবাই ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন, প্রতিভাবান মেধাবী ছাত্র ছিলেন, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ; শুধু বাঙলা সাহিত্য প'ড়ে বাঙলা সাহিত্যকে মুক্তি দেয়া সম্ভব ছিলো না। তাঁদের পক্ষেই সম্ভবপর ছিলো নতুন সাহিত্যের স্বপ্ন দেখা, যাঁরা জানতেন ইউরোপে কী ঘটছে, সাহিত্য কী রূপ ও চরিত্র নিচ্ছে ইউরোপে। তাই ইউরোপি সাহিত্যকেই তাঁরা করেছিলেন তাঁদের অনুপ্রেরণা। আধুনিক বাঙলা কবিতা ও আধুনিক বাঙলা উপন্যাসের তুলনা করলেও দেখা যায় কবিতা যতোটা সফল হয়েছে, উপন্যাস ততোটা হয় নি; কেননা আধুনিক ঔপন্যাসিকদের থেকে আধুনিক কবিরা ছিলেন অনেক অগ্রসর, অনেক বেশি পশ্চিমমুখি; ইউরোপকে বোঝার ভাষাজ্ঞানও ছিলো তাঁদের অধিক। তিরিশি কবিতার পর বাঙলা কবিতা বেশি এগোয় নি ব'লে যে–অভিযোগ শোনা যায়, তা পুরোপুরি মিথ্যে নয়, বেশ সত্য আছে ঐ–অভিযোগের মধ্যে; কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কেনো এগোয় নি? তিরিশি কবিতা ছিলো ইংরেজি সাহিত্যের মেধাবী প্রতিভাবান ছাত্রদের সৃষ্টি; এবং তার পরের কবিতা প্রধানত বাঙলা সাহিত্যের ছাত্রদের, ও আরো অনেকের, যাঁরা পড়াশুনোকে অবহেলা করেছেন, তাঁদের সৃষ্টি। সাম্প্রতিক বাঙলা কবিতা অনেকাংশে অশিক্ষিত কবিসমাজের সৃষ্টি, যাঁদের অধিকাংশের বাঙলা কবিতা পড়ারও অভিজ্ঞতা নেই, বিদেশি কবিতা তাঁদের সমস্ত সীমার বাইরে। যেহেতু মৌলিক কিছু সৃষ্টি অসম্ভব তাঁদের পক্ষে, এবং অসম্ভব বিদেশ থেকে প্রতিভামণ্ডিত ঋণগ্রহণ, তাই কবিতা ও সাহিত্যের অন্যান্য এলাকা আক্রান্ত হয়েছে স্থবিরতায়।

স্থবির সাহিত্যকে ও অন্য সব কিছুকে মুক্তি দেয়ার দুটি উপায় রয়েছে : একটি মৌলিক সৃষ্টিশীলতা, অন্যটি বিদেশি ঋণগ্রহণ। দুটি যদি কাজ করে একই সাথে, তাহলে হয় চমৎকার। মৌলিক সৃষ্টিশীলতা থাকলে ভালো হয় খুবই; তার অভাবে যা অপরিহার্য, তা হচ্ছে বিদেশ থেকে ঋণগ্রহণের প্রতিভা। যদি একটিও অধিকারে না থাকে, তাহলে স্থবিরতাচ্ছন্ন হওয়াই নিয়তি। সাহিত্যসৃষ্টি আমাদের কাছে অনেকটা প্রথার ব্যাপার; আমরা যেনো মনে করি দীর্ঘ কাহিনী বললেই উপন্যাস হলো, ছন্দে বা অছন্দে আবেগ প্রকাশ করলেই কবিতা হলো, সংলাপে সংলাপে ঘটনা বর্ণনা করলেই নাটক হলো, এবং পুরোনো রীতিতে পুরোনো কিছু কথা বললেই প্রবন্ধ হলো। উপন্যাস যে শুধু কাহিনী নয়, শিল্পকলা, তা মনে থাকে না আমাদের; জীবনের বিচিত্র দিক যে

এর বিষয়, যেদিকে আগে আর কেউ যায়নি, সেদিকে যাওয়া যে দরকার, তা মনে পড়ে না; ঠিক তেমনি মনে পড়ে না যে প্রথাগত রীতিতে আবেগ প্রকাশ করলেই কবিতা হয় না। মনে পড়ে না শব্দ ও বাক্য যাচাই করার কথা, বা পুরোনো প্রকরণ ছেড়ে নতুন প্রকরণ সৃষ্টির কথা। অর্থাৎ মৌলিকতা আমাদের আরাধ্য নয়। মৌলিকতার অভাবে আমরা ঋণ করতে পারি, কিন্তু সবাই পারি না, যাঁদের রয়েছে পশ্চিমমনস্কতা, রয়েছে পশ্চিমকে বোঝার শক্তি ও পুনঃসৃষ্টির প্রতিভা, তাঁদের পক্ষেই সম্ভব বাঙলা সাহিত্যকে এগিয়ে দেয়া। একান্তভাবেই বাঙালি, যাঁর নেই মৌলিকতা ও ঋণের প্রতিভা, তাঁর পক্ষে হয়তো কিশোরপাঠ্য সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব, ওই সাহিত্য দিয়ে প্রথাগত পণ্ডিতেরাও হ'তে পারেন বিভ্রান্ত, কিন্তু তা মূল্যবান নয়। বাঙলাদেশে এখন যে-সাহিত্য রচিত হচ্ছে, তার বড়ো অংশই নামমাত্র সাহিত্য;—যাকে আমরা উপন্যাস বলছি, তা উপন্যাস নয়, কিশোরপাঠ্য বিনোদনমূলক তুচ্ছ উপখ্যান; যাকে বলছি কবিতা, তা কবিতা নয়, কবিতার অনুকরণ। নাটক রচিতই হয় না বাঙলাদেশে। এ-বন্ধাত্বের মূলে রয়েছে মৌলিক সৃষ্টিশীলতার অভাব, এবং পশ্চিম থেকে ঋণের অক্ষমতা। যে-ঋণের কথা বলছি আমি তা পশ্চিমের কোনো বই নকল করা নয়; তা পশ্চিমের নতুন নতুন প্রবণতাকে আয়ত্ত করা, পশ্চিমের নতুন চেতনাকে আত্মস্থ করা।

সাহিত্য সমালোচনা নামে রয়েছে আমাদের বিশ্লেষণশীলতার যে-এলাকাটি, তা খুবই মর্মস্পর্শী। স্থূল পণ্ডিতি অর্থাৎ অ্যাকাডেমিক আলোচনার ঝোঁকই বেশি আমাদের;—ওই আলোচনা দরকারি সন্দেহ নেই, কিন্তু তা বাহ্যিক তথ্য পেরিয়ে ভেতরে ঢোকে না, লেখকের ও তাঁর সৃষ্টির কোনো ব্যাখ্যা দেয় না। উপন্যাসবিষয়ক আলোচনায় পাই উপন্যাসের সারাংশ, কোনো ভাষ্য পাই না; ওই আলোচনার পেছনে থাকে না কোনো তাত্ত্বিক দৃষ্টি। কবিতাবিষয়ক আলোচনায় পাই কবিতার সারাংশ, ও কবিতা থেকে পৌনপুনিক উদ্ধৃতি; এবং উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যার মধ্যে অধিকাংশ সময়ই কোনো সম্পর্ক থাকে না। খুব নিকৃষ্ট কবিতাংশ উদ্ধৃত ক'রে আলোচকেরা তাকে অসাধারণ ব'লে ঘোষণা করেন, ব্যাখ্যা করেন কবিতার শরীর ও আত্মা। বাঙলা সমালোচনা পুরোপুরি বর্ণনাধর্মী; যে-কোনো সমালোচনামূলক বই খুললে তাতে পাই কবিতা, উপন্যাস, গল্প, বা প্রবন্ধের ধারাবিবরণী, উদ্ধৃতি; বার বার একই ব্যাখ্যা। কোনো তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত হয় না আমাদের সমালোচনা, তা নিতান্তই ব্যক্তিগত মোটা সাহিত্যবোধের প্রকাশ। ইউরোপে গত দু-শো বছরে দেখা দিয়েছে সাহিত্য সমালোচনার বহু পদ্ধতি, নানা কোণ থেকে তাঁরা ব্যাখ্যা করেছেন সাহিত্য; কিন্তু বাঙলা সমালোচনা বিবরণধর্মিতার পাশ থেকে মুক্তি পায় নি। বাঙলায় তাঁরাই গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা লিখেছেন, যাঁরা উপেক্ষা করেছেন স্থূল পণ্ডিতি, যাঁরা মাঝেমাঝে সমালোচনা রীতি ঋণ করেছেন পশ্চিম থেকে। পণ্ডিতি রীতির আলোচকেরা সমালোচকই নন, যদিও তাঁদের কাজ বেশ উপকারে আসে; তাঁরা লেখকদের সম্পর্কে দেন নানা সংবাদ। এখন যান্ত্রিক পদ্ধতিতে, যান্ত্রিক বলা সম্ভবত ঠিক হলো না, বলা উচিত কেরানিরীতিতে রচিত হচ্ছে রাশিরাশি পিএইচডি অভিসন্দর্ভ; অধিকাংশ কাজ ক'রে চলছেন লেখকদের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে। এসব সন্দর্ভে পরিচ্ছেদপরম্পরায়

থাকে বিবরণ, রচনার সারাংশ, নিকৃষ্ট গদ্যে কবিতার গদ্যরূপান্তর, ও অসংখ্য উদ্ধৃতি। গবেষকেরা ঠিক মতো একটি রচনাপঞ্জিও তৈরি করতে পারেন না। তাঁদের কোনো সাহিত্যবোধ ও সমালোচনার কোনো ধারার সাথে পরিচয় নেই, নেই কোনো প্রতিপাদ্য, —পুরো সন্দর্ভ জুড়ে ছড়িয়ে থাকে মেধাশূন্যতার ছাপ; কিন্তু তাঁরা কয়েক বছরে কয়েক শো পাতার সন্দর্ভ শেষ ক'রে অর্জন করছেন উপাধি। অতুলনীয়ভাবে শোচনীয় এসব অভিসন্দর্ভ।

ভাষাবিজ্ঞানের এলাকায়ও দেখতে পাই একই অবস্থা; মেধাহীন পুনরাবৃত্তি একে দখল ক'রে আছে পুরোপুরি। এখানে কিছু বর্ণনা পাই, তাও খুবই খণ্ডিত, অনেকাংশ ভ্রান্ত; কিন্তু কোনো তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা দেখি না। প্রথাগত ব্যাকরণের ধারাটি অতিশয় জীর্ণ, সেখানে দেখি ইংরেজি ও সংস্কৃত ব্যাকরণের অগভীর অনুকরণ; তাঁরা বাঙলা ভাষার দিকে ভালো ক'রে চোখও দিতে পারেন নি। তাঁরা বিভিন্ন ক্যাটেগরি ধার করেছেন সংস্কৃত থেকে, ইংরেজি ব্যাকরণ থেকে, এবং তা চাপিয়ে দিয়েছেন বাঙলা ভাষার ওপর। দু-একজন গুরুত্বপূর্ণ কালানুক্রমিক ভাষাবিজ্ঞানী দেখা দিয়েছিলেন; তাঁরা কেউ কেউ তাঁদের সময়ের প্রণালিতে উপাত্ত সংগ্রহ ও বিবর্তন বর্ণনা করেছেন বাঙলা ভাষার; তবে তাঁদের রচনায় কোনো তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা পাওয়া যায় না। কিন্তু ওই তত্ত্বই হচ্ছে সৃষ্টিশীলতা ও বিশ্লেষণশীলতার লক্ষণ। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের চর্চা যাঁরা করেছেন, এখনো করছেন, তাঁরা প্রায় সবাই বেদনাদায়কভাবে তাত্ত্বিক প্রশ্নমুক্ত; এবং তাঁদের অধিকাংশ ভাষাবিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলোও আয়ত্ত ক'রে উঠতে পারেন নি। তাঁদের বর্ণনা ভ্রান্ত, তাঁদের তথ্য খণ্ডিত; তাঁরা সম্পূর্ণরূপে বোধশক্তিরহিত অনুকারী। তাঁরা যা-কিছু লিখেছেন, তাতে ত্রুটি সীমাহীন। ভালো ভাষাবিজ্ঞানী এখানে জন্মে নি, এটা বড়ো কথা নয়; বলা যেতে পারে কোনো ভাষাবিজ্ঞানীই দেখা দেয় নি এখানে। তাঁরা যদি মৌলিকতার অভাব সম্পর্কে সচেতন হতেন, নিজেদের ভাবতেন নিষ্ঠাপরায়ণ শ্রমিকরূপে, পশ্চিম থেকে তাত্ত্বিক ধারণাগুলো নির্ভুলভাবে নিয়ে আসতে পারতেন বাঙলায়, তাহলেও উপকার হতো; কিন্তু তাও সম্ভব হয় নি তাঁদের পক্ষে। তাঁরা ঋণ করতেও ব্যর্থ হয়েছেন।

সাহিত্যের সৃষ্টি ও বিশ্লেষণশীলতার এলাকা দুটির যে-রূপ তুলে ধরেছি, তাতে বোঝা যাচ্ছে কোনো এলাকায়ই আমরা মৌলিক নই, কিছুই প্রথম উদ্ভাবন করি নি আমরা। দু-এলাকায়ই আমরা সীমাবদ্ধ। তবে এলাকা দুটির মাঝে পার্থক্য রয়েছে বেশ, রয়েছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য; আর তা হচ্ছে যে সৃষ্টিশীলতার এলাকায় আমাদের প্রধানগণ প্রতিভাবান ঋণ গ্রহণ করতে পেরেছেন পশ্চিম থেকে, সে-ঋণ খাটিয়ে তাঁরা গড়ে তুলেছেন বিস্ময়কর পুঁজি। তাঁদের মৌলিকতাকে বলতে পারি ঋণাত্মক মৌলিকতা, যা অন্যকে আশ্রয় করে; কিন্তু পরাশ্রয়ী হয়েও তা সমৃদ্ধ করে জাতিকে। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে দেখতে পাই এ-প্রক্রিয়াটিই। এখানে সীমাবদ্ধতার মধ্যেও খুঁজে পাই এক ধরনের মুক্তি, অভিনব সৃষ্টিশীলতা; কিন্তু মননশীলতার এলাকাটিতে দেখি না এ-প্রক্রিয়া। এ-এলাকায় পশ্চিম থেকে ঋণগ্রহণের শক্তিও দুর্লভ; এখানে

পাওয়া যায় শোচনীয় অনুকরণ। শুধু সাহিত্যের বিশ্লেষণ ও ভাষ্যের এলাকায়ই এ-সীমাবদ্ধতা দেখা যায়, এমন নয়। দেখা যায় অন্যান্য সব এলাকায়; সম্ভবত সে-সব এলাকায়ই বন্ধ্যা, সীমাবদ্ধ, নিরর্থক অনুকরণ আরো প্রবল। অর্থনীতি, বা সমাজবিজ্ঞান, লোকপ্রশাসন, বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা বা হিশেবশাস্ত্র ও আরো সচ্ছল এলাকাগুলোতে বাঙালির সীমাবদ্ধতা শোচনীয়; মৌলিকতার কথা সেখানে ভাবাও হয় না। ওসব এলাকায় যে-সব কাজ হচ্ছে, তা অর্থতাড়িত দাসবৃত্তি; আর তাঁদের রচনা যেহেতু রচিত হয় জীর্ণ ইংরেজিতে, বাঙলায় প্রায় কিছুই হয় না, তাই অনুকরণকারীর মর্যাদাও তাঁদের জোটে না। বাঙলায় যদি লেখা হতো তাঁদের অর্থঅনুপ্রাণিত প্রতিবেদনরাশি, তাহলে বিশ্বে তা মূল্য না পেলেও বাঙলায় কিছুটা মূল্য দাবি করতে পারতো।

প্রশ্ন উঠবে কেনো আমরা এমন সীমাবদ্ধ, কেনো অভাব আমাদের মৌলিকতার;—সৃষ্টি ও ভাষ্যের দু-এলাকায়ই? এ-প্রশ্ন অবধারিত, কিন্তু এর উত্তর সুনিশ্চিত হবে না; কারণ প্রশ্ন একটি, উত্তর অনেক। উত্তর কি হবে যে জাতি হিশেবেই সীমাবদ্ধ আমরা; আমাদের মস্তিষ্ক অনেকাংশে অবিকশিত? এ-উত্তর গ্রহণযোগ্য হবে না; আমরা বিশ্বাস করি না যে কোনো মানবগোষ্ঠির মস্তিষ্ক বেশি বা কম বিকশিত; মনে করি না যে কোনো জাতি বিশেষভাবেই সৃষ্টিশীল, কোনো জাতি বিশেষভাবেই বিশ্লেষণপরায়ণ; আর কোনো জাতি বন্ধ্যা। আমাদের সীমাবদ্ধতা কোনো জৈবিক কারণে নয়। আমাদের সীমাবদ্ধতা মস্তিষ্কের নয়, দ্বিতীয় মস্তিষ্কের, অর্থাৎ সমাজের। আমরা যে-সামজ বা সংস্কৃতি বা সভ্যতার অংশ, তার মধ্যেই রয়েছে সীমাবদ্ধতার বীজ। আমাদের সমাজ মৌলিকতাবিরোধী, সৃষ্টিবিমুখ, পুনরাবৃত্তিপরায়ণ, নিয়ন্ত্রণবাদী। আমাদের সমাজের অবকাঠামো ও ওপরকাঠামে জুড়ে রয়েছে সৃষ্টিবিরোধিতা; এর আর্থনীতি সৃষ্টিবিমুখ, এর ধর্মনীতি অন্ধত্বের উপাসক, এর শিক্ষাব্যবস্থা পুনরাবৃত্তিপরিতৃপ্ত, এর সংস্কৃতি প্রশ্নবিরোধী। আমাদের সমাজ প্রশ্নের শত্রু, যে-কোনো নতুনের বিরোধী; অতীতই আমাদের ভবিষ্যৎ। এগোনো এখানে নিষিদ্ধ। যা আছে, তাকেই আমরা পরম ব'লে মনে করি, তাকে অতিক্রমের ইচ্ছেকে মনে করি ঈশ্বরদ্রোহিতা। আর্থনীতিক কারণে আমাদের সমাজের বড়ো অংশটিই সৃষ্টি ও বিশ্লেষণে কোনো অংশ নিতে পারে না; আর যে-ছোটো অংশটি সুযোগ পায় সৃষ্টি ও বিশ্লেষণের, তারা শুরু থেকেই মুখোমুখি হয় নিষেধের। তারা বুঝে ফেলে অতিক্রম করা, সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ; এখানে সিদ্ধ শুধু প্রথার সাথে সুচারুরূপে খাপ খাওয়া। সীমাবদ্ধতাই এখানে প্রশংসিত, ও সাফল্যের চাবি।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় কোনো প্রশ্নের স্থান নেই। বাল্যকাল থেকে আমরা কিছু 'ধ্রুবসত্য' মুখস্থ করতে থাকি, আর সারাজীবন তা আবৃত্তি করি; মনে করি প্রথা ও পুরোনোমাত্রই সত্য ও শুদ্ধ, নতুনমাত্রই মিথ্যা ও অশুদ্ধ। নতুন, আমাদের সমাজের চোখে, শুধু মিথ্যা ও অশুদ্ধই নয়, তা ভয়ানক, সমাজবিরোধী, ও প্রতিরোধের বস্তু। তাই শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের কোনো প্রশ্ন করতে দেয় না, প্রত্যেকের আন্তর সৃষ্টি ও

মননশীলতাকে বিকশিত হ'তে দেয় না, বরং রোধ করে। আমাদের বইগুলো প্রথাপাঠ; শিক্ষকেরা প্রথার প্রহরী। ছেলেবেলা থেকে আজ পর্যন্ত বাঙলায় লেখা এমন কোনো পাঠ্যবই আমি পড়ি নি, যা আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন প্রথার বিরুদ্ধে যেতে, যা জাগাতে চেয়েছে আমার সৃষ্টিশীলতা, বিশ্লেষণশীলতা; ছেলেবেলা থেকে আজ পর্যন্ত আমি এমন কোনো শিক্ষক পাই নি, যিনি সামান্যও বিকাশ ঘটিয়েছেন আমার। পুরো শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্যে একটি বিশাল শেকল, যার কাজ শিক্ষার্থীর সৃষ্টি ও বিশ্লেষণশীলতাকে অজগরের মতো পেচিয়ে ধরা, তাকে দুমড়েমুচড়ে দেয়া, তাকে নিষ্প্রাণ করা। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সৃষ্টিশীল নয়, তা প্রথাশিক্ষাগৃহ; সেখানে শেষবারের মতো চেপে ধরা হয় সৃষ্টিশীলতার গলা। ধর্মের পীড়ন অত্যন্ত প্রবল এখানে। মধ্যযুগ আমরা পেরিয়ে আসি নি এখনো, অথচ সৃষ্টি ও বিশ্লেষণের জন্যে মধ্যযুগ থেকে বেরিয়ে আসা অত্যন্ত দরকার। অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই এখানে কোনো প্রশ্ন করা যায় না, তাই তার উত্তরও খোঁজা যায় না; মেনে নিতে হয় এমন অনেক কিছু, যা পুরোপুরি বাতিল। অতীত এখানে বর্তমানের থেকেও প্রবল, বা আমাদের বর্তমান আসলে এক ধরনের অতীতই, অতীতের মধ্যেই বর্তমানে বাস করি আমরা। আমাদের অতীতের এমন কিছু নেই, যা গ্রহণযোগ্য, যাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাতে পারি; কিন্তু তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত আমাদের জীবন ও স্বপ্ন।

প্রাচ্য চিরকালই প্রথানুবৃত্তিতে পরিতৃপ্ত, পুনরাবৃত্তিতে আমাদের প্রতিভা তুলনাহীন। ইউরোপ চায় অতিক্রম ক'রে যেতে, তার মুখ সামনের দিকে; আমরা চাই রুদ্ধ হয়ে থাকতে, আমাদের মুখ পেছনের দিকে। আমাদের পেছনে এমন কী কিছু আছে–সাহিত্য দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, বা অন্য কিছু–যা খাটাতে পারি পুঁজি হিশেবে; বারবার ফিরে যেতে পারি তার কাছে, হ'তে পারি ঋদ্ধ? এমন কিছু নেই আমাদের; আমাদের অতীতের কোনো কিছুই বর্তমানের বা ভবিষ্যতের সৃষ্টি ও মননের ভিত্তি হওয়ার উপযুক্ত নয়। কী আহরণ করতে পারি কাহ্নপাদের কাছে, কী পেতে পারি আলাওলের কাছে, কী পেতে পারি কায়কোবাদ বা মশাররফ হোসেনের কাছে? শূন্যতার কাছে কিছু প্রত্যাশা করতে পারি না। কিন্তু আমাদের সমাজসংস্কৃতি আমাদের বাধ্য করে অতীতের, শূন্যতার কাছে চিরবশ্যতা স্বীকার ক'রে থাকতে। মৌলিক সৃষ্টিশীলতা ও মেধা অতীতের কাছে দায়বদ্ধ নয়; তা অতীতকে বিচার করে, গ্রহণঅযোগ্য হ'লে প্রত্যাখ্যান করে, এবং সৃষ্টি করে অভিনবকে। কিন্তু অভিনবর জন্যে আমাদের কোনো আগ্রহ নেই; কারণ আমরা বিকাশে বিশ্বাসী নই, আস্থাশীল আমরা স্থবিরতায়। আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে যদি থাকতো সৃষ্টির আবহাওয়া, এর জলবায়ু হতো যদি প্রশ্ন করার ও উত্তর খোঁজার, তাহলে সীমাবদ্ধতায় আক্রান্ত হতাম না আমরা। অভিনবকে আমরা ভয় পাই, বুঝতে পারি না কী অভিনব, জানিও না কীভাবে সৃষ্টি করতে হয় অভিনবকে।

আমাদের সাহিত্যরচনার প্রক্রিয়াটি বিচার করা যাক। কেউ যখন একটি কবিতা লেখার কথা ভাবেন, তিনি তখন তাঁর সময়ে প্রতিষ্ঠিত কারো মতে লেখেন, বা তিনি পেয়ে যান কবিতার একটি প্রচলিত ছক, এবং অনুসরণ করতে থাকেন ওই ছক।

AMARBOI.COM

অধিকাংশেরই কখনো মনে হয় না যে ওই ছকবাঁধা রচনা রচিত হয়েছে অনেক, এখন অন্য কোনো রূপে লেখা উচিত কবিতা, বা কবিতার বিষয় হওয়া উচিত ভিন্ন কিছু। উপন্যাস লিখতে ব'সে আমরা নতুনভাবে লিখি পুরোনো উপন্যাস। শুরু থেকেই সবাই প্রচণ্ডভাবে মৌলিক হবেন, অন্য কারোই পথে চলবেন না, এরকম খুব বেশি হয় না পৃথিবী জুড়েই; কিন্তু পশ্চিমে দশকে দশকে নতুন মৌলিকেরা দেখা দেন। নতুনেরা সব সময় পুরোনোদের থেকে মহৎ বৃহৎ হবেন, এমন আশা করা অন্যায়; কিন্তু তাঁরা নতুন ও স্বতন্ত্র হবেন, তা আশা করা সঙ্গত। আমাদের এখানে নেই এ-ব্যাপারটি; আমরা ধ'রেই নিই নতুনেরা প্রদক্ষিণ করবেন পুরোনোদের; একজন রবীন্দ্রনাথ পাওয়ার পর আমরা আর কিছু চাই না, আমরা চাই রবীন্দ্রনাথকেই প্রদক্ষিণ করতে।

প্রথাবদ্ধতাই আমাদের সীমাবদ্ধতার মূল কারণ। আর প্রথাবদ্ধতার কারণ হচ্ছে আমাদের সমাজ সচল নয়, সক্রিয় নয়; তার মধ্যে কয়েক শতাব্দীতে কিছু সৃষ্টির অনুপ্রেরণা জাগে নি। আমাদের সমাজ অতি-নিয়ন্ত্রিত; এতো নিয়ন্ত্রিত যে নিয়ন্ত্রণকে সব সময় অনুভবও করি না, তাকেই ভাবি স্বাভাবিক। আমাদের সমাজের নিয়ন্ত্রণ পশ্চিমের একনায়কত্বপীড়িত কিছু বিখ্যাত সমাজের পীড়নের থেকেও ভয়াবহ; কেননা সেখানে রয়েছে, যা ছিলো বিশেষ ধরনের রাজনীতিক নিয়ন্ত্রণ, কিন্তু সৃষ্টি ও মননশীলতার ক্ষেত্রে তারা স্বাধীন। কোনো বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন তাঁদের সন্ত্রস্ত করে না, কিন্তু আমাদের করে; কোনো নান্দনিক প্রশ্ন সেখানে আপত্তিকর নয়, কিন্তু আমাদের এখানে আপত্তিকর। নতুন নিন্দিত এ-সমাজে, প্রথা এখানে মুকুটশোভিত।

সীমাবদ্ধতার আরো একটি কারণ আমরা অনেক দূরে অবস্থিত সৃষ্টি ও বিশ্লেষণের কেন্দ্রগুলো থেকে। আমরা বাস করি এক গরিব গ্রহের গরিব প্রত্যন্ত অঞ্চলে, যেখানে পৃথিবীর প্রধান ঘটনাগুলোর সংবাদ পুরোনো হওয়ার আগে পৌঁছে না। দূর পল্লীতে ব'সে, পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে, কেউ ক'রে ফেলবেন কোনো অভিনব অসাধারণ কাজ, এটা এখন অসম্ভব ব'লেই মনে হয়; এখনকার সৃষ্টির জন্যে পুরো বিশ্বের সাথে থাকা প্রয়োজন প্রাত্যহিক সম্পর্ক। এখনকার সৃষ্টির জলবায়ু আন্তর্জাতিক, কোনো বন্দী জলবায়ুতে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ সম্পন্ন হ'তে পারে না। কী হচ্ছে প্যারিসে মস্কোতে, কী হচ্ছে লণ্ডনে নিউইয়র্কে, টোকিয়ো বুয়েনস অ্যায়ারিসে, তার সাথে যদি পরিচয় না থাকে, তাহলে সৃষ্টি ও বিশ্লেষণের কোনো এলাকায়ই এগোনো অসম্ভব। আমরা রয়েছি খুবই দূরে, কোনো দূর গ্রহে যেনো; জানি না কীভাবে এগোচ্ছে কবিতা বা উপন্যাস, সঙ্গীত বা চিত্রকলা, এবং আর সব কিছু। সৃষ্টিশীল কেন্দ্রগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলো অবধারিতভাবে বন্ধ্যা; সেখানে প্রথার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে, আন্তর্জাতিক মাপের কিছু সৃষ্টি হ'তে পারে না। আমাদের এখানে ঘটছে তাই, প্রথার পুনরাবৃত্তি ক'রে চলছি আমরা।

শ্রদ্ধেয় সভাপতি ও সুধীমণ্ডলি, এতোক্ষণ ধ'রে আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত করেছি গভীর হতাশা। হয়তো সফলভাবেও আপনাদের মনে সংক্রামিত করতে পারি নি আমার উপলব্ধি। আপনারা আমাকে বক্তব্য উপস্থাপনের যে-স্বাধীনতা দিয়েছেন, স্বাধীনতা পাওয়াও এখানে ভাগ্য, তার জন্যে অশেষ ধন্যবাদ আপনাদের প্রাপ্য, অন্তত এখানে আপনারা অতিক্রম করেছেন বাঙালির সীমাবদ্ধতা। আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।

কবিতা ও রাজনীতি

এমন এক সময়ে বাস করছি আমরা, যখন রাজনীতির রোমশ বাহু ও নৃশংস নখরের আওতার মধ্যে এসে পড়েছে সব কিছু;-এখন চরম নিষ্পাপ ও নির্বোধের পক্ষেও একথা ভাবা কঠিন যে চারপাশের রাজনীতিতে তার কিছু আসে যায় না। রাষ্ট্রযন্ত্র এখন এতো প্রতাপশালী, বিভিন্ন ব্যক্তি ও শ্রেণীর চাহিদা এতো বিচিত্র, যুদ্ধ, শান্তি, স্বাধীনতার সমস্যা এতো প্রকট যে সব কিছু এখন রাজনীতি-আক্রান্ত। আমাদের একান্ত ব্যক্তিগত জীবন, স্নেহপ্রীতি, প্রেমভালোবাসা, চুম্বনআলিঙ্গনও এখন রাজনীতিনিয়ন্ত্রিত। কোনো কিছুই আর রাজনীতিনিরপেক্ষ নয়। তৃতীয় বিশ্বে রাজনীতির থাবা একটু বেশি হিংস্র, আর সারাক্ষণ উদ্যত। যেখানে হঠাৎ কোনো সন্ধ্যায় বা শেষরাতে সারা দেশ বন্দী হয়ে পড়ে সামরিক আইন বা জরুরি অবস্থার শেকলে, একটি মাত্র নির্দেশে হরণ করা হয় মানুষের সমস্ত অধিকার, সান্ধ্য আইনের কবলে প'ড়ে রৌদ্রের দিন রূপান্তরিত হয় নিষিদ্ধ নিশীথে, যেখানে স্বৈরাচারীরা অবাধ স্বাধীন আর সকলের বুকের দিকে উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্র, সেখানে প্রতিটি ব্যক্তি প্রতিমুহূর্তে আক্রান্ত রাজনীতি দ্বারা। রাজনীতির আগুনে কমবেশি পুড়তে হয় সকলকে; তার শিখায় আমাদের অন্তরঙ্গতম অনুভূতিরাশিও কাগজের মতো পোড়ে। এমন সময়ে চুপ ক'রে থাকা রাজনীতি, চিৎকার ক'রে ওঠাও রাজনীতি। এমন পৃথিবীতে এমন সময়ে বাস করছি আমরা যে চুপ ক'রে থাকা ক্ষমাহীন অপরাধ। এমন সময়ে সূর্যাস্তের তাকিয়ে মুগ্ধ হওয়াকে মনে হয় অপরাধ, মনে হয় আমি যেনো মেনে নিয়েছি চারপাশের সমস্ত অন্যায়; এমন সময়ে গোলাপের স্তব করাকে মনে হয় অপরাধ, তাতে মনে হয় আমি যেনো মেনে নিয়েছি রাষ্ট্রযন্ত্রের দুর্বৃত্তপনা। এখন সব কিছুই রাজনীতিনিয়ন্ত্রিত; আমাদের শিল্প আর স্বপ্ন তার থেকে একটুও মুক্ত নয়।

কবিতা, বিশেষ ক'রে আধুনিক কবিতা, বিশেষভাবেই রাজনীতিসচেতন ও রাজনীতিপ্রবণ। তবে এখনো হয়তো কেউ কেউ রয়েছেন, যাঁদের কাছে কবিতা ও রাজনীতির সম্পর্ককে সতী ও লম্পটের সম্পর্কের মতোই অবৈধ মনে হয়। তাঁদের বিশ্বাস রাজনীতির ছোঁয়ায় নষ্ট হয় কবিতার সতীত্ব বা শুদ্ধতা। কিন্তু কিছুই কবিতার কাছে অস্পৃশ্য নয়; কবিতায় স্থান পেতে পারে সব কিছু, তবে ওই বিষয় ও শব্দপুঞ্জকে হয়ে উঠতে হয় এমন শিল্পকলা, যাকে বলা হয় কবিতা। এমন কোনো বিষয় নেই, যাকে স্থান দিলে রচনা অবলীলায় হয়ে ওঠে কবিতা। শুধুমাত্র প্রতিভার ছোঁয়ায়ই বস্তু ও স্বপ্নজগতের বিভিন্ন বিষয় কবিতা হয়ে ওঠে। পৃথিবী জুড়ে প্রচুর উৎকৃষ্ট বিষয়ে প্রচুর নিকৃষ্ট কবিতা রচিত হয়েছে। প্রেম, প্রকৃতি, কামনার মতো বিভিন্ন কাব্যিক বিষয়ে প্রতিদিন কয়েক টন কবিতা নামের আবর্জনা রচিত হয় পৃথিবী জুড়ে। রাজনীতি সম্পর্কেও সত্য এটা; প্রতি বছর পৃথিবী জুড়ে হাজার হাজার রাজনীতিক কবিতা লেখা হয়, যেগুলো কবিতা নয়, কবিতার অনুকরণ। এটা সত্য রাজনীতিকে কবিতায় পরিণত

করা বেশ দুরূহ; কোনো কবির ব্যক্তিগত বেদনা যতো সহজে কাব্যিক আবেগ ও আবেদন জাগাতে পারে, রাজনীতিবিষয়ক কবিতা ততো সহজে তা পারে না। তবে প্রতিভার হাতে রাজনীতিও অসামান্য বিষয় হয়ে উঠতে পারে কবিতার; এবং রচিত হ'তে পারে অসামান্য কবিতা। তাই কবিতা ও রাজনীতির মধ্যে কোনো বিরোধ নেই; বরং আধুনিক কালে রাজনীতি কবিতার একটি মূল্যবান বিষয় হিশেবে গৃহীত হয়েছে। কবিতা ও রাজনীতির সম্পর্ক এখন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

তবে কবিতা ও রাজনীতির সম্পর্ক সাম্প্রতিক নয়, অনেক শতকের। প্রাচীন গ্রীক কবি সিমোনিদেস ও এস্কিলুসের কবিতার ব্যাপক জায়গা জুড়ে রয়েছে রাজনীতি; ভার্জিল ও হোরেসের কবিখ্যাতির মূলে অনেকাংশে রয়েছে রাজনীতি। দান্তের *ডিভাইন কমেডিতে* রাজনীতি ধর্মতত্ত্বের সমান গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের প্রাচীন কবিদের লেখায়ও রাজনৈতিক ক্ষোভবিক্ষোভ অনুপস্থিত নয়। তবে রাজনীতি ও কবিতার সম্পর্ককে তীক্ষ্ণ, তীব্র, ঘনিষ্ঠ ক'রে তোলেন পশ্চিমের রোম্যান্টিক কবিরা। শেলি দাবি করেছিলেন যে কবিরা 'মানবজাতির অস্বীকৃত বিধানরচয়িতা'; এবং তিনি ও অন্যান্য রোম্যান্টিক কবি প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে আক্রমণ করেছিলেন প্রবলভাবে। রোম্যান্টিকদেরই বলতে পারি প্রথম প্রকৃত রাজনীতিক কবি, যাঁরা প্রতিবাদ করেছিলেন সামাজিক রাজনীতিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে; এবং প্রত্যাখ্যান করেছিলেন প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে। তাঁদের কবিতার বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে রাজনীতি;— তাঁরা খাপ খাওয়াতে পারেন নি প্রথাগত সমাজের সাথে, মেনে নিতে পারেন নি শাসকদের বিভিন্ন বিধান। তবে তাঁদের একান্তভাবে রাজনীতিক কবি বলা যায় না। আধুনিক কালে রাজনীতি যেমন সব কিছুকে নিজের আগুনের মধ্যে নিয়ে এসেছে, তেমনি দেখা দিয়েছেন একগোত্র কবি, যাঁদের প্রধান পরিচয় রাজনীতিক কবি হিশেবে। আধুনিক কবিদের কেউই পুরোপুরি রাজনীতিমুক্ত নন, নানাভাবেই রাজনীতি সংক্রামিত হয়েছে তাঁদের কবিতায়; তবে বিশশতকের সাম্যবাদী কবিরা প্রধানত রাজনীতিক কবি। রাজনীতি তাঁদের কবিতার প্রাণ।

অরাজনীতিক কবিতায় কবি নিজের একান্ত আপন ভাবনাবেদনাকে রূপান্তরিত করেন কবিতায়; এ-কবিতায় প্রধান কবির অন্তর্লোক। অন্তর্লোকের আলোড়ন শব্দে বিন্যস্ত হয়ে রচিত হয় অরাজনীতিক কবিতা। কিন্তু কবি যখন বিষয় হিশেবে বেছে নেন কোনো রাজনীতিক ব্যাপার, বা ঘটনা, তখন তার সাথে জড়িত থাকে বেশ বড়ো এক জনমণ্ডলি। বিষয়কে কবি তখন একান্ত ব্যক্তিগতভাবে অনুভব করেন না, তিনি অন্যদের অনুভবঅনুভূতিকে নিজের অনুভবঅনুভূতির সাথে মিশিয়ে রচনা করেন কবিতা; এবং আশা পোষণ করেন যে তাঁর কবিতায় জনমণ্ডলি আলোড়িত হবে। তিনি তখন হয়ে ওঠেন জনমণ্ডলির মুখপাত্র; তাঁর কবিতার সার্থকতা নির্ভর করে তিনি কতোখানি সফলভাবে জনমণ্ডলির আবেগ প্রকাশ করতে পেরেছেন, তার ওপর। তাই অরাজনীতিক ও রাজনীতিক কবিতার প্রথমিক প্রেরণা বিপরীত। রাজনীতিক কবি যেহেতু গ্রহণ করেন কোনো বাহ্যঘটনা, তাই শিল্পসৃষ্টির চেয়ে বিশেষ একগোত্র মানুষকে আলোড়িত

করাই থাকে তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। এজন্যে তাঁর বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে প্রচুর। রাজনীতিক বিষয়ে কবিতা লেখার জন্যে কবিকে বাইরে আসতে হয় অন্তর্লোক থেকে, নিজেকে মেলাতে হয় জনসাধারণের সাথে। তিনি নিজের বোধের সাথে মেলান জনমণ্ডলির বোধ, বা বিশেষ শ্রেণীর কামনাবাসনা; এবং অনেক সময় নিজের বোধের ওপর চাপিয়ে দেন জনসাধারণের দাবিকে। বাহ্যজগতের মুখোমুখি হয়ে বিপন্নও বোধ করতে পারেন কবি; বাস্তব রাজনীতিক জগতের জটিল ক্রিয়াকলাপের ব্যাকরণ দুর্বোধ্য মনে হ'তে পারে তাঁর। তখন তিনি নির্ভর করতে পারেন অন্যদের মতামতের ওপর, এবং পদস্খলন ঘটাতে পারেন নিজের। যদি তিনি অন্যদের মত পরিহার ক'রে বাহ্যবিষয়কে শুধু নিজের বোধের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে চান, তখনো সম্ভাবনা থাকে বিপথগামী হওয়ার। দুমুখো সমস্যায় আক্রান্ত হ'তে পারেন রাজনীতিক কবি : তিনি নিজের একান্ত বোধির সাহায্যে জনমণ্ডলির সমস্যা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডুবে যেতে পারেন ব্যক্তিগত স্বপ্নদুঃস্বপ্নে; আবার অন্যদের ব্যাখ্যার ওপর নির্ভর করতে গিয়ে মেতে উঠতে পারেন তুচ্ছাতিতুচ্ছে। ফলে তাঁর কবিতা ব্যর্থ হ'তে পারে। যে-সব রাজনীতিক কবি ব্যক্তিগত স্বপ্নদুঃস্বপ্নে মগ্ন হন, তাঁরা অনেক সময় গভীর কবিতা লিখেও গ্রহণঅযোগ্য হয়ে ওঠেন রাজনীতিক কারণে; আবার তুচ্ছাতিতুচ্ছে উদ্দীপ্ত রাজনীতিক কবিঅলা বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন ক'রেও থেকে যেতে পারেন অকবিরূপে। রাজনীতি ভুল লোককে কবিতা লেখায় উৎসাহ দিতে পারে; যাঁর হওয়ার কথা ছিলো রাজনীতিক কর্মী, কবিতার নামে তিনি লিখতে পারেন শূন্য শ্লোগান, ব্যক্তি বা দলের স্তুতি, করতে পারেন অশ্লীল গালাগালি। জনপ্রিয়তা রাজনীতিক কবির আফিম। বাঙলাদেশে জনপ্রিয়, বিখ্যাত কবিতামাত্রই সামাজিক রাজনীতিক কবিতা। জনপ্রিয়তার আফিম একবার সেবন করলে তার জন্যে আসক্তি বাড়তে থাকে, আর কবি করতালির মোহে কবিতাকে বিদায় জানিয়ে মেতে উঠতে পারেন অকবিতায়।

যখন কোনো ভূভাগে দেখা দেয় রাজনীতিক আলোড়ন-বিপ্লব, গৃহযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা আন্দোলন, স্বৈরাচারবিরোধিতা প্রভৃতি রাজনীতিক কাণ্ড, তখন কবিতায় অবলীলায় প্রবেশ করে রাজনীতি! ওই দুঃসময়ে অরাজনীতিক কবিও রাজনীতিকে বিষয় করেন কবিতার; কেননা রাজনীতি তখন অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে পড়ে তাঁর ও তাঁর গোত্রের মনুষ্যমণ্ডলির জীবনমৃত্যুর সাথে। খুব শান্ত, সুন্দর, চমৎকার রাজনীতিক পরিবেশ রাজনীতিক কবিতা লেখার প্রেরণা যোগায় না। কারণ তখন কবির চিত্ত আলোড়িত থাকে ব্যক্তিগত ভাবনাবেদনায়; কিন্তু যেই দেখা দেয় সামাজিক রাজনীতিক আলোড়ন, স্বদেশ আক্রান্ত হয় কোনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বারা, বা জাতির মুক্তির তীব্র আকাঙ্খা দেখা দেয় সাম্রাজ্যবাদী বা স্বৈরাচারী শেকল থেকে, যখন রাষ্ট্রযন্ত্র অধিকারীদের সাথে সংঘর্ষ বাধে জনগণের, সূচিত হয় বিজয়, বা ঘটে জাতির জন্যে কোনো মর্মান্তিক ঘটনা, তখন কবিতা স্বাভাবিকভাবে আন্দোলিত হয়ে ওঠে ওই সব রাজনীতিক কাণ্ড দিয়ে। রুশবিপ্লব সৃষ্টি করে মায়াকোভস্কি, নাটসিবিরোধিতা থেকে উদ্ভূত হন ব্রেখট, স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের বেদনা জন্ম দেয় আলবের্তি ও এরনান্দেজকে; নাটসিআক্রান্ত ফরাশিদেশে দেখা দেন আরাগঁ, এলুয়ার; চিলিতে নেরুদা। পশ্চিমে অজস্র

কবি রাজনীতিক কবিতা লিখেছেন; একটি লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে যে তাঁদের প্রায় সবাই সাম্যবাদী কবি। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন জর্মন হাইনে, ফরাশি ওজেন পতিয়ে (যাঁর 'আন্তর্জাতিক'-এর অসাধারণ বাঙলা রূপ দিয়েছেন নজরুল), রুশ ম্যান্ডেলস্টাম, স্পেনীয় থেসার ভেলিয়েখো, তুর্কি নাজিম হিকমত, চেক হোলুব, ও আরো অনেকে। বিশশতকে যে-রাজনীতিক প্রবণতাটি বিশ জুড়ে কবিদের অনুপ্রাণিত ক'রে উৎকৃষ্ট রাজনীতিক কবিতা সৃষ্টি করেছে, তা সমাজতন্ত্র।

বাঙলায় রাজনীতিক বা, বলা যাক, সামাজিক কবিতার ধারাটি বেশ পুরোনো। হাজার বছর আগে বাঙলা কবিতার উদ্ভবের সময়ই এ-ধারাটি উৎসারিত হয়েছিলো জীবনজর্জরিত কবিদের বুক থেকে। *চর্যাপদ*-এ প্রেম, প্রকৃতি, শ্রেণীশত্রুতা পাশাপাশি পাই, প্রতিবাদী স্বর শোনা যায় মাঝেমাঝেই। তবে আমাদের অঞ্চলে রাজনীতি ব্যাপক জনমণ্ডলিকে আলোড়িত করে উনিশশতকে; দেখা দেয় নানা সামাজিক রাজনীতিক আন্দোলন, এবং কবিতায় রাজনীতিক বিষয়রাশি ঢুকতে থাকে সচেতন ও ব্যাপকভাবে। বাঙলা কবিতা আধুনিক অর্থে রাজনীতিক হয়ে ওঠে উনিশশতকেই। দুটি বিষয় নিয়ে হাহাকার ক'রে ওঠে বাঙলা কবিতা : একটি মাতৃভূমি, অন্যটি মাতৃভাষা। দেশপ্রেম আমাদের অঞ্চলে দেখা দেয় উনিশশতকে, আর বিষয় হয়ে ওঠে কবিতার। বাঙলাদেশে দেশপ্রেম কবিতার বিষয় হয় প্রথমে ইংরেজি ভাষায়। ডিরোজিয়ো ১৮২৭-এ মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে নিয়ে প্রথম কবিতা লেখেন, বন্দনা করেন একদা গৌরবমণ্ডিত ও বর্তমানে পতিত ভারতবর্ষের। এ-বন্দনা ও হাহাকার দু-এক দশকের মধ্যেই স্থান পায় বাঙলা কবিতায়। বাঙলা ভাষায় ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় প্রথম প্রবলভাবে প্রবেশ করে সমকালীন ঘটনাবলি ও রাজনীতি। তিনি মাতৃভাষা নিয়ে কবিতা লিখেন, হাহাকার করেন, 'হায় হায় পরিতাপে পরিপূর্ণ দেশ।/ দেশের ভাষার প্রতি সকলের দ্বেষ' বলে, আর স্বদেশের গৌরব গান ক'রে বলেন, 'ভাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে, প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।/ কত রূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি, বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।' নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কাতর আবেদন জানান রানীর প্রতি : 'কোথা রৈলে মা, বিকটোরিয়া মাগো, কাতরে কর করুণা।/ মা তোমার ভারতবর্ষে, সুখ আর নাহি স্পর্শে,/প্রজারা নহে হর্ষে, সবাই বিমর্ষে,/এমন সোনার বর্ষে, খাসের বর্ষে,/কেবল বর্ষে যাতনা।' তবে ইংরেজরা যখন একের পর এক যুদ্ধে ভারতে বিস্তার ক'রে চলছিলো তাদের সাম্রাজ্য, তখন ইংরেজের বিজয়ে উল্লাস প্রকাশ ক'রেও কবিতা লিখেন ঈশ্বর গুপ্ত, পালন করেন বাদামি টেনিসনের ভূমিকা। উনিশশতকে যে-আবেদননিবেদনের রাজনীতি শুরু হয়েছিলো, দেখা দিয়েছিলো একই সাথে দেশপ্রেম ও ইংরেজভক্তি, তা ধরা পড়েছে উনিশশতকের বাঙলা রাজনীতিক কবিতায়। ভাষা ও দেশ অভিন্ন হয়ে উঠেছিলো তাঁদের চেতনায়। রামনিধি গুপ্ত লিখেছিলেন, 'বিনা স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা', মধুসূধন লিখেন 'বঙ্গভাষা' ও 'বঙ্গভূমির প্রতি' নামক কবিতা। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে' ব'লে স্বদেশপ্রেমের রাজনীতিকে আলোড়নজাগানো আবেগের সাথে প্রকাশ করেন। উনিশশতকের চল্লিশের দশক থেকেই ধারাবাহিকভাবে বিকশিত হয় বাঙলা

রাজনীতিক কবিতার ধারাটি। ১৮৬৭তে প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দুমেলা; এটি বাঙলা কবিতা ও সঙ্গীতকে রাজনীতিতে ভালোভাবে দীক্ষিত করে। হিন্দুমেলা একটি আন্দোলনের মতো দেখা দিয়েছিলো, অনুপ্রাণিত করেছিলো কবিদের। এরপর দেখা যায় বাঙলা কবিতায় রাজনীতি প্রবল হয়ে ওঠে কোনো-না-কোনো রাজনীতিক আন্দোলনকে কেন্দ্র ক'রে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, পাকিস্তান আন্দোলন, এবং এরপর ভাষা-আন্দোলন, ৬৯-এর আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ কবিতাকে রাজনীতিপূর্ণ ক'রে তোলে।

বাঙলা ভাষার সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও পরম রোম্যানটিক কবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আমৃত্যু রাজনীতিপ্রবণ; তাঁর কবিতা ও গানে এর পরিচয় রয়েছে। তাঁর কিশোর বেলায় লেখা যে-কবিতাটির সাথে তাঁর নামও মুদ্রিত হয়েছিলো, এর আগে আর কোনো কবিতার সাথে ছাপা হয় নি তাঁর নাম, সেটি ছিলো একটি রাজনীতিক কবিতা। কবিতাটির নাম 'হিন্দুমেলার উপহার'। তেরো বছর আট মাস বয়স্ক কবি হাহাকার ক'রে উঠেছিলেন ভারতের পতনে : 'ভারতকঙ্কাল আর কি এখন,/পাইবে হায়রে নতুন জীবন,/ভারতের ভস্মে আগুন জ্বালিয়া,/আর কি কখনো দিবে রে জ্যোতি।' এরপর আর বাহ্যঘটনা ও রাজনীতিকে অবহেলা করা সম্ভব হয় নি তাঁর পক্ষে। নজরুল ইসলাম বাঙলা ভাষার প্রথম কবি, রাজনীতি যাঁর কবিতার প্রধান বিষয়। ব্যক্তিগত দারিদ্র্যবশত তিনি ছিলেন দরিদ্রদেরই দলে, তাই পীড়িত শ্রেণীর জন্যে সহানুভূতি বানানোর কষ্ট করতে হয় নি তাঁকে। উৎপীড়িতের সমস্ত বিক্ষোভ যেনো একযোগে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কণ্ঠ থেকে। তাঁর কণ্ঠস্বর উচ্চ ও কোলাহলময়। প্রতিপক্ষকে তিনি শনাক্ত করতে পেরেছিলেন; কিন্তু তিনি কোনো রাজনীতিক বিশ্বাসে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন না। তাঁর বিশ্বাসের মধ্যে গলদ ছিলো, প্রগতি ও প্রতিক্রিয়াশীলতা তাঁর ভেতরে মিলেমিশে ছিলো। তাঁর কবিতার একটি বড়ো অংশই প্রতিক্রিয়াশীল; তাই প্রতিক্রিয়াশীল শাসকসম্প্রদায় তাঁকে ব্যবহার করে, এবং বর্তমানে দেখা যায় তিনি প্রতিক্রিয়াশীলদেরই প্রিয় কবি। নজরুল-আলোচকদের অধিকাংশই যে প্রতিক্রিয়াশীল, এটা প্রমাণ করে যে তিনি প্রগতির বিপক্ষেই কবিতা লিখেছেন বেশি। সুকান্তের সাথে তুলনা করলে নজরুলের রাজনীতিক ভ্রান্তি চোখে পড়ে স্পষ্টভাবে। সুকান্ত কখনো বিপথগামী হন নি, তাঁর একটি পংক্তিও প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিকে সমর্থন করে না; কিন্তু নজরুলের কবিতার এক বড়ো অংশ প্রতিক্রিয়াশীলতার জয়গানে মুখরিত।

তিরিশি কবিরাও রাজনীতিকে এড়িয়ে যান নি, তাঁদের অনেকের কবিতায়ই বিষয় হয়েছে রাজনীতি। বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় ঘুরে ফিরে পাই রাজনীতিক প্রসঙ্গ। কিন্তু তাঁরা কবিতাকে এতোটা উঁচুতে উঠোতে চেয়েছিলেন যে তাঁদের রাজনীতিক বাণী ও বিশ্বাস সাধারণের মধ্যে ছড়াতে পারে নি। বিষ্ণু দের মতো সমাজতান্ত্রিকের রাজনীতিক কবিতাও দূরে থেকে গেছে রাজনীতিক কবিতাভোগীদের থেকে। সুধীন্দ্রনাথ তিরিশিদের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি ভেবেছেন সমকালীন বিশ্বপরিস্থিতি ও রাজনীতি সম্পর্কে; দিকেদিকে একনায়কদের উত্থান দেখে হতাশাগ্রস্ত

হয়েছেন। তাঁর সংবর্ত পুরোপুরি রাজনীতিময়। একনায়কত্বের বিরুদ্ধে তাঁর মতো ঘৃণা আর কেউ প্রকাশ করেন নি বাঙলা কবিতায়। তিনি দেখেছিলেন, 'জাতিভেদে বিবিক্ত মানুষ; নিরঙ্কুশ একমাত্র একনায়কেরা।' তিনি যে ভয় পেয়েছিলেন তা সত্য হয়ে দেখা দেয় দু-এক দশকের মধ্যে, পৃথিবী প্রায় ভ'রে ওঠে স্বেচ্ছাচারী একনায়কে। তিরিশোত্তর দশকগুলোতে জীবন আরো রাজনীতি-আলোড়িত, এবং বাঙলা কবিতাও প্রবলভাবে রাজনীতিক হয়ে ওঠে। প্রচুর কবিতা রচিত হ'তে থাকে বিশেষ দল ও ইশতেহারের নির্দেশে। চল্লিশদশকের উল্লেখযোগ্য রাজনীতিক কবিমাত্রই সমাজতান্ত্রিক কবি, যাঁরা বাঙলা কবিতায় সঞ্চার করেন নতুন তাপ, বেগ ও বিস্ময়। তিরিশিদের শৈল্পিক উচ্চতা ছেড়ে তাঁরা নেমে পড়েন রাস্তায়। এ-সময়ই সমাজতান্ত্রিক অনুষঙ্গরাশি প্রবলভাবে ঢুকতে থাকে বাঙলা কবিতায়; অনেক শব্দ-বস্তু-রূপক অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়ে পড়ে প্রগতিশীলতার সাথে।

পাকিস্তানের স্বপ্ন ও প্রতিষ্ঠা একদল দুর্বল, প্রগতিবিমুখ, সুবিধাবাদী কবিকে অনুপ্রাণিত করেছিলো, যার ফলে চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে ওই পাকিস্তানবাদী কবিদের হাতে রচিত হয় একরাশ পাকিস্তানি পদ্য, যেগুলোর কোনো কাব্যমূল্য নেই। এ-পেছনমুখো পদ্যরাশির প্রতিক্রিয়াশীলতা ও শিল্পকলাহীনতা আমাদের ক্ষতি করেছে নানাভাবে। পাকিস্তানবাদী ওই কবিরা ও তাঁদের পদ্য বাঙলাদেশে আধুনিক কবিতার উন্মেষবিকাশে যেমন বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো, তেমনি অনেকখানি রোধ করেছিলো কবিতায় প্রগতিশীলতার প্রবেশ। পাকিস্তান নিয়ে এসেছিলো এক রাজনীতিক ও শৈল্পিক অন্ধকার; ওই অন্ধকার কাটানোর জন্যে দরকার ছিলো বায়ান্নোর আলোক। বায়ান্নোর পর ব্যাপকভাবে আমাদের কবিতায় প্রবেশ করে প্রগতিশীলতা; এবং এর পর বিভিন্ন রাজনীতিক আন্দোলন বাঙলাদেশের কবিতাকে রাজনীতিগর্ভ ক'রে তোরে। আমাদের কবিতা যে প্রধানত বাহ্যজীবনের কবিতা, তার চরিত্র যে গীতিকাব্যিক নয় বরং মহাকাব্যিক, তার মূলে রয়েছে আমাদের অঞ্চলের রাজনীতিক পরিস্থিতি। সুস্থ রাজনীতিক পরিবেশ এখানে কখনো প্রতিষ্ঠিত হয় নি; একের পর এক স্বৈরাচারী এসেছে, কেড়ে নিয়েছে সাধারণ মানুষের অধিকার, মিছিল নেমেছে রাজপথ উপচে, রক্তে ভিজেছে বাঙলাদেশের মাটি, এবং কবিতাও হয়ে উঠেছে তারই অনুরূপ। বাঙলাদেশের প্রায় সব কবিই কমবেশি রাজনীতিকে বিষয় হিশেবে গ্রহণ করেছেন কবিতায়। আমাদের রাজনীতিক কবিতা প্রধানত প্রতিবাদ ও বিরুদ্ধতার কবিতা : শাসকসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে এ-কবিতারাশিতে; এবং অনেক কবিতায় স্থান পেয়েছে অশ্রু ও হাহাকার। বাঙলাদেশের রাজনীতিক কবিতার পুরোটাই প্রগতিশীল; কিন্তু এর মাঝে একটি বড়ো গলদ রয়েছে। বিস্ময়কর ভণ্ডামোও প্রকাশ পায় এখানকার কবিতায় : স্বৈরশাসকসম্প্রদায়ের অনুগত ক্রীতদাসেরাও যখন কবিতা লেখে, তখন তারা জনতার পক্ষে কবিতা লেখে; কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে কাজ করে জনতার বিরুদ্ধে। রাজনীতির মধ্যে চরিত্রহীনতা এক প্রকট ব্যাপার বাঙলাদেশে; কবিতায়ও তার স্বাক্ষর রয়েছে। এখন বাঙলাদেশে দেখা দিচ্ছে বিভিন্ন দলীয় কবি : পাওয়া যাবে মুজিববাদী কবি, মস্কোপন্থী কবি, মক্কাপন্থী কবি ইত্যাদি। এখন কবিতায়

রাজনীতিক প্রগতিশীলতা প্রধান ব্যাপার হ'লেও প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রত্যাবর্তন চোখে পড়ে। পাকিস্তানবাদী কবিদের একদল উত্তরসূরীর উদ্ভব ঘটছে, যারা মৌলবাদী প্রতিক্রিয়াশীলতাকে কবিতারূপ দিতে উৎসাহী। তবে বাঙলাদেশের কবিতার মুখ্য বৈশিষ্ট্য প্রগতিশীলতা, যার লক্ষ্য স্বৈরাচারহীন গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক সুস্থ সমাজ ও রাষ্ট্র।

সারা পৃথিবী জুড়ে রাজনীতিক কবিরা এখন কবিতাকে আগ্নেয়াস্ত্রে পরিণত করতে চান; তাঁরা জানেন স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্রই শ্রেষ্ঠ কবিতা। তাঁরা চান এমন কবিতা, যা খুন করতে পারে; তাঁরা লিখতে চান আততায়ী কবিতা, যে-কবিতা পুলিশের সাথে লড়াই করতে পারে, যা বোমার মতো বিস্ফোরিত হ'তে পারে চৌরাস্তায়। তাঁরা লিখতে চান এমন কবিতা, যা স্টেনগানের মতো টাটা ক'রে গর্জে উঠতে পারে, আগুন লাগিয়ে দিতে পারে শত্রুর দুর্গে। তাই রাজনীতিক কবিতা ক্রমশ হয়ে উঠেছে শত্রুর সাথে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে লড়াইয়ের কবিতা। অর্থাৎ বিশ্বের রাজনীতিক পরিবেশ পুরোপুরি ঢুকে যাচ্ছে রাজনীতিক কবিতায়। খুন করা হয়ে উঠেছে বিশ্বরাজনীতি; তাই আজ ও আগামীকালের রাজনীতিক কবিতা হবে খুনী কবিতা। রাজনীতিক কবিতা অন্তরঙ্গ কবিতা নয়; তা এমন কবিতা নয়, যা জলের মতো ঘুরে ঘুরে বুকের ভেতর একা কথা কয়। 'হায় চিল, সোনালি ডানার চিলের' পাশে 'কারার ওই লৌহ কপাঠ, ভেঙে ফেল কররে লোপাট' উচ্চারণ করলে বোঝা যায় একটি আমাদের অন্তরঙ্গতম বেদনা ও কোমলতম দীর্ঘশ্বাসের মতো, আরেকটা চৌরাস্তায় সংঘর্ষের মতো। পৃথিবী যদি কখনো সুস্থ হয়, স্বৈরাচার ও শোষণ যদি বিলুপ্ত হয়ে যায় পৃথিবী থেকে, তাহলে হয়তো কেউ রাজনীতিক কবিতা লিখবেন না। পৃথিবীর অসুস্থতার ওপর নির্ভর করছে রাজনীতিক কবিতার ভবিষ্যৎ : যতোদিন অসুস্থ থাকবে পৃথিবী, ততোদিন থাকবে রাজনীতিক কবিতা; ততোদিন কবিতায় ঢুকবে বিক্ষোভ, প্রতিবাদ, আগ্নেয়াস্ত্র। পৃথিবী কি কোনো দিন সুস্থ হবে? সুস্থ না হ'লে কবিতায় রাজনীতি আরো হিংস্র হয়ে উঠবে; আর সুস্থ হ'লে আমরা ফিরে যাবো অন্তরঙ্গ কবিতায়, প্রেমে ও বেদনায়, অশ্রু ও দীর্ঘশ্বাসে। আমরা অপেক্ষা ক'রে আছি সে-সুন্দর সময়ের জন্যে, যখন রাজনীতি হয়ে উঠবে পুষ্পের মতো সুন্দর, আর কবিতা থেকে রাজনীতিকে বিদায় জানিয়ে কবিতাকে আর কিছু নয়, শুধুই কবিতা ক'রে তুলবো আমরা।

বাঙলাদেশের কবিতার প্রগতিশীল ও প্রগতিবিরোধী ধারা

কোনো আবেগ, বিশ্বাস, চিন্তাই দেশকাল নিরপেক্ষভাবে প্রগতিশীল বা প্রগতিবিরোধী নয়; এক কাল বা দেশে যা চমৎকারভাবে প্রগতিশীল, অন্য কাল বা দেশে তা হয়ে উঠতে পারে, এবং অনেক সময় হয়ে ওঠে, প্রগতিবিরোধী। এর বিপরীতটাও সত্য; বিশেষ কোনো কালে বিশেষ কোনো সমাজে যা প্রগতিবিরোধী, ওই সময়ে অন্য কোনো সমাজে তা গণ্য হ'তে পারে প্রগতিশীল ব'লে। তাই প্রগতিশীলতা ও প্রগতিবিরোধিতার কোনো ধ্রুব সংজ্ঞা নেই। তবে বিশশতকের শেষাংশে এসে সাধারণ সূত্র রচনার জন্যে কিছু আবেগ, বিশ্বাস, চিন্তাকে গণ্য করতে পারি প্রগতিশীল ব'লে। খুব সংক্ষেপে ও সহজে প্রগতিশীলতা হচ্ছে চেতনার বিবর্তন বা গতিশীলতা। এর ক্রিয়ায় পুরোনো হয়ে ওঠে একদিন যা ছিলো অভাবিত অভিনব, বাতিল হয়ে যায় অনেক পূজনীয় বিশ্বাস; পরিত্যক্ত হয় এমন অনেক চিন্তা, যা চেতনাকে নাড়া দিয়েছিলো তীব্রভাবে। কোনো কিছুই চিরপ্রগতিশীল নয়। বাঙলাদেশের কবিতার প্রগতিশীল ও প্রগতিবিরোধী ধারা শনাক্ত করার জন্যে, এবং তাদের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করার জন্যে সময় ও দেশের প্রেক্ষিতে নির্ণয় ক'রে নেয়া দরকার কী প্রগতিশীল আর কী প্রগতিবিরোধী। আমার সামনে রয়েছে গত একচল্লিশ বছর (১৯৪৭–১৯৮৮) ও তার কবিতা। এ–সময়ে পাকিস্তানের উদ্ভব ও বিনাশ ঘটে, গণতন্ত্রের ঘটে মৃত্যু, দেখা দেয় সামরিক স্বৈরাচার, বাঙালি প্রগতিশীলতায় দীক্ষা নেয়, ভাষা-আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রস্থাপন করে, এবং গণতন্ত্রের সমস্ত স্বপ্নের সমাধির ওপর স্বৈরাচারী একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা ঘটে। সময়টি প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বে দীর্ণ; এ–সময়ে প্রগতির প্রতিটি বিজয়ের পর তাকে পর্যুদস্ত ক'রে প্রক্রিয়াশীলতা উড়িয়ে দেয় তার কালো পতাকা।

আলোঅন্ধকারের লড়াইয়ের এ–সময়ের কী কী অবেগ, বিশ্বাস, চিন্তাকে গণ্য করবো প্রগতিশীল ব'লে? বিষয়টি দেখা দরকার শৈল্পিক ও রাজনীতিক দু–দিক থেকেই; কারণ শিল্প ও জীবনের যেমন মিলিত প্রগতিশীলতা রয়েছে, তেমনি রয়েছে নিজ নিজ প্রগতিশীলতা। যেমন, কিছু কিছু আবেগ হয়তো একটি বিশেষ দেশের বিশেষ সময়ের জন্যে প্রগতিশীল নয়, কিন্তু ওই সময়ের শিল্পকলার জন্যে প্রগতিশীল; কারণ তা আগের শিল্পপ্রথাকে পরিহার ক'রে শিল্পকলাকে এগিয়ে দিয়েছে সামনের দিকে। তিরিশের আধুনিক কবিতার কথা এ–প্রসঙ্গে মনে পড়তে পারে অনেকের। বিশেষ কোনো রাজনীতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ওই কবিতা হয়তো প্রগতিশীল নয়, কিন্তু বিশশতকের বাঙলা কবিতার ইতিহাসে ওই একটি প্রগতিশীল পরিচ্ছেদ। ষাটের দশকের বাঙলাদেশের কবিতাও এর উদাহরণ। বাঙলাদেশের গত চার দশকের সমাজ,

রাজনীতি, কবিতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রগতিশীল ব'লে গণ্য করতে চাই আমি নিচে উল্লেখিত আবেগ, বিশ্বাস, চেতনার কবিতাকে : যে-কবিতা বুর্জোয়া আবেগ বিশ্বাস স্বপ্ন চিন্তার প্রকাশ, যে-কবিতা প্রথাবিমুখ, ভবিষ্যৎমুখি, পাকিস্তানবাদবিরোধী, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্যে কাতর, যে-কবিতা ধর্মান্ধতামুক্ত, ইহজাগতিক, স্বদেশনিষ্ঠ ও আন্তর্জাতিক, স্বৈরাচারবিরোধী ও জনসংলগ্ন, যে-কবিতা কবিতা ও সাধারণ মানুষের স্বার্থ ছাড়া আর কোনো স্বার্থান্বেষী নয়, সে-কবিতাই প্রগতিশীল। যা কিছু এর বিরোধী, তাই প্রগতিবিরোধী। বাঙলাদেশের কবিতার প্রগতিশীল ও প্রগতিবিরোধী ধারা দুটির মধ্যে প্রগতিবিরোধী ধারাটিই জ্যেষ্ঠ; এর উদ্ভব ঘটে সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতাত্ত্বিক পাকিস্তানবাদ থেকে। পাকিস্তান ও পাকিস্তানবাদের ভিত্তি গ'ড়ে উঠেছিলো প্রগতিবিরোধী উপাদানে; ওই আবেগউদ্দীপনা থেকে যে-কবিতাধারা উৎসারিত হয়, তা চেতনা ও আঙ্গিকের দু-এলাকায়ই প্রগতিবিমুখ। এ-ধারার কবিতা লেখা হ'তে থাকে সাতচল্লিশের বেশ আগে থেকে। পাকিস্তানবাদী প্রগতিবিমুখ ধারার কবিতা লেখার পেছনে ভূমিকা পালন করেছিলো দুটি সাহিত্য সংঘ : কলকাতার 'পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' (১৯৪২), ও ঢাকার 'পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' (১৯৪৩)। এ-সংঘ দুটি সৃষ্টি করে প্রগতি-ও আধুনিকতা-বিমুখ সাহিত্যসৃষ্টির আবেগ। সংঘ দুটি বাঙালি মুসলমানের জন্যে কী ধরনের সাহিত্য চেয়েছিলো তার কিছুটা পরিচয় এখানে নেয়া দরকার। রেনেসাঁ সোসাইটির মূলনীতির একটি ছিলো 'জাতীয় রেনেসাঁর উদ্বোধক পাকিস্তানবাদের সাহিত্যিক রূপায়ণ'; আর ঢাকার সাহিত্য সংসদ চেয়েছিলো পাকিস্তানি সাহিত্যকে পাকিস্তানি ভাবধারা দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে। সাহিত্য সংসদের তাত্ত্বিক ছিলেন সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ও সৈয়দ আলী আহসান। সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন বাঙালি মুসলমানের জন্যে হিন্দুদের থেকে স্বতন্ত্র একটি সাহিত্য দাবি করেন; যে- সাহিত্য রচিত হবে 'ইসলামের ইতিহাস মন্থন করে'। কলকাতায় রেনেসাঁ সোসাইটির যে-সম্মেলন হয় (১৯৪৪), তাতে বিভিন্ন বক্তা বার বার অনাধুনিক সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের জন্যে কামনা প্রকাশ করেন। আবুল কালাম শামসুদ্দীন 'পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের চিন্তারাজ্যে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন' আনার সাধ ব্যক্ত ক'রে বলেন, 'পুঁথি ও লোকসাহিত্যের ভিত্তিতে আমাদের সাহিত্যকে দাঁড় করাতে হবে।' আবুল মনসুর আহমদ বলেন, 'পাকিস্তানের অর্থ যাই হউক না কেন, সাহিত্যিকের কাছে তার অর্থ তমদ্দুনী আজাদী।' তাঁর চোখে পাকিস্তান দেখা দেয় এক অদ্ভুত ইউটোপিয়ারূপে; তিনি বলেন, 'রেনেসাঁর পথে যে সর্বাঙ্গীন জলজলা পয়দা হবে, তাতে এ-ডিক্টেটর বা ও-ডিক্টেটরের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে না— প্রতিষ্ঠিত হবে এক আল্লাহর রাজত্ব। সে রাষ্ট্রে তখন এ শাসক, ও শাসিত বলে কেউ থাকবে না, সবাই হবে স্বরাট, সকলে হবে সমান। সে রাজ্যে এ ধনিক আর ও শ্রমিক বলে কেউ থাকবে না। সব ধনের মালিক হবে আল্লাহ।' এমন অদ্ভুত ধর্মীয় রাষ্ট্রের সাহিত্যও হবে ধর্মীয়। তিনি বলে,'পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যিক রেনেসাঁ আসবে এই পুঁথি-সাহিত্যের বুনিয়াদে।' এ-ধারার সাহিত্যতাত্ত্বিক প্রচারণা চলতে থাকে ভাষা-আন্দোলন পর্যন্ত। গোলাম মোস্তফা পুথিসাহিত্য, বেদেবেদেনীর গান, নজরুলের কবিতার একটি অংশকে ইসলাম ও পাকিস্তানবিরোধী

ব'লে পরিত্যাগের প্রস্তাব দেন, এবং বলেন, 'বাঙালি মুসলমানের জাতীয় অধঃপতনের মূল কারণ হইল আমাদের আর্দশবর্জিত বাংলা সাহিত্যের প্রভাব।' সাতচল্লিশ-বায়ান্নো পর্বে পাকিস্তানবাদী সাম্প্রদায়িক প্রগতিবিমুখ সাহিত্যের প্রধান প্রবক্তা হয়ে ওঠেন সৈয়দ আলী আহসান। ভাষা-আন্দোলনের কয়েক মাস আগে প্রকাশিত 'পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্যের ধারা' প্রবন্ধে তিনি বলেন, 'পাকিস্তান আন্দোলনের শুরু থেকে এই আশা সবার মনে জেগেছিলো যে পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্য ইসলামি তমদ্দুনের বাহন হবে।... প্রাক্তন সম্পূর্ণ বাংলার সাহিত্যের ভাণ্ডার কখনও নিঃশেষিত হবে না। সেগুলোর উপর উভয় বাংলারই পূর্ণ অধিকার আছে, কিন্তু এ অধিকার থাকার অর্থ এই নয় যে সেই সাহিত্যের ট্রাডিশনও আমরা গ্রহণ করবো। নতুন রাষ্ট্রের স্থিতির প্রয়োজনে আমরা আমাদের সাহিত্যের নতুন জীবন ও ভাবধারার প্রকাশ খুঁজবো। সে-সঙ্গে এটাও সত্য যে *আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র বজায় রাখবার এবং হয়তোবা জাতীয় সংহতির জন্য যদি প্রয়োজন হয় আমরা রবীন্দ্রনাথকেও অস্বীকার করতে প্রস্তুত রয়েছি* (বাঁকা অক্ষর আমার)।

প্রগতিবিরোধী পাকিস্তানবাদী রাজনীতি থেকে যে-প্রগতিবিরোধী সাহিত্যতত্ত্ব জন্ম নেয়, তা শুধু প্রগতিবিরোধী সাহিত্যই জন্ম দিতে পারে। এর পরিচয় পাওয়া যায় সাতচল্লিশ-একান্নো পর্বের বাঙলাদেশের কবিতায়। এ-সময়ের কবিরাই মেতেছিলেন বেশি পাকিস্তান নিয়ে; কয়েক বছরে তাঁরা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন একটি প্রগতিবিরোধী পদ্যের ধারা। চেতনাগত দিক দিয়ে এ-কবিতা ছিলো প্রগতি ও আধুনিকতাবিরোধী, শৈল্পিক মানও ছিলো খুবই নিচু। পাকিস্তান, কায়দে আজম, কায়েদে মিল্লাত প্রভৃতির মতো বিষয় নিয়ে তাঁরা মিশ্র বাঙলা ভাষায় পদ্য রচনা করেন, সৃষ্টি করেন একটি পাকিস্তানবাদী পদ্যের ধারা। পরে প্রগতিশীলতার দিকে আকৃষ্ট হন, এমন অনেকেও এ-সময়ে রচনা করেন প্রগতিবিরোধী পদ্য। শাহাদৎ হোসেন, ফররুখ আহমদ, সৈয়দ আলী আহসান, মুফাখখারুল ইসলাম, তালিম হোসেন ও আরো অনেকে পুষ্ট করেন প্রগতিবিরোধী ধারাটি। যে-শাহাদাৎ হোসেন এক সময় শোভাময় ভাষায় রবীন্দ্রানুসারী কবিতা লিখেছিলেন, তিনি আরবিফারসি শব্দে ভ'রে তোলেন পদ্য, ফররুখ আহমদের কবিতার নাম হয় 'কোন বিয়াবানে', 'জস্নে আজাদী', 'দিলরুবা', 'কওমী তামান্না'। 'আউস ধানের দেশে বসরার রঙ গোলাব' লাগানোর জন্যে কবিতাকে তিনি ভ'রে তোলেন মধ্যপ্রাচ্য থেকে ধার করা শব্দ ও উপমারূপকে। মুফাখখারুল ইসলাম 'তোমার শারাব পানে মন ধরে বেহুঁশ বেতাবী', 'ওগো রুখপাখী, জরীন দিনের 'বয়জা'তে তাও দানি' ধরনের পংক্তি লিখেন উদ্দীপ্ত হয়ে; সৈয়দ আলী আহসান সজ্জিত হন 'জরির জোব্বা, শেরোয়ানী আর আমামার সজ্জায়'; তালিম হোসেন চিৎকার করেন 'মোবারক হো জিন্দেগী।/মোবারক হো জিন্দেগী।/চল সিপাহী জিন্দাদিল/কর আজাদ জিন্দেগী' ব'লে।

পাকিস্তানবাদী কবিদের চোখ ফেরানো ছিলো পেছনের দিকে। তাঁদের কেউ স্বপ্ন দেখতেন পাকিস্তানে খুলাফায়ে রাশেদিনের প্রতিষ্ঠা, আবার কেউ দেখতেন ইসলামি

রাজতন্ত্রের স্বপ্ন। তাঁরা ইসলামি সমাজতন্ত্রের কথা বলতেন, কিন্তু খুবই শত্রু ছিলেন মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রের। এঁরা সামন্তবাদী ও মৌলবাদী। মানুষ তাঁদের কাছে তখনি মানুষ যখন সে মুসলমান। সৈয়দ আলী আহসান তরুণ বয়স থেকেই দীক্ষিত প্রগতিবিরোধী। চল্লিশদশকের মাঝামাঝি তিনি 'ক্যাপিটাল ও অ্যান্টিডুরিং' ও 'লাল বন্ধুদের গান' নামে দুটি কবিতা লেখেন। কবিতা দুটি সমাজতন্ত্রের নিন্দায় মুখর। তাঁর 'বেদনাবিহীন স্বপ্নের দিন' কবিতাটিতে যে-উৎসবের বর্ণনা পাওয়া যায়, তাতে 'জরির জোব্বা, আতরের পানি, মেশকের রেণু' প্রভৃতির যে-প্রাধান্য, তাতে বোঝা যায় তিনি বিশ্বাসী রাজকীয় ইসলামে, এখন যাকে কেউ কেউ বলেন 'এজিদি ইসলাম'। ফররুখ আহমদ ছিলেন মৌলবাদী; তাঁর কাম্য কঠোর প্রাচীন ইসলামি জীবনব্যবস্থা। তিনি ঘোষণা করেন, 'এই মুসলিম হুকুমত হবে ইসলামী হুকুমত।' তিনি বোঝেন নি যে পাকিস্তান তা ছিলো না, পাকিস্তান ছিলো ইসলামের নামে প্রতারণা। এ-ধারার কবিতা ক্ষতিকর ছিলো জীবন ও কবিতা দুয়েরই জন্যে। একটি আধুনিক, গণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক সমাজরাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে যেমন দু-হাতে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছে এ-কবিতা, তেমনি ঠেকিয়ে রেখেছে বাঙলাদেশে আধুনিক চেতনা ও আঙ্গিকমণ্ডিত আধুনিক কবিতার বিকাশ। এ-কবিতার জন্যেই তিরিশের কবিতাস্রোতের সাথে যুক্ত হ'তে একটু বেশি সময় লাগে বাঙালি মুসলমান কবিদের। প্রগতিবিরোধী এ-ধারাটি নিস্তেজ হয়ে পড়ে ভাষা-আন্দোলনের পরে; প্রগতির কাছে মাথা নত করে প্রগতিবিরোধী পদ্য।

প্রগতিবিরোধী পাকিস্তানবাদী পদ্যধারার পাশাপাশি বিকশিত হয়েছিলো বাঙলাদেশের প্রগতিশীল কবিতার ধারাটি। বেশ কয়েকজন কবি নীরবে প্রত্যাখ্যান করেন পাকিস্তানবাদ। তাঁরা মুখ পেছনের দিকে না ফিরিয়ে চোখ মেলে দেন চারপাশের জীবনের দিকে, নিজেদের মনের দিকে; প্রকাশ করেন জীবনের ক্লান্তি, গ্লানি ও আনন্দ, এবং কেউ কেউ প্রতিবাদ ক'রে ওঠেন পাকিস্তানি জীবনব্যবস্থার বিরুদ্ধে। কেউকেউ প্রকাশ করেন বর্জোয়া কামনাবাসনাস্বপ্ন, কেউ কেউ ডাকদেন সমাজপরিবর্তনের। আধারঅধেয়র দু-দিকেই এ-কবিতা প্রগতিশীল। তাঁরা যে-বিষয় বেছে নেন কবিতার জন্যে, তা বাঙলাদেশের কবিতার পালাবদল ঘটায়; শরীরে ও মনে কবিতা হয়ে উঠতে থাকে আধুনিক। পাকিস্তানবাদী কবিতায় মধ্যযুগের ছাপ স্পষ্ট, আর এ-কবিতায় দেখতে পাই আধুনিক কালের স্বাক্ষর। এ-কবিতা ধারা বাঙলাদেশের কবিতাকে যুক্ত করে তিরিশের আধুনিক কবিতার ধারার সাথে। কারো কারো মনে এমন ধারণা রয়েছে যে ভাষা-আন্দোলনের পর থেকেই বাঙলাদেশের কবিতায় আধুনিক ও প্রতিবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটে, তবে এ-ধারণা ঠিক নয়। এর উন্মেষ ঘটেছিলো ভাষা-আন্দোলনের আগেই; তবে বায়ান্নোর বিপ্লব এ-কবিতাকে দিয়েছিলো উড়াল দেয়ার ডানা।

বাঙালি মুসলমানি কবিতার মিশ্রভাষারীতি থেকে বিশুদ্ধ বাঙলা ভাষায় উত্তরণই এ-কবিতার প্রগতিশীলতার প্রথম লক্ষণ। দেখা যায় এ-কবিতা থেকে বাদ পড়েছে মিশ্র ও গ্রাম্য ভাষারীতি, কবি কথা বলেছেন আধুনিক মানুষের কথ্যভাষায়, শোভা সৃষ্টি

করেছেন তদ্ভব ও তৎসম শব্দের। ১৩৫৬তে যখন শামসুর রাহমান লেখেন, 'সেবার অনেক রাত্রি কেটেছিলো দ্বিধায় শঙ্কায়/সেবার অনেক রাত্রি কেটেছিলো নীল অভিশাপে', বা হাসান হাফিজুর রহমান লেখেন, 'ঝলসানো চাঁদের গলা স্পর্শে/উদ্ভ্রান্ত হে মুহূর্ত আমার/হে ওষধি মুহূর্ত আমার', তখন নতুন কণ্ঠস্বর শোনা যায়; বোঝা যায় এ-দেশের কবিতার ভাষাবদল ঘটেছে। অনুভব করতে পারি যে পরিশুদ্ধির কাল এসে গেছে। বায়ান্নোর ভাষা-আন্দোলনের পর দেখা যায় বাঙলা ভাষা-আন্দোলন বাঙলা ভাষাকেই পরিস্রুত করেছে সবচেয়ে বেশি; সে-পরিস্রুতি, আধুনিকতা, প্রগতির সূচনা হয়েছিলো এ-সময়েই, বায়ান্নোর আগে। কারণ এঁরাই তো সৃষ্টি করেছিলেন বায়ান্নোকে।

এ-সময় প্রগতিশীল কবিতার ধারায় মিলিত হয়েছিলো দুটি স্রোত : একটি স্রোত ব্যক্তিগত সুখদুঃখ, কামনা, বাসনা, স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নের কথা বলেছে, প্রকাশ করেছে তিরিশের কবিদের মতো বুর্জোয়া ভাবনাবেদনা, এবং অন্য স্রোতটি চারপাশের জীবনের দুঃস্থতার ছবি এঁকে প্রতিবাদ জানিয়েছে, স্বপ্ন দেখেছে নতুন শোষণহীন সমাজের। লতিফা রশীদ লিখেছেন, 'ফ্লাওয়ার ভাসেতে রজনীগন্ধা : স্বপ্নাভ নীল আলো/উচ্ছল প্রাণে তোমরা এসেছ—অভিজাত পরিবেশে/কবিতা পড়ব, গানও শোনাব রবীন্দ্রসঙ্গীত—/চা ও চকোলেটে উৎসব হবে, বাইরে হোক না ঝড়।' আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী, আহসান হাবীব, হাবীবুর রহমান, আবদুর রশীদ খান, শামসুর রাহমান, মযহারুল ইসলাম, সুফী মোতাহার হোসেন ও আরো কয়েকজনের কবিতায় মধ্যবিত্ত জীবন ও বুর্জোয় ভাবনাবেদনা টুকরোটুকরো লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রতিবাদীদের কবিতায় মাঝেমাঝে ধ্বনিত হয়েছে বিপ্লবের ডাক। ওয়াসেকপুরী উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন, 'মন-গড়া এই সমাজ ভাঙ্গি চল,/কারণ পশুর মতন বাঁচিয়া থাকার চেয়ে/মানুষের বেশে মৃত্যু অনেক ভালো।' তিনি বলেছেন, 'ক্ষুধার আগুন আজ দিকেদিকে আজ জ্বালো।' চৌধুরী ওসমান মরা নদীর বাঁকের রূপকে দেখেছেন জনসাধারণকে। ফিরোজ বিন হামিদ প্রেমিকাকে ডেকেছেন, 'এসো, বিবর্ণ দিনের ক্ষুধিত জনতার সাথে/এক হয়ে মিশে যাই।' আবদুল মোত্তালিব স্পষ্ট ভাষায় ডাকা দিয়েছেন সমাজতন্ত্রের পথে : 'ধর্মের নামে ধাপ্পাবাজির চলিয়া গিয়াছে কাল.../করাত, কাস্তে, পাচুন, কোদালি ফরমান দিল সবে/ কারখানায় ওই বাঁশির শব্দে তাহারি প্রতিধ্বনি—/মাটির মানুষ মাটির বাদশাহ হবে/কৃষক মজুর নিঃস্বকে বলে—বিরাট শক্তি-খনি।' সৈয়দ আবুল হুদা বলেছেন আসন্ন বিপ্লবের কথা :

বৈপ্লবিক কর্মপন্থা সুচিন্তিত
...ইস্পাত-কঠিন পণ বাহুতে-বাহুতে
...আমার রক্তের এই ফুটন্ত স্ফূর্তিই
মুক্তি-বেদনাতে জাগে পৃথিবী নতুন—
সমাসন্ন বিপ্লবী বৈশাখে।

মোতাহের হোসেন চৌধুরী ধ্বনিত করেছেন লাল দিনের সঙ্গীত : জঘন্য ধনদর্পিতের
টুটি টেপো
টুটি টেপো আর গান গাও—
আনন্দময় লাল দিনের গান,
সংক্রামক পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের গান,
লঘুতার বিদ্যুৎ-জীবনের গান।

বুর্জোয়া ভাবনাবেদনা ও প্রতিবাদের মিলিত স্রোতরেখা দুটিই বায়ান্নোর বিপ্লবের পর হয়ে ওঠে বাঙলাদেশের কবিতার প্রধান বা একমাত্র ধারা। বায়ান্নোর বিদ্রোহ ও বেদনা থেকে বছরখানেকের মধ্যে রচিত হয় কয়েকটি চমৎকার প্রতিবাদী ও বেদনাকাতর কবিতা;—হাসান হাফিজুর রহমান, ও আরো দু-একজন একটি ক'রে আবেগঘন বা উদ্দীপ্ত কবিতা লিখে উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠেন। প্রতিবাদী কবিতা প্রতিবছর লেখা হ'তে থাকলেও এ-কবিতা ক্রমেই হয়ে ওঠে ছকবাঁধা; এবং পঞ্চাশের দশক পেরিয়েই দেখি বাঙলাদেশের কবিতায় প্রধান হয়ে উঠেছে বুর্জোয়া আবেগউপলব্ধির কবিতা। এ-কবিতাই শাসন করে পুরোটা ষাটের দশককে; এখনো এ-কবিতারই প্রাধান্য চোখে পড়ে। এ-কবিতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় প্রধান ভূমিকা পালন করেন শামসুর রাহমান। ষাটের কবিতাকে মোটা সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিতে হয়তো পুরোপুরি প্রগতিশীল ব'লে মনে হবে না; কিন্তু ষাটের দশকের বাঙলাদেশের পটভূমিতে ওই কবিতা সন্দেহহীনভাবে প্রগতিশীল। ওই কবিতায় ব্যক্তির আবেগ, স্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন, গ্লানি, হতাশা, অবদমিত কামনাবাসনা, সমাজবিচ্ছিন্নতা সবই আছে; তবে ওই কবিতায় পাই গণতান্ত্রিক মানবিক মূল্যবোধ; প্রথা, ধর্মান্ধতা, মধ্যযুগীয়তা, সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্তি। পঞ্চাশের কবিরা ষাটের দশকে কবিতায় প্রতিষ্ঠা করেন আধুনিকত্ব। এ-কবিতা প্রতিবাদ না ক'রেও প্রতিবাদের কাজ করেছে, এ-কবিতা অন্তত সে-সময়ের ব্যাধিকে কাব্যিকভাবে ধারণ করেছে। তারপর ষাটের দশকে উদ্ভূত কবিরা এ-ধারায় সংযোজন করেন ষাটের নিজস্ব রক্ত। কবিতায় আধুনিক চৈতন্য প্রতিষ্ঠার কাজটি ষাট দশকে সম্পন্ন হয়। পরে ঘটে এর বিস্তার, বিকাশ।

শুধু আধুনিক চৈতন্য প্রতিষ্ঠা নয়, কবিতায় রাজনীতিক প্রগতিশীলতাও লালিত হয় ষাটের কবিতায়। ষাটের দশকটি ছিলো বাঙলাদেশে প্রথম স্বৈরাচারের দশক। ওই দশকের শুরুর দিকে কবিতায় সামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিবাদ শুরু হয় নি; কিন্তু পরোক্ষ প্রতিবাদ শুরু হয়। শামসুর রাহমানের 'হাতির শুঁড়' এর উদাহরণ। বাঙলাদেশের রাজনীতিক প্রতিবাদী কবিতা সাধারণত অনুপ্রেরণা লাভ করে কোনো-না-কোনো আন্দোলন থেকে : পঞ্চাশে ছিলো ভাষা-আন্দোলন, ষাটের দশকে উনসত্তরের আন্দোলন। ছাত্র ও জনগণের এ-অভ্যুত্থান কবিতাকে প্রবলভাবে প্রতিবাদী ক'রে তোলে; এবং তরুণ কেউ কেউ দেখা দেন, প্রতিবাদই হয় যাঁদের কবিতা লেখার প্রধান প্রেরণা। আমাদের রাজনীতিক প্রগতিশীল কবিতা সাধারণত পথপ্রদর্শক কবিতা নয়, বরং পথানুসারী কবিতা; জনগণকে পথ না দেখিয়ে এ-কবিতা জনগণের পথ অনুসরণ করে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার কবিতাকে ক'রে তোলে উদ্দীপ্ত, মুক্তিযুদ্ধের জয়গানে মুখর, উচ্চকণ্ঠ ও অনেকাংশে অগভীর। রাজনীতিক প্রগতিশীলতা অনেক সময় পরিণত হয় অপভাষায় প্রকাশিত ক্রোধে। 'ভাত দে হারামজাদা'র মতো কবিতা, এবং 'সব শালাই কবি হতে চায়'-এর মতো উক্তি কবিতাকে অন্যস্তরে নিয়ে যায়। প্রগতিশীলতা, এমনকি রাজনীতিক প্রগতিশীলতা এর চেয়ে গভীর ব্যাপার।

প্রগতিশীলতা অনেকটা সরু দড়ির ওপর হাঁটার মতো, যে-কোনো সময় ভারসাম্য হারিয়ে প্রগতিবিরোধিতার পক্ষে প'ড়ে যেতে পারেন যে-কেউ। ষাটের দশকে দেখা গেছে অনেক প্রগতিশীল আনন্দে আরোহণ করেছেন স্বৈরশাসকের 'বিপ্লবী' রেলগাড়িতে, পঁয়ষট্টিতে অনেকে কবিতা ও গান লিখেছেন 'লড়কে লেঙ্গে' ধরনের, কেউ কেউ গল্প লিখেছেন বুনিয়াদি গণতন্ত্রের। সাময়িক অধঃপতন থেকে আবার উঠে এসেছেন কেউ কেউ। বাঙলাদেশের স্বাধীনতার পর, বিশেষ ক'রে প্রথম ও দ্বিতীয় সামরিক যুগে, বহু নষ্ট মানুষের উদ্দীপনায় প্রগতিশীলতার ধারণাই নষ্ট হ'তে বসে। অনেক কালো মুদ্রা হটিয়ে দিতে চায় মুষ্টিমেয় শাদা মুদ্রাকে। এখন বড়ো দুঃসময়। এ-সময়ে এক সময়ের প্রগতিশীল রাজনীতিকেরা দাস হয়ে ওঠে স্বৈরাচারের, মুক্তিযোদ্ধারা কৃপা ভিক্ষা করে রাজাকারের। এ-সময়ে রাজাকার গায় মুক্তিযুদ্ধের গান, আর কবিতা লেখে মুক্তিযুদ্ধের, স্বৈরশাসক স্তব করে জনতার ও গণতন্ত্রের, শোষকের মুখে উচ্চারিত হয় সাম্যের স্তোত্র। এক ভণ্ড সময়ের অধিবাসী আমরা। এখন কবিতায় কেউ প্রগতিবিরোধিতার কথা বলে না, বরং প্রগতির জয়গানে মুখর ক'রে তোলে দশদিক, যদিও ব্যক্তিগত জীবনে ও সামাজিক ভূমিকায় সে চরমপ্রগতিবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল। এক সময়ের প্রগতিশীল তরুণ কবি এখন বাতিল প্রৌঢ়, ছক বাঁধা প্রগতির ও মানুষের কথা কখনো বলেন, কিন্তু পদাশ্রিত থাকেন স্বৈরশাসকের। এঁরা প্রগতিশীলতাকে ভণ্ডামোতে পরিণত করেছেন। একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ একুশ নিয়ে একটি কোমল কবিতা লিখেছিলেন; কিন্তু অল্প পরেই তিনি বেছে নেন প্রগতিবিরোধী পেশা, এবং ভূমিকা পালন করেন সুচারুরূপে। শাসকদের অনুচরের ভূমিকা তিনি পালন করেন; কিন্তু কবিতা লিখতে বসলেই জনগণ আর মানুষ আর সাধারণের পক্ষে সৈনিক হয়ে ওঠেন। তাঁর একটি কবিতার নাম 'আমার সকল কথা'। কবিতাটিতে তিনি লিখেছেন, 'আমার সময় ছিল খল প্রকৃতির/ আমার সময় ছিল/শিকারীর শ্রেষ্ঠ সময়।' খুবই চমৎকার প্রগতিশীল বক্তব্য পাই কবিতাটিতে, কিন্তু ভুলতে পারি না যে তিনি যখন শিকারীর তূণে তীর সরবরাহ ক'রে চলছিলেন তখনি লিখছিলেন এ-ভণ্ড প্রগতিশীল কবিতাটি। এমন ভণ্ডামোতে অনেকের কবিতাই পরিপূর্ণ।

এ-ভণ্ড সময়ে অধিকাংশেরই কোনো ধ্রুব বিশ্বাস নেই;— প্রগতিবিরোধী তাঁর বিশ্বাসকে ব্যক্ত করেন না, বরং ব্যক্ত করেন বিরোধী বিশ্বাস; প্রগতিশীলেরাও সবাই যে পরিচ্ছন্ন এমন নয়। তবে প্রগতিশীল ধারণা, যেগুলোকে সমাজরাষ্ট্র মেনে নিয়েছে, সেগুলোকে প্রকাশ করা যায় নির্দ্বিধায়; কিন্তু প্রগতিবিরোধী বিশ্বাস চেপে রাখা হয় সযত্নে। বাঙলাদেশের প্রগতিবিরোধী ধারার কবিদের মধ্যে নিজের অপবিশ্বাস প্রকাশ করেছেন শুধু আল মাহমুদ। শুরুতে তিনি ছিলেন প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার মিশ্রন, এখন পরিণত হয়েছেন মৌলবাদীতে; প্রগতিবিরোধীদের মধ্যে তিনিই মোটামুটি ভালো কবি। তাঁর এখনকার কবিতা নিম্নমানের ও বাতিল ভাবাবেগে ভরা। তাঁকে বুঝলে ওই ধারার অন্যদেরও বোঝা সহজ হয়ে ওঠে। তরুণ বয়সে তিনি বলেছিলেন, 'হে মোয়াজ্জিন, তোমার আহ্বানকে/কী ক'রে আজান বলো, যা এতো নির্দিষ্ট'; একটু বয়স্ক অবস্থায়

দেখেছিলেন, 'হুড়মুড় শব্দে অবশেষে/ধসে পড়ে আমাদের পাড়ার মসজিদ।' তিনি লিখেছিলেন, 'অচিরকালের মধ্যেই তাঁরা (গ্রামের লোকেরা) বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শহরগুলোকে ঘিরে ফেলবেন এবং ধনতান্ত্রিক নগর ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটিয়ে নতুন শোষণহীন নগরজীবনের পত্তন করবেন।' কিন্তু পরে তিনি হয়ে ওঠেন ফ্যাসিবাদী, শ্রেণীসংগ্রামরত তরুণেরা হয়ে ওঠে তাঁর চোখে শ্রেণীহিংসাপরায়ণ দস্যু, প্রেমিকাকে দেখতে পান জায়নামাজে, প্রেমিকার মুখের ওপর দেখেন বোরখা। নানাভাবে তিনি নির্দেশ করেছেন তাঁর মৌলবাদী প্রগতিবিরোধী অবস্থান। প্রগতিবিরোধী অন্যরা এতো 'সৎ' নন।

তাই এখন শুধু মুদ্রিত কবিতা দেখে বাঙলাদেশের কবিতার প্রগতিশীল ও প্রগতিবিরোধী ধারা শনাক্ত করা সহজ নয়; এখন নির্দেশ করতে হবে প্রগতিশীল ও প্রগতিবিরোধী কবিদের গোত্র। শুধু কবিতাকে বিশ্বাস ক'রে নয়, ব্যক্তির সামাজিক রাজনীতিক অবস্থান দেখে নির্ণয় করতে হবে, এবং উত্তরপুরুষদের জন্যে লিপিবদ্ধ ক'রে যেতে হবে কারা ছিলেন এ-সময়ের প্রগতিশীল ও প্রগতিবিরোধী কবি। একটি মানদণ্ডেই তা নির্নয় করা সম্ভব। মানদণ্ডটি হচ্ছে প্রগতিবিরোধী স্বৈরাচারের সঙ্গে সম্পর্ক। যাঁরা স্বৈরাচারের পক্ষ নিয়েছেন, যাঁরা চুপ ক'রে থেকেছেন, তাঁরা প্রগতিবিরোধী, তাঁদের কবিতার ধারা প্রগতিবিরোধী; আর যাঁরা স্বৈরাচারের বিপক্ষে, যাঁরা প্রতিবাদ করেছেন, তাঁরা প্রগতিশীল, তাঁদের কবিতার ধারা প্রগতিশীল। কবিতানুরাগীরা জানেন যে একটি কেন্দ্রের কবিরা একনায়কদের উপাসক, এবং তাঁরাই সৃষ্টি ক'রে চলছেন বাঙলাদেশের কবিতার প্রগতিবিরোধী গৌণ ধারাটি। বায়ান্নো থেকে বাঙলাদেশের কবিতার আধুনিক-প্রগতিশীল ধারাটিই প্রধান ধারা, এবং এখনো এটিই প্রধান। কবিতাপ্রেমিকেরা জানেন জাতীয় কবিতা পরিষদের কবিরা স্বৈরাচার ও একনায়কত্ব বিরোধী, মধ্যযুগবিরোধী, প্রতিক্রিয়াশীলতাবিরোধী; এবং তাঁরাই প্রাণবন্ত ক'রে রেখেছেন বাঙলাদেশের কবিতার প্রগতিশীল ধারাটি।

প্রগতিশীল কবিতার ধারাটির বৈশিষ্ট্য, তার শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন, কিন্তু আমি এখানে সে-উদ্যোগ নেয়া থেকে বিরত থাকবো। এ-ধারার কবিতা আধুনিক চেতনা ও প্রগতিশীল রাজনীতিক চেতনার মিলিত শস্য। যাঁরা গভীর আবেগ, উপলব্ধি প্রকাশ করতে পেরেছেন, যাঁরা বাঙলা ভাষার শক্তি ঠিক মতো অনুভব করতে পেরেছেন, তাঁদের হাতেই রচিত হয়েছে এ-ধারার উৎকৃষ্ট কবিতাগুলো। কিন্তু যাঁরা সাময়িক বিষয়কে বড়ো ক'রে তুলেছেন, কবিতাকে শ্লোগানে, বিশেষ ব্যক্তি বা বিশ্বাসের উচ্চকণ্ঠ প্রচারে পরিণত করেছেন, তাঁরা সাধারণের চিত্ত হরণ করলেও কবিতাকে বিশেষ ঋদ্ধ করেছেন, এমন বলা যায় না। এ-কবিতায় বাঙলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধ, স্বৈরাচার, বিভিন্ন শহীদ ও আরো অনেক জনপ্রিয় প্রসঙ্গ ফিরে ফিরে আসে, কিন্তু গভীর কাব্যিক প্রজ্ঞা প্রায়শই অনুপস্থিত থাকে। এ-কবিতার একটি অংশ প্রগতির জন্যে কবিতাকে বিসর্জন দিতে উৎসাহী। কোনো বিষয়েই গভীর কবিতা লেখা সহজ নয়; প্রকৃত প্রগতিশীল ও সত্যিকার অর্থে কবিতা রচনা বিশেষভাবেই কঠিন। বাঙলাদেশে এখন চারপাশে যে-সব কবিতা মুদ্রিত হতে দেখি, তার

অধিকাংশই অকবিতা, আর তার মধ্যে গভীর প্রগতিশীল কবিতা দুর্লভ।

বাঙলাদেশের প্রগতিবিরোধী কবিতার বীজ পাকিস্তানবাদ, আর তা লালন করেছিলো পাকিস্তান। প্রগতিশীল আন্দোলন ও কবিদের আধুনিকতায় দীক্ষা নেয়ার ফলে সে-কবিতাধারা শুকিয়ে গিয়েছিলো। প্রগতিবিরোধী রাষ্ট্রযন্ত্রের অনুপ্রেরণায় আবার তার উদ্ভব ঘটছে। প্রগতিবিরোধী রাষ্ট্রযন্ত্র সব কিছুকেই প্রগতিবিরোধী ক'রে তুলতে চাইবে; প্রগতিবিরোধী ক'রে তোলার চেষ্টা করবে জীবন ও স্বপ্নকে, শিল্পকলার সমস্ত শাখাকে। অন্ধকার বড়োই প্রবল। কবিতা, স্বপ্ন, জীবনকে প্রগতিশীল রাখার জন্যে অতি জরুরি হচ্ছে প্রগতিশীল রাষ্ট্রব্যবস্থা; কিন্তু ওই ব্যবস্থা এখনো সুদূর। তাই দরকার ব্যাপক প্রগতিশীল রাজনীতি; কিন্তু তাও বাঙলাদেশে ক্ষীণ হয়ে আসছে। জমাট প্রক্রিয়াশীলতা ঘিরে ধরেছে দেশ ও জাতিকে। কবিতার প্রগতিশীল ধারাটি কি যথেষ্ট স্রোতময় থাকতে পারবে প্রগতিবিরোধী মরুভূমিতে? প্রতিটি প্রগতিশীল কবি আজ বিপন্ন; তাঁর আবেগ নিষিদ্ধ, জীবন আক্রান্ত, কবিতা প্রকাশের স্থান সংকুচিত। ফ্যাসিবাদী আবহাওয়ার মধ্যে বাস করছি আমরা। প্রগতিশীল কবিদের সম্ভবত অচিরেই চুপ হয়ে যেতে হবে, তাঁদের আদিম প্রাণটি বাঁচানোর জন্যে হয়তো পালাতে হবে; হয়তো দেখতে হবে তাঁদের কাব্যগ্রন্থ ভস্মীভূত হচ্ছে অন্ধকারের শক্তির হাতে; হয়তো তাঁদের লাশ খুঁজে পাবে না কেউ। তবু বিশ্বাস করবো, বাঙলায় পদ্মার মতো প্রবাহিত হচ্ছে আধুনিক ও প্রগতিশীল কবিতার ধারাটি— তার ঢেউয়ের ওপর পালতোলা নৌকো, তীরে সবুজ শস্যক্ষেত্র, ওই দিকে লৌকিক গ্রাম, নগর, মানুষ, আর সে-মানুষের হৃদয়ে আধুনিকতা ও প্রগতিশীলতা। বাঙলাদেশ, বাঙলা ভাষা, বাঙলা কবিতাকে অমর হ'তে হবে আধুনিক ও প্রগতিশীল চেতনাকে বুকে নিয়েই; তার জন্যে কোনো প্রগতিবিরোধী বিকল্প নেই।

শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা

শ্রেষ্ঠ কবিতা নামের যে-কবিতাসংগ্রহ বা গ্রন্থমালা এখন কবি ও পাঠক উভয়ের কাছে আর্কষণীয়, তার সূচনা হয়েছিলো পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধে; এবং এর প্রেরণারূপে কাজ করেছিলো সম্ভবত দুটি বিবেচনা– একটি ব্যবসায়িক, অন্যটি শৈল্পিক। *শ্রেষ্ঠ কবিতা* গ্রন্থমালার সূচনাকারী প্রকাশনাসংস্থা 'নাভানা'য় হয়তো ছিলেন এমন একজন, যিনি অর্থ ও কবিতার মধ্যে একটি সুন্দর সম্পর্ক আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন; বুঝেছিলেন আধুনিক কবিদের নির্বাচিত কবিতার সংগ্রহ ব্যবসায়িক সাফল্য আনতে সক্ষম; এবং এও তিনি বুঝেছিলেন যে আধুনিক কবিতাকে জনপ্রিয় ক'রে তোলার এটি এক চমৎকার উপায়। একটি চমকও তিনি জড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন গ্রন্থমালার নামকরণে। *শ্রেষ্ঠ কবিতা* কথাটিই ছিলো চমকপ্রদ, আকর্ষণীয়; এর মধ্যে অহমিকা ও অভিনবত্ব—আধুনিক কবিতার দুই বড়ো বৈশিষ্ট্য—জড়ো হয়ে এমন আলোড়ন জাগিয়েছিলো যে তার অনুরণন এখনো অনুভব করি। প্রাগাধুনিক কবিদের নির্বাচিত, জনপ্রিয়, প্রতিনিধিত্বমূলক বা *শ্রেষ্ঠ কবিতার* সংগ্রহ বেরোতো নানা কাব্যিক নামে, *চয়নিকা, সঞ্চয়িতা, সঞ্চিতা* যার উদাহরণ। *সঞ্চয়িতা* রবীন্দ্রনাথের *নির্বাচিত* কবিতা বা *শ্রেষ্ঠ কবিতা* ; কিন্তু তাঁর কবিতাসংগ্রহের *শ্রেষ্ঠ কবিতা* নাম রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর কালের রুচিতে বাধতো। প্রাগাধুনিক কবিদের কাব্যসংগ্রহের নামে বৈচিত্র্য ও বিনয় ছিলো, যা তাঁদের স্বভাব-প্রকৃতিরই প্রকাশ। আধুনিক কবিদের কবিতাসংগ্রহের নাম থেকে কাব্যিকতা ও বৈচিত্র্যকে বিদায় জানানো হয়েছে। তাঁরা সবাই যে এক গ্রন্থমালার সোনার শেকলে জড়িয়ে পড়েছেন, তাই নয়; এ-নাম থেকেই বুঝতে পারি তাঁরা এক বিশেষ প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত;—তাঁরা আধুনিক কবি। প্রাগাধুনিক কোনো কবির কাব্যসংগ্রহের *শ্রেষ্ঠ কবিতা* নাম যেমন বেমানান, তেমনি আধুনিক কোনো কবির কবিতাসংগ্রহের কাব্যিক নামও কালাতিক্রমণতাদূষিত।

সঞ্চয়িতা বা *শ্রেষ্ঠ কবিতার* মতো সংগ্রহ বেশ উপকারী, ও অনেকটা অপকারী। উপকারী, কারণ এসব সংগ্রহে অনুরাগীরা তাঁদের প্রিয় কবিদের হাতের মুঠোয় পান, একটি তন্বী সংগ্রহে স্বস্তি ও তৃপ্তির সাথে উপভোগ করেন কবিদের, সুখ পান একথা ভেবে যে কবিকে পুরোপুরি পেয়ে গেছেন একটি বইয়ে, বেঁচে গেছেন কবির ব্যাপকতার মুখোমুখি হওয়ার বিপর্যয় থেকে; আর অপকারী, কারণ এসব সংগ্রহ থেকে তাঁরা পান কবিদের সম্পর্কে খণ্ডিত, এমনকি ভুল ধারণা। আকস্মিকভাবে সংগ্রহ থেকে বাদ প'ড়ে গেছে যে-সব উৎকৃষ্ট কবিতা, সেগুলো চ'লে যায় চোখের আড়ালে; কিছু গৌণ কবিতা সংগ্রহে জায়গা পেয়ে ভোগ করে সর্বজনীন পরিচিতি। এমন সংগ্রহ যেমন কবিকে সাধারণ অনুরাগীর কাছে পৌঁছে দেয়, তেমনি তাঁকে বাধাও দেয় সম্পূর্ণ কবির ভেতরে প্রবেশে। ছিমছামভাবে সাধারণ অনুরাগীর কাছে পৌঁছোতে হ'লে এমন সংগ্রহ, ও

খণ্ডিত হওয়া, ছাড়া কোনো উপায় নেই। 'নাভানা'র সূচিত *শ্রেষ্ঠ কবিতা* গ্রন্থমালা আধুনিক কবিতাকে জনপ্রিয় করেছে, বিবাহ বা অন্য কোনো উৎসবে উপহারের সামগ্রী ক'রে তুলেছে, এবং সাধারণ পাঠককে বাধাও দিয়েছে সম্পূর্ণ কবির অভ্যন্তরে প্রবেশে। *শ্রেষ্ঠ কবিতা* গ্রন্থমালা শুরু হয়েছিলো *বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা* (ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩) দিয়ে, এবং পরবর্তী দু-বছরে বেরোয় *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা* (মে ১৯৫৪) ও *বিষ্ণু দের শ্রেষ্ঠ কবিতা* (জুন ১৯৫৫)। বেশ পরে বেরোয় *অমিয় চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ কবিতা* (জুন ১৯৭৩); এবং সম্প্রতি, দুঃখজনকভাবে, বেরিয়েছে *সুধীন্দ্রনাথ দত্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা* । এর মাঝে পঞ্চাশ ও ষাটের বিভিন্ন কবির, যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই গৌণ, *শ্রেষ্ঠ কবিতা* বেরিয়েছে। এমন অনেক কবির *শ্রেষ্ঠ কবিতা* বেরিয়েছে; যাঁদের সমগ্র কবিতাবলির মধ্যে তিন-চারটির বেশি ভালো কবিতাই দুষ্প্রাপ্য।

শ্রেষ্ঠ কবিতা কেমন কবিতা, কোন কবিতা 'শ্রেষ্ঠ – এ-প্রশ্ন উঠেছিলো গ্রন্থমালার সূচনাতেই। বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে 'শ্রেষ্ঠ' অভিধাটি নিয়ে অস্বস্তি বোধ করেছিলেন, নিরুপায় হয়েই মেনে নিয়েছিলেন গ্রন্থমালার অভিধাটি। শুধু জীবনানন্দই সহজে মেনে নিয়েছিলেন নামটি, অন্তত তাঁর *শ্রেষ্ঠ কবিতার* ভূমিকায় নাম নিয়ে অস্বস্তির কোনো দাগ তিনি রেখে যান নি। বুদ্ধদেব 'শ্রেষ্ঠ' কথাটিকে গ্রহণ করেছিলেন 'সমালোচনায় ব্যবহৃত একটা সুবিধাজনক ব্যবস্থারূপে'; তাঁর মতে, 'ওটা একটা চলতি কথা, ব্যবহারযোগ্য নাম মাত্র।' তিনি অনুরোধ জানিয়েছিলেন 'শ্রেষ্ঠ' কথাটিকে আক্ষরিকার্থে গ্রহণ না করতে। কবিতানির্বাচনের রীতির তিনি দিয়েছিলেন এমন ব্যাখ্যা : '*বন্দীর বন্দনায়* তরুণ বয়সে প্রথম যখন আমি নিজেকে আবিষ্কার করেছিলুম, সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত যে-সব কবিতায় আমার 'আমি' সত্য হ'য়ে প্রকাশ পেয়েছে ব'লে আমার মনে হয়, তা-ই থেকে সংকলন ক'রে এই বইটি সাজিয়েছি।' *সঞ্চয়িতার* ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথও বলেছিলেন এমনি কথা। যে-পর্বে তাঁর 'কাব্য-ভূসংস্থানে ডাঙা জেগে উঠতে আরম্ভ' করে, সে-পর্ব থেকেই কবিতা সংগ্রহ শুরু করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, যদিও এর আগের কয়েকটি কবিতাও তিনি নিয়েছিলেন ইতিহাসের অনুরোধে। তাহলে কি বলবো *বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা* হচ্ছে *বুদ্ধদেব বসুর সঞ্চয়িতা ?* তা বলা যাবে না; তাহলে ওই সংগ্রহে কবিতার সংখ্যা আরো বেশি হতো। বিষ্ণু দে বলেছেন, 'লেখকের পক্ষে নিজের লেখার সংকলনকে শ্রেষ্ঠ কবিতা বলা সমীচীন কিনা সেটা ভাববার কথা। কিন্তু এই বই এক গ্রন্থমালার একটি, তাই সেই মালার নামানুসারেই এর নিরুপায় নামকরণ।'

তাহলে ওই গ্রন্থমালার নামের 'শ্রেষ্ঠ' কথাটি সম্পূর্ণ নিরর্থক? এটা শুধু ব্যবসায়িক চমক মাত্র? তা মনে হয় না। ওগুলো যদি নির্বাচিত কবিতার সংগ্রহ হতো, তাহলে প্রতিটি সংগ্রহে কবিতার সংখ্যা আরো অনেক বেশি হতো। *বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতায়* (১৯৭৭) ১৭টি মৌলিক কাব্যগ্রন্থ থেকে কবিতা সংকলিত হয়েছে ৭৭টি; আর অনুবাদ কবিতা রয়েছে ২৬টি, ছোটোদের কবিতা ৪টি। *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতায়* (১৯৫৪) ৭টি কাব্য থেকে গৃহীত হয়েছে ৭২টি কবিতা। *অমিয় চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ*

কবিতায় (১৯৭৩) ১১টি কাব্য থেকে ১০৬টি, অগ্রন্থিত ৫টি, ও ৯টি অনুবাদ কবিতা গৃহীত হয়েছে। কবিতার সংখ্যাল্পতা থেকে ধারণা করতে পারি যে কবিতা নির্বাচনে পালিত হয়েছে কঠোর নীতি। তিরিশের কবিদের মধ্যে দুজনের, সুধীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দের, সমগ্র কবিতা সংখ্যায় খুব বেশি নয়। সুধীন্দ্রনাথের ৬টি কাব্যে মৌলিক কবিতা রয়েছে ১৩০টি, আর তাঁর অনুবাদিত কবিতার সংখ্যা ৫৫। জীবনানন্দ কবিতা লিখেছিলেন ৪০০র মতো। আমি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের *শ্রেষ্ঠ কবিতার* কথা ভাবতেই পারি না, তাঁর *কাব্যসংগ্রহ* কেই শ্রেষ্ঠ কবিতার সংগ্রহ ব'লে মনে করি; আর *জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতায়* অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে ২০০র মতো কবিতা। কিন্তু প্রত্যেকের *শ্রেষ্ঠ কবিতা* য়ই পরিমিতসংখ্যক কবিতা গৃহীত হয়েছে। এ-পরিমিতির পেছনে হয়তো ব্যবসায়িক বিবেচনা ছিলো, কিন্তু কাব্যিক বিবেচনাও হয়তো উপেক্ষিত ছিলো না। ওই কবিরা হয়তো আসলেই, নিজ নিজ মানস মানদণ্ডে, বেছে নিতে চেয়েছিলেন শ্রেষ্ঠ কবিতাগুচ্ছ, যদিও কবিতা চিনতে ভুলও করেছিলেন প্রত্যেকেই। ভাবতে বিস্ময় লাগে ওই সময় সুধীন্দ্রনাথের *শ্রেষ্ঠ কবিতা* প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয় নি। সুধীন্দ্রনাথ কি বিশ্বাসী ছিলেন না এ-গ্রন্থমালায়; নাকি তাঁর ব্যবসায়িক মূল্য ছিলো না?

শ্রেষ্ঠ কবিতা কাকে বলবো, যদি একে শুধু কথার কথা ব'লে মেনে না নিই? এটা ঠিক যে কবিতার গুণ বিচারের কোনো অবিচল মানদণ্ড নেই; মেপে, হিশেব ক'রে, ওজন ক'রে কোনো কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় করা যায় না। তবে বার বার প'ড়ে ও বিবেচনা ক'রে, কবিতার বিষয়, বাণী, প্রকাশ ও আরো বহু বিষয় অনুভব, উপলব্ধি, বিচার ক'রে কোনো কবির উৎকৃষ্ট কবিতাগুলো শনাক্ত করা সম্ভব। কিছু কবিতা নিয়ে হয়তো চিরকালই দ্বিমত থেকে যাবে, কবির ব্যক্তিগত আবেগবশত কোনো কোনো কবিতা তাঁর কাছে হয়তো গণ্য হবে উৎকৃষ্ট ব'লে, তবে তা হয়তো প্রাজ্ঞ, উৎকৃষ্ট কবিতা দ্বারা সংক্রামিত হওয়ার প্রতিভাসম্পন্ন সমালোচকের কাছে ততোটা মূল্যবান ব'লে মনে হবে না; বা কিছু কবিতা নিয়ে বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন কালে বিতর্ক ক'রে যাবেন। তা সত্ত্বেও কবির শতকরা নব্বইটি ভালো বা উৎকৃষ্ট কবিতা শনাক্তি অসম্ভব ব্যাপার নয়। কোনো কবির শ্রেষ্ঠ কবিতা বলতে আমি বুঝি ওই কবির এমন কবিতা, যাতে বিষয়, বাণী, ভাষার উৎকৃষ্ট সমন্বয় ঘটেছে, যা আমাদের আবেগ বা বোধি বা চেতনাকে আলোড়িত করে, যা শুধু ওই কবির রচনাগুলোর মধ্যেই উৎকৃষ্ট নয়, বরং বাঙলা ভাষার সমগ্র উৎকৃষ্ট কবিতার পংক্তিতে স্থান পাওয়ার উপযুক্ত। কোনো কবির শ্রেষ্ঠ বা উৎকৃষ্ট কবিতা শুধু তাঁর ভালো কবিতা হ'লেই চলবে না, ওই কবিতাকে বাঙলা ভাষার সমস্ত ভালো বা উৎকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ কবিতার সমতুল্য বা কাছাকাছি গুণসম্পন্ন হ'তে হবে। এ-মানদণ্ডে অবশ্য সব কবির *শ্রেষ্ঠ কবিতা* সংগ্রহ বেরোতে পারে না; কোনো অতিগৌণ কবির শ্রেষ্ঠ কবিতা কোনো প্রধান কবির সাধারণ মানের কবিতার পর্যায়ে উঠতেও ব্যর্থ হ'তে পারে। কোনো কবির শ্রেষ্ঠ কবিতা নির্ণয়ের মানদণ্ড কঠোর হওয়া দরকার; ওই মানদণ্ড এমন কবিতা বেছে নেবে যাকে মনে করতে পারি মহাকালের উদ্দেশে উৎসর্গিত কবিতা। এ-কবিতা *নির্বাচিত কবিতা* নয়। নির্বাচিত কবিতায় কবির বিভিন্ন মেজাজ ধরার জন্যে ভালো, সাধারণ, অতি সাধারণ

কবিতা নেয়া যেতে পারে, যাতে কবির বিভিন্ন রূপ ধরা পড়ে কবিতাগুলোতে; কিন্তু *শ্রেষ্ঠ কবিতা* সংগ্রহে সে-সুযোগ নেই। কবিকে এখানে হ'তে হবে নির্মম, কাতরতাহীন; তিনি বেছে নেবেন শুধু সে-কবিতাগুলো, যা তাঁর স্বপ্ন ও সত্তার শ্রেষ্ঠ ভাষিক প্রকাশ। কিন্তু চল্লিশ-পঞ্চাশ-ষাটের কবিদের যে-সব *শ্রেষ্ঠ কবিতার* সংগ্রহ বেরিয়েছে, তাতে এমন কোনো মানদণ্ড ব্যবহৃত হয় নি। ওগুলোতে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে গৌণ কবিদের আত্মপ্রচারপ্রবণতা ও বণিকবৃত্তি। এ-কবিরা হয়তো একথা ভেবে তৃপ্তি পান যে জীবনানন্দ-বুদ্ধদেবের *শ্রেষ্ঠ কবিতার* সংগ্রহ রয়েছে, এবং রয়েছে তাঁদেরও, তাই তাঁরাও তিরিশের প্রধানদের পংক্তিভুক্ত।

শামসুর রাহমান, তিরিশের পাঁচ প্রধান আধুনিকের পর, বাঙলা ভাষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কবি। ব্যাপকতায়, উৎকর্ষে ও প্রাচুর্যে শামসুর রাহমান এখন অদ্বিতীয়। কবিরা বিভিন্ন চরিত্রের হয়ে থাকেন; কেউ উন্মত্ত উন্মাতাল, কেউ ভাবাবেগভাবালুতাগ্রস্ত, কেউ দায়িত্বশীল। শামসুর রাহমান দায়িত্বশীল চরিত্রের কবি; তাঁর দায়িত্ব ব্যক্তি, সমাজ, সভ্যতা ও কবিতা অর্থাৎ মানুষ যা কিছু মূল্যবান ব'লে গণ্য করে, তাঁর সমস্ত কিছুর প্রতিই। তাঁর কবিতা মত্ততা বা বাতিকগ্রস্ততা নয়, আত্মকেন্দ্রিক হাহাকার বা উচ্ছ্বাস নয়, তাঁর কবিতা ব্যক্তি, সমাজ, সভ্যতা, মানবতার প্রতি শৈল্পিক দায়িত্বপালন। শুরুতে, *প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগেতে*, তিনি ছিলেন বহিরস্থিত; কিন্তু ক্রমশ, *রৌদ্র করোটিতে, বিধ্বস্ত নীলিমা, নিরালোকে দিব্যরথ*-এ, ঢোকেন তিনি অব্যবহিত জীবন, সমাজ, ও সভ্যতায়; এবং অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎকে সংশ্লেষিত ক'রে লেখেন এমন একরাশ কবিতা, যা বিশশতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙলা ভাষায় লেখা কবিতাবলির এক অতি উজ্জ্বল অংশ। এ-সময়ে লেখা বীর্যময় কবিতাগুলোর এক বড়ো অংশের রচয়িতা শামসুর রাহমান। শামসুর রাহমান বাঙলা কবিতাকে তিরিশি কবিতার অন্তর্জগৎ থেকে নিয়ে আসেন বাইরে, অব্যবহিত প্রতিবেশপৃথিবীতে; কবিতাকে ঋদ্ধ করেন বহির্জগতের সমস্ত কলরোল ক্লান্তি আনন্দ ও উজ্জ্বলতায়। তাই তাঁর কবিতা সাধারণত ধ্যান বা স্তব বা গান বা শাশ্বত শ্লোক নয়; তা সমকালীন জীবনসৃষ্টি। তাঁর কবিতায় বিশশতকের দ্বিতীয়াংশে বিশ্বে ও বাঙলায় বসবাসের সমস্ত জ্বালা ক্ষোভ উল্লাস বোধ করা যায়। চারপাশে এমন কিছু নেই যাকে তিনি কবিতায় পরিণত করতে উদ্যোগী হন নি। তাঁর কবিতায় হতাশা, আশা, ক্ষোভ, বিদ্রোহ, বন্দীত্ব, আনন্দ, স্বাধীনতা, প্রেম, কাম, রাজনীতি, এবং তিনি নিজে ও আরো অনেক বিষয় অজস্র পংক্তিতে বিন্যস্ত হয়ে আছে। তাঁর কবিতায় রয়েছে আবেগ, বাসনা, কামনার তীব্রতা; রয়েছে ব্যক্তিগত স্বপ্নদুঃস্বপ্নযন্ত্রণা; রয়েছে সমকালের শরীর-মন নিংড়ে তুলে আনা বাণী; রয়েছে সমকালের বিচিত্র সংবাদ। শামসুর রাহমানের কবিতার এক অংশ উড্ডীন পাখির মতো অমল; আরেক অংশ সমকালের দলিল। গত কয়েক দশকের বাঙলাদেশকে, তার বাহ্যজীবন ও আন্তর আলোড়নকে, শামসুর রাহমানের কবিতার মতো আর কোথাও পাওয়া যায় না— উপন্যাসে পাওয়া যায় না, সংবাদপত্রে পাওয়া যাবে না। প্রথম চারটি কাব্যে শামসুর রাহমান প্রতিষ্ঠা করেন নিজেকে, তাঁর চারিত্র সম্পূর্ণরূপে মুদ্রিত প্রথম চারটি কাব্যে; এবং পঞ্চম কাব্য, *নিজবাসভূমে*, থেকে ঘটে তাঁর বিচিত্র বিকাশ :

ঢোকেন রাজনীতিতে, প্রতিবাদের জগতে, বন্দী জীবনে, মানুষের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভেতরে; হয়ে ওঠেন উচ্ছলিত উদ্বেলিত। পঞ্চাশোত্তর শামসুর রাহমান অবশ্য যতোটা কাব্যিক, ততোটা কবিতামণ্ডিত নন; প্রতিবেশের ডাকে বড়ো বেশি তাড়াতাড়ি সাড়া দিতে গিয়ে কবিতাকে ক্ষুণ্ণ করেছেন তিনি মাঝেমাঝেই, কিন্তু এর মাঝেও প্রতিভার দ্যুতি উজ্জ্বল। ব্যক্তিগতভাবে আমি এখন তাঁর কবিতায় পেতে চাই প্রাজ্ঞতা, স্থৈর্য্য, প্রশান্ত উপলব্ধি; কিন্তু শামসুর রাহমান চরিত্রে তারুণ্যধর্মী, ষাট ছুঁই-ছুঁই বয়সেও তাঁর মধ্যে যে-তারুণ্যের উচ্ছলতা পাই, ততোটা প্রাজ্ঞের প্রশান্ত উপলব্ধি পাই না। এ-বয়সে তিনি যখন ভাব ও ভাষায় সংহত হন, শান্ত ও প্রশান্ত উচ্চারণ করেন, তখন তাঁর রচনায় কবিতা পাই; কিন্তু যখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েন, ভাব ও ভাষা উভয়কেই তারুণ্যের আবেগে উদ্বেলিত করেন, তখন ভালো পদ্য হয়তো পাই, কিন্তু তাঁর কাছে থেকে যা পেতে চাই, তা পাই না। তবে চার দশকেরও বেশি সময় কবিতার কাছে একান্তভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ থেকে তিনি যা রচনা করেছেন, তা বাঙলা কবিতার গৌরব; এ-কবিতার কাছে শুধু আজকের নয়, ভবিষ্যতের বাঙালিকেও ফিরে ফিরে আসতে হবে।

শামসুর রাহমানের কবিতার প্রাচুর্য লক্ষণীয়; প্রাচুর্যের দিকে বাঙলা কবিতায় তাঁর স্থান সম্ভবত দ্বিতীয়। কাব্য ও কবিতার সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের স্থান এখনো শীর্ষে; এর পরেই শামসুর রাহমানের স্থান। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা সাঁইত্রিশ। তিরিশের কারো এতোগুলো কবিতাগ্রন্থ নেই; এবং কারো কবিতাই সংখ্যায় সম্ভবত আট-ন শোর বেশি হবে না। জীবনানন্দ-সুধীন্দ্রনাথ-অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার সংখ্যা বেশ কম; বুদ্ধদেব ও বিষ্ণু দে তাঁদের থেকে অনেক বেশি কবিতা লিখেছেন, কিন্তু তা আট-ন শোর বেশি হবে না ব'লেই আমার ধারণা। শামসুর রাহমানের সাঁইত্রিশটি কাব্যগ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে এক হাজার চার শো সাঁইত্রিশটি কবিতা। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম, পাঠকদের সুবিধার জন্যে, উল্লেখ করছি : *প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* (১৩৬৬), *রৌদ্র করোটিতে* (১৯৬৩), *বিদ্ধস্ত নীলিমা* (১৩৭৩), *নিরালোকে দিব্যরথ* (১৩৭৫), *নিজবাসভূমে* (১৯৭০), *বন্দীশিবির থেকে* (১৯৭২), *দুঃসময়ে মুখোমুখি* (১৩৮০), *ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা* (১৩৮১), *আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি* (১৩৮১), *এক ধরনের অহংকার* (১৩৮১), *আমি অনাহারীর* (১৩৮২), *শূন্যতায় তুমি শোকসভা* (১৯৭৭), *বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে* (১৯৭৭), *প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে* (১৯৭৮), *ইকারুসের আকাশ* (১৯৮২), *মাতাল ঋত্বিক* (১৯৮২), *উদ্ভট উটের পিটে চলেছে স্বদেশ* (১৯৮২), *কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি* (১৯৮৩), *নায়কের ছায়া* (১৯৮৩), *এক ফোঁটা কেমন অনল* (১৯৮৩), *আমার কোনো তাড়া নেই* (১৯৮৪), *যে অন্ধ সুন্দরী কাঁদে* (১৯৮৪), *অস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই* (১৯৮৫), *শিরোনাম মনে পড়ে না* (১৯৮৫), *ইচ্ছে হয় একটু দাঁড়াই* (১৯৮৫), *ধুলায় গড়ায় শিরস্ত্রাণ* (১৯৮৫), *হোমারের স্বপ্নময় হাত* (১৯৮৫), *দেশদ্রোহী হ'তে ইচ্ছে করে* (১৯৮৬), *অবিরাম জলভ্রমি* (১৯৮৬), *টেবিলে আপেলগুলো হেসে ওঠে* (১৯৮৬), *আমার ক'জন সঙ্গী* (১৯৮৬), *ঝর্না আমার আঙুলে* (১৯৮৭), *স্বপ্নেরা ডুকরে ওঠে বারবার* (১৯৮৭), *খুব বেশি ভালো থাকতে নেই* (১৯৮৭), *বুক*

তার বাংলাদেশের হৃদয় (১৯৮৮), *মঞ্চের মাঝখানে* (১৯৮৮), *হৃদয়ে আমার পৃথিবীর আলো* (১৯৮৯)। সাঁইত্রিশটি কাব্য আর দেড় হাজারের মতো কবিতা যাঁর, যিনি এখন আমাদের শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক ফ্যাশন, তাঁর কবিতার বিভিন্ন ধরনের সংগ্রহ বেরোনো স্বাভাবিক, ও খুবই প্রয়োজনীয়। ব্যবসায়িক প্রেরণায় নানা ধরনের সংগ্রহ বেরোতে পারে তাঁর কবিতার; এবং কাব্যিক প্রয়োজনে *নির্বাচিত* বা *শ্রেষ্ঠ কবিতা* র সংগ্রহ প্রকাশ অনিবার্য। তাঁর ব্যাপকতা ও প্রাচুর্য পাঠকের জন্যে বিপজ্জনক, সমালোচকের জন্যে সংকটজনক। তাই খুবই দরকার শামসুর রাহমানের কবিতার একটি ছিমছাপ সংগ্রহ, বা 'ছিমছাম শামসুর রাহমান', যা হাতে নিয়ে অনুরাগীরা তৃপ্তি পাবেন, উপহারদাতা ও প্রাপকেরা উল্লসিত হবেন। প্রকাশকেরা অনুরাগীদের পরিতৃপ্তি জোগাতে যে বিলম্ব করেন নি, তা খুবই আনন্দদায়ক।

শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা র দুটি স্বতন্ত্র সংগ্রহ বেরিয়েছে;— একটি ঢাকা, অন্যটি কলকাতা থেকে। *শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা* র প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৯৭৬-এ; দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোয় ১৯৮৩তে; তৃতীয় সংস্করণ বেরোয় ১৯৮৯-এ। এ-সংগ্রহের তিনটি সংস্করণেরই প্রকাশক ঢাকার জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী। এ-সংগ্রহটিই আমার আলোচনার বিষয়। তবে কলকাতা (দে'জ পাবলিশিং) থেকেও *শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা* র একটি সংগ্রহ বেরিয়েছিলো ১৯৮৫তে। *শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা* র প্রথম সংস্করণ যখন বেরোয় তখন *শ্রেষ্ঠ কবিতা* কথাটি মামুলি কথায় পরিণত হয়ে গেছে, এবং এ-নাম তাঁকে কিছুটা দ্বিধান্বিত করেছে। তিনি, প্রথম সংস্করণের ভূমিকায়, বলেছেন, 'এই বইয়ের নামকরণে আমার বিন্দুমাত্র সায় নেই; শুধু প্রকাশক বন্ধুর প্রবল ইচ্ছার প্রতি সম্মান দেখানোর জন্যেই শেষ পর্যন্ত গ্রন্থের ললাটে শ্রেষ্ঠ শব্দটির তিলক কাটতে হলো।' তাই বুঝি নামের আবেদনজাগানো 'শ্রেষ্ঠ' কথাটিকে মেনে নিয়ে তিনি প্রস্তুত করতে চেয়েছেন একটি *নির্বাচিত কবিতা* র সংগ্রহ। বলেছেন, 'কবিতার বাছাইয়ের ব্যাপারে তেমন কোন পরিকল্পনার বশীভূত হই নি, তবে বিষয়-বৈচিত্র্যের দিকে নজর রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।' বিষয়-বৈচিত্র্যের দিকে চোখ রাখ হচ্ছে *নির্বাচিত কবিতা* র দৃষ্টিভঙ্গি। *শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা* র তিনটি সংস্করণের তুলনা করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সংগ্রহটি *শ্রেষ্ঠ কবিতা* থেকে ক্রমশ ঝুঁকছে *নির্বাচিত* কবিতার দিকে; —এ-সংগ্রহে প্রথম সংস্করণ থেকে দ্বিতীয় সংস্করণে, ও দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে তৃতীয় সংস্করণে 'বিষয়-বৈচিত্র্য' বেড়েছে, এবং ভালো কবিতা ক্রমিকভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। সব কাব্যের প্রতি প্রায়-সমান প্রীতিবশত অবিচার করা হয়েছে উৎকৃষ্টতর কাব্যের প্রতি; আর বিষয়-বৈচিত্র্যের দাবিতে কিছুটা বেশি আদর লাভ করেছে তুলনামূলকভাবে কম-ভালো কবিতা। যতোই নতুন সংস্করণে পৌঁচেছে সংগ্রহটি, ততোই বেশি মেটাতে চেয়েছে সমকালীনতার দাবি; এর ফলে বাদ পড়েছে বহু ভালো, জনরুচির উর্দ্ধের, কবিতা; আর সমকালগ্রস্ত প্রতিবাদী পদ্য রাজনীতিক জোরেই দখল করেছে অনেক বেশি জায়গা। তিনটি সংস্করণের মধ্যে প্রথম সংস্করণে কবিতা নির্বাচিত হয়েছিলো কবিতার কথা বেশি মনে রেখে, আর তৃতীয় সংস্করণে কবিতা নির্বাচিত হয়েছে

পাঠকের কথা মনে রেখে। তৃতীয় সংস্করণে ঘোষিত হয়েছে সাধারণ জনপ্রিয় রুচির জয়।

শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা প্রথম সংস্করণে (১৯৭৬) ১১টি কাব্যগ্রন্থ ও অগ্রন্থিত কবিতাবলি থেকে সংকলিত হয়েছিলো ১৭৬টি কবিতা; দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৮৩) ১৭টি কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয় ১৯৫টি কবিতা; এবং তৃতীয় সংস্করণে (১৯৮৯) ৩৫টি কাব্যগ্রন্থ ও অগ্রন্থিত কবিতাবলি থেকে সংকলিত হয়েছে ৩১০টি কবিতা। এতে কোনো অনুবাদ কবিতা ও ছোটোদের কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয় নি। *বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতায়* (১৯৭৭) সব মিলে কবিতা রয়েছে ১০৭টি; *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতায়* (১৯৫৪) কবিতা রয়েছে ৭২টি; *বিষ্ণু দের শ্রেষ্ঠ কবিতা* য় (১৯৬২) সব মিলে কবিতা রয়েছে ৮৬টি। *শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা* (১৯৮৯) বাঙলা ভাষার দু-অঞ্চলে প্রচলিত *শ্রেষ্ঠ কবিতা* র সংগ্রহগুলোর মধ্যে বৃহত্তম। কলকাতা থেকে প্রকাশিত *শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা* য় (১৯৮৫) ২২টি কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে ১০৮টি কবিতা। শামসুর রাহমানের মোট গ্রন্থিত কবিতা রয়েছে ১৪৩৭টি। যদি ধ'রে নিই কবির শতকরা বিশ ভাগ কবিতা শ্রেষ্ঠ কবিতা ব'লে গণ্য হতে পারে, তাহলে ২৮৭টি কবিতা তাঁর সংগ্রহে সংখ্যাতাত্ত্বিকভাবেই স্থান পেতে পারে। শামসুর রাহমান বা তাঁর প্রকাশক তৃতীয় সংস্করণের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতিতে অবশ্য খুব সজাগ ছিলেন না; তাঁর প্রমাণ পাই এখানে যে *তোমারের স্বপ্নময় হাত* (১৯৮৫) কাব্যটি এ-সংগ্রহ থেকে বাদ প'ড়ে গেছে। ওই কাব্যগ্রন্থ থেকেও কয়েকটি কবিতা সংকলিত হ'তে পারতো। তাহলে এ-সংগ্রহে কবিতার সংখ্যা আরো বাড়তো।

বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে এ-সংগ্রহে যে-সব কবিতা সংকলিত হয়েছে, সেগুলোর সংকলন কতোটা সঠিক হয়েছে? ওগুলোর প্রতিটিই কি বহন করে শামসুর রাহমানের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর? কোনো বই থেকে সংকলিত হয়েছে বেশি কবিতা, আর কোনো বই থেকে কম কবিতা; ধ'রে কি নিতে পারি যে বেশি কবিতা গৃহীত হয়েছে যে-বই থেকে সেটি উৎকৃষ্ট যে-বই থেকে কম কবিতা নেয়া হয়েছে, তার থেকে? এ-সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো স্বাভাবিক। তাহলে বেশ গোলযোগ দেখা দেবে। যেমন : *রৌদ্র করোটিতে* থেকে নেয়া হয়েছে ১০টি, *বিধ্বস্ত নীলিমা* থেকে ৯টি, *নিরালোকে দিব্যরথ* থেকে নেয়া হয়েছে ৯টি কবিতা; এবং *নিজবাসভূমে* থেকে কবিতা নেয়া হয়েছে ১১টি, *শিরোনাম মনে পড়ে না* থেকে ১৩টি, *টেবিলে আপেলগুলো হেসে ওঠে* থেকে ১৬টি, আর *বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়* থেকে ১৭টি। সংকলিত কবিতার সংখ্যানুসারে *রৌদ্র করোটিতে, বিধ্বস্ত নীলিমা, নিরালোকে দিব্যরথ* -এর থেকে অনেক বা প্রায় দ্বিগুণ উৎকৃষ্ট *নিজবাসভূমে, শিরোনাম মনে পড়ে না, টেবিলে আপেলগুলো হেসে ওঠে,* ও *বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়।* কিন্তু কাব্যিক বিচারে প্রথম কাব্যগ্রন্থ তিনটি অনেক উৎকৃষ্ট পরবর্তী কাব্য চারটির থেকে। শামসুর রাহমান অর্থই হচ্ছে *রৌদ্র করোটিতে* বা *বিধ্বস্ত নীলিমা* বা *নিরালোকে দিব্যরথ* । তিনি যদি *শিরোনাম মনে পড়ে না* বা *টেবিলে আপেলগুলো হেসে ওঠে* বা *বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়* -এর কবিতাগুলো

কোনোদিন নাও লিখতেন, তাহলেও তিনি শামসুর রাহমানই থাকতে; তিনি যদি *শিরোনাম মনে পড়ে না* বা *বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়* লিখতেন, কিন্তু *রৌদ্র করোটিতে* র বা *বিধ্বস্ত নীলিমা* র কবিতাগুচ্ছ না লিখতেন, তাহলে তিনি কখনো হয়ে উঠতেন না শামসুর রাহমান। তাই সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারি যে *শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা* সংগ্রহের কবিতা নির্বাচনে এমন ত্রুটি ঘটেছে, যা কবির চারিত্র ক্ষুণ্ন করেছে; তাঁর প্রতিভার সারাংশকে উপেক্ষা করেছে।

প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে থেকে নেয়া হয়েছে ৯টি কবিতা : 'রুপালি স্নান, তার শয্যার পাশে, আত্মজীবনীর খসড়া, নির্জন দুর্গের গাথা, কাব্যতত্ত্ব, সুন্দরের গাথা, অপাঙক্তেয়, সেই ঘোড়াটা, পিতা'। এর থেকে বাদ যেতে পারতো 'তার শয্যার পাশে, কাব্যতত্ত্ব, পিতা'; এবং সংকলিত হ'তে পারতো 'প্রথম গান, দ্বিতয়ি মৃত্যুর আগে (পূর্বলেখ), জর্নাল, শ্রাবণ (২), একান্ত গোলাপ, কবর-খোঁড়ার গান'। অর্থাৎ নেয়া যেতো মোট ১০টি কবিতা। *রৌদ্র করোটিতে* থেকে নেয়া হয়েছে ১০টি কবিতা : 'দুঃখ, আমার মাকে, পর্কের নিঃসঙ্গ খঞ্জ, আত্মপ্রতিকৃতি, একটি মৃত্যুবার্ষিকী, মেষতন্ত্র, কৃতজ্ঞতাস্বীকার, রবীন্দ্রনাথের প্রতি, খেলনার দোকানের সামনে ভিখিরি, শনাক্ত-পত্র'। এর থেকে বাদ যেতে পারতো 'আমার মাকে, আত্মপ্রতিকৃতি, একটি মৃত্যুবার্ষিকী, মেষতন্ত্র'; এবং সংকলিত হ'তে পারতো 'খুপরির-গান, ছুঁচোর কেত্তন, সূর্যাবর্ত, আত্মহত্যার আগে, রূপান্তর'। অর্থাৎ নেয়া যেতো মোট ১১টি কবিতা। *বিধ্বস্ত নীলিমা* থেকে নেয়া হয়েছে ৯টি কবিতা : 'যা আমার সহচর, সম্পাদক সমীপেষু, শৈশবের বাতি-অলা আমাকে, জনৈক সহিসের ছেলে বলছে, পিতলের বক, বাড়ি, প্রভুকে, কখনো আমার মাকে, বাংলা কবিতার প্রতি'। এর থেকে বাদ যেতে পারতো 'সম্পাদক সমীপেষু, শৈশবের বাতি-অলা আমাকে, জনৈক সহিসের ছেলে বলছে, পিতলের বক, বাড়ি'; এবং সংকলিত হ'তে পারতো 'পুরাণ, আত্মজৈবনিক, স্বর্গে গেলাম দর্শক হিশেবে, বামনের দেশে, কাননবালার জন্যে, একজন পইলট, অপচয়ের স্মৃতি'। অর্থাৎ নেয়া যেতো মোট ১১টি কবিতা। *নিরালোকে দিব্যরথ* থেকে নেয়া হয়েছে ৯টি কবিতা : 'টানাপোড়েন; দৃশ্যপট, আমি এবং অনেকে; প্রেমের কবিতা, ভালোবাসা তুমি, একটা চাদর, কিশোররূপে একজন কবির প্রতিকৃতি, মাছ, বংশধর, টেলেমেকাস'। এর থেকে বাদ যেতে পারতো 'একটা চাদর, বংশধর'; এবং সংকলিত হ'তে পারতো 'অধমর্ণের গান, নিজস্ব সংবাদদাতা; একটি প্রস্থান, তার অনুষঙ্গ; দু'এক দশকের, কয়েকটি স্বর, আমার স্বরের ডালে'। অর্থাৎ নেয়া যেতো মোট ১৩টি কবিতা। *নিজবাসভূমে* থেকে সংকলিত হয়েছে ১১টি কবিতা : 'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা; ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯, হরতাল, আসাদের শার্ট, ইচ্ছা, কোন দৃশ্য সবচেয়ে গাঢ় হয়ে আছে, বিবেচনা, ময়ূরগুলো, এ-শহর, মা, দুঃস্বপ্নে একদিন'। এর থেকে বাদ যেতে পারতো, 'ময়ূরগুলো' ছাড়া, শেষ ছটি কবিতা; এবং সংকলিত হ'তে পারতো 'পক্ষপাত'। অর্থাৎ নেয়া যেতো মোট ৬টি কবিতা। *বন্দীশিবির থেকে* থেকে সংকলিত হয়েছে ৮টি কবিতা : 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা; স্বাধীনতা তুমি, পথের কুকুর, কাক, তুমি বলেছিলে, সম্পত্তি, গেরিলা, এখানে দরজা ছিলো'। এর থেকে বাদ

যেতে পারতো, 'গেরিলা' ছাড়া, শেষ চারটি কবিতা; এবং সংকলিত হ'তে পারতো 'বন্দীশিবির থেকে'। অর্থাৎ নেয়া যেতো মোট ৫টি কবিতা। *দুঃসময়ে মুখোমুখি* থেকে সংকলিত হয়েছে নটি কবিতা : 'স্যামসন, ক্ষমাপ্রার্থী, অনিদ্রা, ইলেকট্রিকের তার ছেড়ে, আক্রান্ত হয়ে, অনাবৃষ্টি, দোলনায় নয়, সফেদ পাঞ্জাবি, দুঃসময়ে মুখোমুখি'। এর থেকে বাদ যেতে পারতো 'ক্ষমাপ্রার্থী, ইলেকট্রিকের তার ছেড়ে, অনাবৃষ্টি, দোলনায় নয়, দুঃসময়ে মুখোমুখি'; এবং সংকলিত হ'তে পারতো 'বারবার ফিরে আসে'। অর্থাৎ নেয়া যেতো মোট ৬টি কবিতা। *ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা* থেকে সংকলিত হয়েছে ৪টি কবিতা : 'ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা, দরজার কাছে, গুপ্তধন, মাৎস্যন্যায়'। এর থেকে বাদ যেতে পারতো 'মাৎস্যন্যায়'। থাকতো ৩টি কবিতা। *আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি* থেকে নেয়া হয়েছে ৭টি কবিতা : 'গণ্ডার গণ্ডার, শান্তি পাই, প্রবাসী, কী পরীক্ষা নেবে, নো এক্সিট, ওডেলিস্ক, একটি কবিতার জন্যে'। এর থেকে বাদ যেতে পারতো, 'একটি কবিতার জন্যে' ছাড়া, শেষ ৪টি কবিতা; এবং সংকলিত হ'তে পারতো 'অমন তাকাও যদি'। অর্থাৎ নেয়া যেতো মোট ৪টি কবিতা। *এক ধরনের অহংকার* থেকে নেয়া হয়েছে ৭টি কবিতা : 'এক ধরনের অহংকার, বুদ্ধদেব বসুর প্রতি, হে সুদীপ্তা মোহিনী আমার, তাঁর চোখে আমি, এখন আমি, ছেলেবেলা থেকেই, তোমার স্মৃতি'। এর থেকে বাদ দেয়া যেতো শেষ ৫টি কবিতা; এবং সংকলিত হতে পারতো 'বিন্যাসের সপক্ষে'। অর্থাৎ নেয়া যেতো মোট ৩টি কবিতা। *আমি অনাহারী* থেকে নেয়া হয়েছে ৭টি কবিতা : 'যদি তুমি ফিরে না আসো, কবিকে দিও না দুঃখ, ভয়, একজন কবি : তার মৃত্যু, ফিরে আয় উত্তরাধিকারী, আমি অনাহারী, একটি বিনষ্ট নগরের দিকে'। এর মধ্যে রাখা যেতো 'ভয়' ও 'অনাহারী'; এবং সংকলিত হ'তে পারতো 'তোমার সঙ্গে'। অর্থাৎ নেয়া যেতো মোট ৩টি কবিতা। *শূন্যতায় তুমি শোকসভা* থেকে নেয়া হয়েছে ৬টি কবিতা : 'সঙ্কটে কবির সত্তা, আমিও তোমার মতো, হ্যাণ্ডওভার, প্রজাপতি, প্রশ্নোত্তর, বাস্তবিক লোকটাকে'। এর থেকে বাদ দেয়া যেতো 'সঙ্কটে কবির সত্তা, প্রশ্নোত্তর, বাস্তবিক লোকটাকে'; এবং সংকলিত হ'তে পারতো 'নিঃসঙ্গতা'। অর্থাৎ নেয়া যেতো মোট ৪টি কবিতা। *বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে* থেকে নেয়া হয়েছে ৪টি কবিতা : 'বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে, আমার বয়স আমি, ভোট দেবো, নেকড়ের মুখে আফ্রোদিতি'। এর থেকে বাদ দেয়া যেতো শেষ ৩টি কবিতা; এবং সংকলিত হ'তে পারতো 'চাঁদ', নিঃসঙ্গ শেরপা'। অর্থাৎ নেয়া যেতো মোট ৩টি কবিতা। *প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে* থেকে নেয়া হয়েছে ৬টি কবিতা : 'তোর কাছ থেকে দূরে, শব্দের সংস্রবে কতকাল, কেউ কি এখন, অভিমানী বাংলাভাষা, মৃতের মুখের কাছে, পার্টির পরে'। এর মাঝে রাখা যেতো 'কেউ কি এখন, অভিমানী বাংলাভাষা'; এবং সংকলিত হ'তে পারতো 'ঈদকার্ড : ১৯৭৭, মুর্গী ও গাজর'। অর্থাৎ নেয়া যেতো মোট ৪টি কবিতা। *ইকারুসের আকাশ* থেকে নেয়া হয়েছে ৬টি কবিতা : 'ইকারুসের আকাশ, নিজের কবিতা বিষয়ে কবিতা, ইলেকট্রার গান, বিপর্যস্ত গোলাপ বাগান, আরাগঁ তোমার কাছে, ডেডেলাস'। এর থেকে বাদ দেয়া যেতো 'নিজের কবিতা বিষয়ে কবিতা'; এবং সংকলিত হ'তে পারতো 'রুস্তমের স্বগতোক্তি'। অর্থাৎ নেয়া যেতো মোট ৬টি কবিতা। *মাতাল ঋত্বিক* থেকে নেয়া হয়েছে ১৩টি সনেট

: 'আমি কি পারবো, যে-তুমি আমার স্বপ্ন, তোমাকে দিই নি আংটি, মূর্তি, পুলিশও প্রত্যক্ষ করে, জয়নুলী কাক, একটি বাদামী ঘোড়া, পিঁপড়ের দ্বীপ, তোমার কিসের তাড়া ছিলো, কোথায় মনের মুক্তি, বাজপাখি, ভিন্ন কোনো স্মৃতি, কবিতার মৃত্যুশোক'। এর থেকে বাদ যেতে পারতো 'তোমার কিসের তাড়া ছিলো, কবিতার মৃত্যুশোক'; এবং সংকলিত হ'তে পারতো 'কোথায় শিউলিতলা, তুমি তো এসেই বললে, কবি, ভুলের ভিতরে'। অর্থাৎ নেয়া যেতো মোট ১৫টি সনেট। *উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ* থেকে নেয়া হয়েছে ৬টি কবিতা : 'চাঁদসদাগর, উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ,' ভ্রাতৃসংঘ, প্রকৃত প্রস্তাবে, খাঁচা, একটি দুপুরের উপকথা'। এর মাঝে রাখা যেতো ২টি কবিতা : 'চাঁদসদাগর, প্রকৃত প্রস্তাবে'। *কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি* থেকে নেয়া হয়েছে ৭টি কবিতা : 'টানেলে একাকী, নূহের জনৈক প্রতিবেশী, কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি, দেখা হলো না, হে আমার বাজারের থলে, সুহৃদের প্রতি, সুচেতা এখন'। এর থেকে বাদ যেতে পারতো 'কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি, দেখা হলো না, হে আমার বাজারের থলে'। অর্থাৎ নেয়া যেতো মোট ৪টি কবিতা। *নায়কের ছায়া* থেকে নেয়া হয়েছে ৪টি কবিতা : 'ম্যানিলা, শোনো; বেড়ালের জন্যে কিছু পঙক্তি, সায়োনারা, অচেনা শহর'। এর থেকে বাদ যেতে পারতো 'অচেনা শহর'; এবং সংকলিত হ'তে পারতো 'ডন জুয়ান'। অর্থাৎ নেয়া যেতো মোট ৪টি কবিতা। *এক বোঁটা কেমন অনল* (প্রকাশের কালানুসারে বইটির কবিতা *নায়কের ছায়া* র কবিতার পরই সংকলিত হওয়া উচিত; কিন্তু *শ্রেষ্ঠ কবিতা* য় বইটির কবিতা স্থান পেয়েছে *ধূলায় গড়ায় শিরস্ত্রাণ* -এর পরে) থেকে নেয়া হয়েছে ১৩টি কবিতা : 'আমার মাতামহের টাইপরাইটার, একটি ফটোগ্রাফ, হাসান ও পক্ষিরাজ, এই মাতোয়ালা রাইত, কুমোর, পান্থজন, পান্তারনাকের কবরে, কবিতাপাঠ, খেলা, নিভৃত অক্ষরে, হাসি, যাবার মুহূর্তে, মৌনব্রত'। এর মাঝে থাকতে পারতো 'হাসান ও পক্ষিরাজ, এই মাতোয়ালা রাইত, কুমোর'; এবং সংকলিত হ'তে পারতো 'আত্মচরিত, ফিরে আসি তোমার কাছেই'। অর্থাৎ নেয় যেতো মোট ৫টি কবিতা। *আমার কোনো তাড়া নেই* থেকে সংকলিত হয়েছে ৭টি কবিতা : 'হে আমার বাল্যবন্ধুগণ, বাইবেলের কালো অক্ষরগুলো, একশ' চার ডিগ্রী জ্বর, আমার আঙুল কামড়ে ধরে, বনে-জঙ্গলে, রুটিন'। এর মাঝে থাকতে পারতো 'বাইবেলের কালো অক্ষরগুলো, বনে-জঙ্গলে'; এবং সংকলিত হ'তে পারতো 'লেয়ার্টেস, মধ্যজীবনের বৃত্তান্ত'। অর্থাৎ নেয়া যেতো মোট ৪টি কবিতা। *যে অন্ধ সুন্দরী কাঁদে* থেকে নেয়া হয়েছে ১১টি কবিতা : ' যে অন্ধ সুন্দরী কাঁদে, চতুর্থ ভাষা, খাঁ-খাঁ দীপাধার, শহীদ মিনারে কবিতাপাঠ, জয়দেবপুরে মুক্তিযোদ্ধ, দশ টাকার নোট এবং শৈশব, জন্ম ভূমিকেই, চড়ুইভাতির পাখি, মৃত্যুর পরেও, একটি কফিন ছুঁয়ে, মুখোশ'। এর মাঝে থাকতে পারতো ৪টি কবিতা : 'যে অন্ধ সুন্দরী কাঁদে, জয়দেবপুরে মুক্তিযোদ্ধা,, জন্মভূমিকেই, মৃত্যুর পরেও'। *অস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই* থেকে নেয়া হয়েছে ৩টি কবিতা : 'গুড মর্নিং বাংলাদেশ, এক রাতে হযরত ওসমান, মাস্টারদার হাতঘড়ি'। এর থেকে বাদ যেতে পারতো 'মাস্টারদার হাতঘড়ি'; ও সংকলিত হ'তে পারতো 'ছায়াবিলাস'। অর্থাৎ নেয়া যেতো মোট ৩টি কবিতা। *শিরোনাম মনে পড়ে না*

থেকে নেয়া হয়েছে ১৩টি কবিতা : 'শিরোনাম মনে পড়ে না, অলৌকিক বানভাসি, সাঁতার, সিঁড়ির পর সিঁড়ি, স্বর্ণমাদুর, তোমার সৃষ্টি ভিত্তি পাক, বড় দীর্ঘ এ-অসামাজিকতা, মধ্যরাতের পোস্টম্যান, কে যেন ডাকছে কাকে, আমি যদি হতাম হুডিনি, দেয়াল কাহিনী, সোনার মূর্তির কাহিনী, আমার কবিতা আজ'। এর মাঝে থাকতে পারতো 'সাঁতার, মধ্যরাতের পোস্টম্যান, তোমার সৃষ্টি ভিত্তি পাক'। অর্থাৎ নেয়া যেতো মোট ৩টি কবিতা। *ইচ্ছে হয় একটু দাঁড়াই* থেকে নেয়া হয়েছে নটি কবিতা : 'চাঁদমারি, ইচ্ছে হয় একটু দাঁড়াই, সেই উপত্যকায়, একটি গোলাপ যখন, যায়, তোমার উলের কাজ, ধ্যানের প্রহর, এ্যাকিলিসের গোড়ালি, শোভাযাত্রা'। এর মাঝে থাকতে পারতো 'ইচ্ছে হয় একটু দাঁড়াই, সেই উপত্যকায়, এ্যাকিলিসের গোড়ালি'; এবং সংকলিত হ'তে পারতো 'সপ্তম রাউন্ড, বুড়োটে নাবিক, দগ্ধ মাটিতে'। অর্থাৎ নেয়া যেতো মোট ৬টি কবিতা। *ধূলায় গড়ায় শিরস্ত্রাণ* থেকে নেয়া হয়েছে ১৩টি কবিতা : 'ধূলায় গড়ায় শিরস্ত্রাণ বেলা প'ড়ে আসে, নন্দলাল বসুর সঙ্গে কিছুক্ষণ, ইন্দ্রানীর খাতা, দুঃখিনী সাঁথিয়া, ভোরের কাগজ, আমার অভিযোগের তর্জনী, বিউটি বোর্ডিং, ট্রেনের জানালা থেকে, বহু দিন পর মাকে, মোমবাতি, ছায়াসঙ্গীর উদ্দেশে, আমি এক ভদ্রলোক'। এগুলোর বদলে নেয়া যেতো ২টি কবিতা : 'আমার মৃত্যুর পরে যদি, দ্য গেম ইজ ওভার'। *হোমারের স্বপ্নময় হাত* থেকে কোনো কবিতা নেয়া হয় নি; সম্ভবত অসাবধানতায় বাদ প'ড়ে গেছে কাব্যগ্রন্থটি। এটি থেকে নেয়া যেতো ৩টি কবিতা : 'বার্ধক্যে জসীমউদ্‌দীন, লেখার কাগজ, মানুষের মতো'। *দেশদ্রোহী হ'তে ইচ্ছে করে* থেকে নেয়া হয়েছে ১২টি কবিতা : দেশদ্রোহী হ'তে ইচ্ছে করে, একটি মোনাজাতের খসড়া, কফিন, দোলনচাঁপা এবং কোকিল, চিড়িয়াখানার কিউরেটার সমীপে, আর্জান সর্দার, সমুদ্র ছিনিয়ে নেয়, আমি উঠে এসেছি সৎকারবিহীন, বন্দনার পাখি, অক্ষরের ধারণ ক্ষমতা, আলমারি, ডুবসাঁতার, মগজে গোধূলি আর হাড়ে রঙিন কুয়াশা'। এর মাঝে থাকতে পারতো ৫টি কবিতা : 'দেশদ্রোহী হ'তে ইচ্ছে করে, একটি মোনাজাতের খসড়া, সমুদ্র ছিনিয়ে নেয়, বন্দনার পাখি, অক্ষরের ধারণ ক্ষমতা'। *অবিরাম জলভ্রমি* থেকে নেয়া হয়েছে ১১টি কবিতা : 'কেন মানুষের মুখ, বুদ্ধদেবের চিঠি, তোমাকে পাঠাতে চাই, তোমার ঘুম, স্থানান্তর, আমার অভদ্র পদ্য, নগ্ন স্তব্ধতায়, গদ্য কবিতার চালে, ধন্য সেই পুরুষ, কালো মেয়ের জন্যে পঙক্তিমালা, কালদীর্ণ কোকিলের মতো'। এর মাঝে রাখা যেতো ৫টি কবিতা : 'কেন মানুষের মুখ, বুদ্ধদেবের চিঠি, আমার অভদ্র পদ্য, ধন্য সেই পুরুষ, কালো মেয়ের জন্যে পঙক্তিমালা'। *টেবিলে আপেলগুলো হেসে ওঠে* (এ-কাব্যের কবিতা, প্রকাশক্রম অনুসারে, এখানে স্থান পাওয়ার কথা; কিন্তু কালক্রম লংঘন ক'রে এগুলো স্থান পেয়েছে *মঞ্চের মাঝখানে* র পরে) থেকে নেয়া হয়েছে ১৬টি কবিতা : 'প্রকৃত কে আমি, টেবিলে আপেলগুলো হেসে ওঠে, কথায় কথায়, কিংবদন্তী, কবিতা-সন্ধ্যা, সেই অঘ্রাণের রাতে, আমাকে প্রতীক্ষা ক'রে যেতে হবে, এখন ডাকছো কাকে, যোদ্ধা বিষয়ে, অমল, তোমার জন্যে, শ্রুতলিপি, অপরাহ্নে বসেছিলে তুমি, রাত দেড়টায়, ফেরা না-ফেরা, পূর্বসূরীদের উদ্দেশে, এই এক সময়'। এর মাঝে রাখা যেতো ৪টি কবিতা : 'প্রকৃত কে

আমি, টেবিলে আপেলগুলো হেসে ওঠে, কিংবদন্তী, আমাকে প্রতীক্ষা ক'রে যেতে হবে'। *আমার ক'জন সঙ্গী* থেকে নেয়া হয়েছে ৪টি কবিতা : 'পড়েছে শীতের হাত, কে যেন দিয়েছে রুয়ে, এই যে শুনুন'। এর মাঝে রাখা যেতো শুধু 'কে যেন দিয়েছে রুয়ে'; এবং সংকলিত হ'তে পারতো 'আমার ফসল' কবিতাটি। অর্থাৎ নেয়া যেতো মোট ২টি কবিতা। *ঝর্না আমার আঙুলে* (প্রকাশক্রম অনুসারে এ-কাব্যের কবিতার এখানেই স্থান পাওয়ার কথা, কিন্তু স্থান পেয়েছে বেশ পরে) থেকে নেয়া হয়েছে ৪টি কবিতা : 'ঝর্না আমার আঙুলে, এ দুয়ের মধ্যে, মাঘের দুপুরে, আমার পিতার গ্রাম'। এর মাঝে রাখা যেতো শুধু 'ঝর্না আমার আঙুলে'; এবং সংকলিত হ'তে পারতো 'মাঝখানে' কবিতাটি। অর্থাৎ নেয়া যেতো মোট ২টি কবিতা। *স্বপ্নেরা ডুকরে ওঠে বারবার* থেকে নেয়া হয়েছে ১২টি কবিতা : 'ঘুমুতে যাবার আগে, স্বপ্নেরা ডুকরে ওঠে বারবার, কালবেলায় ক্রুশকাঠে, একদা এক কবিতা, প্রামাণ্য চিত্রের অংশ, যখন অনেকে সগৌরবে, তোমার চলে যাবার পর, উৎসব-রাতে হঠাৎ, এসেছি দাফন ক'রে, আজো তিনি, চারু ভিক্ষা, চরিত্রলিপি'। এর মাঝে রাখা যেতো ২টি কবিতা : 'যখন অনেকে সগৌরবে, উ ৎসব-রাতে হঠাৎ'; এবং সংকলিত হ'তে পারতো অন্য ২টি কবিতা : 'শহুরে বাগানে, এমন *ঠেলতে ঠেলতে*'। অর্থাৎ নেয়া যেতো মোট ৪টি কবিতা। *খুব বেশি ভালো থাকতে নেই* থেকে নেয়া হয়েছে ১৩টি কবিতা : 'খুব বেশি ভালো থাকতে নেই, পৌঁছে দিচ্ছি, ল্যাপপোস্ট, কবেকার হাহাকার, হাসপাতালে ভর্তি হবার আগে, শূন্য চেয়ার, অস্ত্রোপচারের পরে, আঁধার ঘরে বন্দী এখন, কোল ছাড়া করতে চায় না, রাতের ক্লিনিক, পথভ্রষ্ট কোকিল, তত্ত্ব-তালাশ, নাম'। এর মাঝে রাখা যেতো ৪টি কবিতা : 'খুব বেশি ভালো থাকতে নেই, ল্যাপপোস্ট, পথভ্রষ্ট কোকিল, তত্ত্ব-তালাশ'। *বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়* থেকে নেয়া হয়েছে ১৭টি কবিতা : 'বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়, একজন শহীদের মা বলছেন, টেক্সার, কবিস্মৃতি, কবন্ধের এলোমেলো পোঁচে, কিচ্ছু বুঝি না কিচ্ছু বলি না, ওদের ঘুমোতে দাও, মদ্যপদের মধ্যে, শীত-দুপুরে প্রথম দেখা, পরিবর্তন, প্রথম উপহার, সংশয়, যতই ভাবি, অমাবস্যার চাঁদ, অবশেষে ওরা আসে, ছড়ার আদলে, আত্মা ছুঁড়ে দিই'। এর মাঝে রাখা যেতো ৪টি কবিতা : 'বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়, একজন শহীদের মা বলছেন, যতই ভাবি, অমাবস্যার চাঁদ'; এবং সংকলিত হ'তে পারতো 'আমরা দু'জন দু'দিকে' কবিতাটি। অর্থাৎ নেয়া যেতো মোট ৫টি কবিতা। *মঞ্চের মাঝখানে* থেকে নেয়া হয়েছে ৫টি কবিতা : 'বাড়িটা, অথচ নিজেই আমি, মঞ্চের মাঝখানে, ঘরের মাঝখানে, শুচি হয়'। এর মাঝে রাখা যেতো ১টি কবিতা, 'শুচি হয়'; ও সংকলিত হ'তে পারতো 'কারো একলার নয়' কবিতাটি। অর্থাৎ নেয়া যেতো মোট ২টি কবিতা। অগ্রন্থিত কবিতাবলি থেকে নেয়া হয়েছে ৫টি কবিতা : 'মৃত্যুহীন তালে তালে, কীভাবে ছিলাম বেঁচে, নিভিয়ে এক ফুঁয়ে, তাঁবু ছেড়ে ছুটে আসে, গর্জে ওঠো স্বাধীনতা'। এর থেকে নেয়া যেতো ১টি কবিতা : 'মৃত্যুহীন তালে তালে'।

শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা র তৃতীয় সংস্করণে কবিতা রয়েছে ৩১০টি। ওপরে আমি যে-নির্বাচন করেছি, তাতে বাদ গেছে এ-সংস্করণে গৃহীত ১৮৭টি কবিতা;

অর্থাৎ গৃহীত কবিতার ৬৩% কবিতাই বাদ পড়েছে আমার নির্বাচনে। তবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে অন্য ৫৮টি কবিতা। তাই আমার বোধে যেটি *শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা* র শ্রেষ্ঠ সংস্করণ, তাতে অন্তর্ভুক্ত হবে ১৮১টি কবিতা। এর মাঝে তাঁর আরো একটি কাব্যগ্রন্থ– *হৃদয়ে আমার পৃথিবীর আলো*–বেরিয়েছে। সেটি থেকেও কয়েকটি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে *শ্রেষ্ঠ কবিতা* র সংগ্রহে ১৮১টি কবিতা থাকাও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ; আর কোনো কবির *শ্রেষ্ঠ কবিতা* র সংগ্রহে এতোগুলো কবিতা নেই। *শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা* ৩১০টি বা প্রস্তাবিত ১৮১টি কবিতা নিয়ে বহুদিন বাঙলা কবিতার দ্বিতীয় বৃহত্তম সংগ্রহ হয়ে থাকবে। বৃহত্তমটির নাম *সঞ্চয়িতা,* যাতে স্থান পেয়েছে ৩৩১টি কবিতা, ১৪টি ছোটোদের কবিতা, ৭৪টি গান, এবং ৫৯টি কণিকা–লেখন–স্ফুলিঙ্গ জাতীয় কবিতাটুকরো। বর্তমান রূপে *শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা শ্রেষ্ঠ কবিতা* র সংগ্রহ নয়; এটি শ্রেষ্ঠ ও নির্বাচিত কবিতার মিশ্র সংগ্রহ।

কী পাই *শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা* য়? এ–সংগ্রহে রয়েছে তাঁর কিছু অনবদ্য কবিতা, যা জীবন ও শিল্পের প্রোজ্জ্বল যুগমূর্তি; রয়েছে একগুচ্ছ কবিতা, যা উপন্যাসের মতো ব্যাপক আর নাটকের মতো দ্বন্দ্বদীর্ণ; রয়েছে গুচ্ছ গুচ্ছ কবিতা, যা মানবিকতায় বিনম্র দ্রোহে দর্পিত প্রেমে মথিত; আছে একশ কবিতা, যা গত তিন দশকের দুঃখী–দ্রোহী–জয়ী ও পরাভূত বাঙলার জীবন, সমাজ, রাজনীতির দীপ্ত দলিল। এসব কিছুর অন্তর জুড়ে শোণিতের মতো বইছে এক অসামান্য কবির আন্তর আবেগ ও চৈতন্য। তবে এ–ই শেষ কথা নয়। বিশশতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাঙালির সৃষ্টিশীলতার শিখরকে যদি উপলব্ধি করতে চাই, তবে আসতে হবে এ–কবিতাগুচ্ছের কাছে;–এখানে মুদ্রিত হয়ে আছে বিশশতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাঙালির আবেগ, স্বপ্ন, সৌন্দর্যানুভূতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকাশ; এ–সময়ের বাঙালির শ্রেষ্ঠ হাহাকার ও বেদনাকে যদি বোধ করতে চাই, যদি সংক্রামিত হ'তে চাই এ–সময়ের বাঙালির উচ্চতম উল্লাস ও যন্ত্রণা দিয়ে, তার প্রেমের লোকোত্তর সুধা ও বিষাক্ততম বিষ যদি অনুভব করতে চাই, যদি বাঙলা ভাষার অন্যতম উৎকৃষ্ট উৎসারণ সম্ভোগ করতে চাই, যদি চোখ ও চিত্ত দিয়ে দেখতে চাই এ–সময়ের সবচেয়ে আলোড়িত দুঃখের দলিল, তাহলে বাঙালিকে এ–কবিতাগুচ্ছের কাছে আসতে হবে। এখানে আছেন এক কবি, যিনি ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক, একই সঙ্গে গীতিময় ও মহাকাব্যিক। বিশশতকের দ্বিতীয়াংশের বাঙালি মহৎ কিছু সৃষ্টি করতে পারে নি, মহত্ত্ব বাঙালিকে ত্যাগ করেছে; কিন্তু এ–অমহৎ সময়ে যদি কিছু মহতের সামান্য ছোঁয়া পেয়ে থাকে, তাহলে তা খুঁজতে হবে কবিতায়। তার একটি উজ্জ্বল অংশ মিলবে এ–কবিতাসংগ্রহে, যার নাম *শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা* । এটি আমাদের মুষ্টিমেয় কবিতাসংগ্রহের একটি, যেটিকে নির্দ্বিধায় বর্তমান, ও ভবিষ্যতের হাতে তুলে দেয়া যায়।

AMARBOI.COM

ধ্বনিপ্রতীকতা ও কবিতা

কথা বলার সময় অবিরল ধ্বনি উচ্চারিত হয়; কিন্তু কথক কি শ্রোতার কানে একরাশ স্বরমর্মর, ধ্বনিগুঞ্জন প্রবেশ করিয়ে দেয়ার জন্যে কথা বলে? না; কথকের ভঙ্গি মনোহর ও উচ্চারণ মধুর হ'তে পারে, তবে সে ধ্বনির থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও বিমূর্ত কিছু শ্রোতার মনে বা মস্তিষ্কে সংক্রামিত করার জন্যে ওই ধ্বনিপুঞ্জ উচ্চরণ করে, কথা বলে। কোনো বিজ্ঞানসম্মত ও যথাযথ শব্দের অভাবে ওই গুরুত্বপূর্ণ ও বিমূর্ত জিনিশটিকে বলতে পারি 'ভাব' বা 'বক্তব্য'। ভাব বা বক্তব্যই ভাষার প্রাণ; আর অন্য সব কিছু—ধ্বনি, শব্দ, বাক্য—ভাষার শরীর। ধ্বনি ভাষার প্রাথমিক উপাদান; এবং ধ্বনির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে ভাষার প্রাণ বা ভাব বা বক্তব্য বা অর্থের সাথে তার কোনো সরাসরি সম্পর্ক নেই। ধ্বনির বিচিত্র বিন্যাসে গ'ড়ে-ওঠা শব্দ বা রূপে প্রথম উন্মেষিত হয় ভাষার প্রাণ বা ভাব বা বক্তব্য বা অর্থ; তারপর ওই রূপরাশির বিচিত্র বিন্যাসে গ'ড়ে-ওঠা বাক্যে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয় ভাব বা অর্থ। ভাষার চারটি স্তরের (ধ্বনি, রূপ, বাক্য, অর্থ) মধ্যে ধ্বনিস্তরটি সবচেয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; এটিই প্রথম আলোড়িত করে মানুষের ইন্দ্রিয়কে; তবে এর উপাদানরাশি নিরর্থক, নির্ভাব। অর্থাৎ স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন ধ্বনির কোনো অর্থ নেই, ধ্বনি কোনো ভাব জ্ঞাপন করে না। তবে ধ্বনির রহস্যময় মাধুর্য রয়েছে, যার পরম প্রকাশ দেখি সঙ্গীতে। সঙ্গীত ধ্বনির আশ্চর্য ইন্দ্রজাল। কবিতায় ধ্বনির ভূমিকা কতোখানি? কবিতা কি ধ্বনির মনোহর, মনোরম, রোমাঞ্চকর বিন্যাস? কবিতারও প্রাথমিক উপাদান ধ্বনি; কবিতায় ধ্বনির শোভা সৃষ্ট করা হয় নানাভাবে; তবে তা কবিতার বাহ্যস্তর। কবিতার আভ্যন্তর স্তর তার ভাবেরই স্তর, সেখানে ধ্বনির ভূমিকা সামান্য। কবিতা আমরা পড়ি, নিচুস্বরে ও উঁচুস্বরে পড়ি, এমনকি আবৃত্তিও করি; তবে কবিতা উঁচুস্বরে পড়ার সময়, বা আবৃত্তি শোনার সময় কি মনে হয় না যে ধ্বনির স্রোতে ভেসে যাচ্ছি, আবিষ্ট হয়ে পড়ছি ধ্বনিতে; এবং কবিতার ভাবটি চিত্তে সংক্রামিত হচ্ছে না? এমন ক্ষেত্রে ধ্বনি বেশ প্রতারণা করে, ঈর্ষাকাতর প্রতিদ্বন্দ্বীর মতো বাধা দেয় কবিতার অন্তঃসার উপভোগে। আমি লক্ষ্য করেছি উৎকৃষ্ট কবিতা মনের কাছে ধরা দেয় অন্তরঙ্গরূপে যদি তা পড়ি মনে মনে উঁচুকণ্ঠে, যদি নির্বাক ক'রে দিই বাচাল ধ্বনিগুলোকে। ভাবগভীর গান শোনার সময়ও এমনি হয়; কতো সন্ধ্যায়-নিশীথে কতো রবীন্দ্রসঙ্গীত বুকের ভেতর ঢুকতে পারে নি স্বরসুরের মায়াবী প্রতিবন্ধকতায়। ধ্বনিতে ভ'রে গেছে কর্ণকুহর আর রক্তমাংসের সমস্ত ছিদ্র; শুধু ভাবটুকু ঢুকতে পারে নি ভেতরে। ধ্বনির ওপর জোর দেয় যে-সব কবিতা, তার অধিকাংশই নিকৃষ্ট। পেশাদার আবৃত্তিকারেরা ধ্বনিজাল ছড়িয়ে শ্রোতাদের প্রতারিত করার জন্যে সাধারণত বেছে নেন ওই ধরনের কবিতাই;—ধ্বনির মেলোড্রামা দিয়ে বিবশ করেন শ্রোতাদের, কিন্তু শ্রোতারা যখন প্রেক্ষাগার থেকে বেরিয়ে আসেন তখন চিত্তলোক অধিকাংশ সময়ই থাকে শূন্য। কবিতায় ধ্বনির কাজ আবেশ সৃষ্টি করা,

সম্মোহিত করা, কবিতার দেহকে রূপময় করা; কিন্তু কবিতার আত্মাকে সামান্যই ঋদ্ধ করে ধ্বনিপুঞ্জ।

বিচ্ছিন্ন ধ্বনির কোনো অর্থ নেই; তবে প্রতিটি ধ্বনির রয়েছে একগুচ্ছ স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট। ওই স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে একটি ধ্বনির সাথে আরেকটি ধ্বনির থাকে নানা মিল-অমিল। যদিও কোনো অর্থ নেই বিচ্ছিন্ন ধ্বনির, তবুও বিভিন্ন ধ্বনি আপন ভাষীদের মনে জাগিয়ে তুলতে পারে বিভিন্ন অনির্বচনীয় আবেগ। একেকটি ধ্বনি ভাষীদের মনে এঁকে দিতে পারে নানা আবেগঅনুভূতির ছাপ; এবং ওই আবেগঅনুভূতির ছাপ বা ইপপ্রেশন অনেকের কাছে প্রতিভাত হ'তে পারে ধ্বনিটির অর্থ বা তাৎপর্য ব'লে। ধ্বনি ও অর্থের সম্পর্ক নিয়ে বিতর্ক চলছে জেসাসের জন্মের কয়েক শতক আগে থেকেই : *ক্রাতিলুস* সংলাপে এ নিয়ে আলোচনা করেছেন প্লাতো; আর পুরোনো ভারতের ধ্বনিতাত্ত্বিকেরাও একই রকম তর্ক করেছেন ধ্বনির আর্থ তাৎপর্য সম্পর্কে। যদিও অনেক আগেই স্থির হয়ে গেছে যে ধ্বনির কোনো স্বাভাবিক অর্থ নেই, তবুও ধ্বনির অর্থসম্পন্নতার ব্যাপারটি মানুষের দুর্মর সংস্কারের মতো রয়ে গেছে। আলেকজন্ডার পোপ দাবি করেছিলেন, 'ধ্বনিকে তার অর্থের প্রতিধ্বনি করতেই হবে।' প্রাকৃতিক ধ্বনি থেকে ভাষার উৎপত্তিতে বিশ্বাসী যে-ভাষাতাত্ত্বিকেরা, পুরোনো গ্রিক অভিধায় যাঁদের বলা যায় 'স্বাভাববাদী', তাঁরা বিশ্বাসী মানবভাষায় ধ্বনি ও অর্থের সহজাত সম্পর্কে। তাঁরা মনে করেন, বিশেষ ধ্বনি বিশেষ অর্থের উপযোগী। ধ্বনি ও অর্থের সহজাত সম্পর্কতত্ত্বকে বলা হয় 'ধ্বনিপ্রতীকতা' (সাউন্ড সিমবলিজম)। বিশশতকে বেশ কজন ভাষাবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানী ধ্বনি ও অর্থের সহজাত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করেছেন; এবং দেখেছেন যে বিভিন্ন ভাষার ভাষীরা কোনো কোনো ধ্বনিকে কোনো কোনো ভাব বা অর্থের সাথে জড়িত ব'লে মনে করে। এটা মনে করাই; আমরা তো কতো কিছুই মনে করতে পারি! কোনো ধ্বনি আমাকে অশ্রুর কথা মনে করিয়ে দেয়; ওই ধ্বনি হয়তো অন্য কাউকে মনে করিয়ে দেয় অবিরল বর্ষণকে; অনেককে হয়তো কিছুই মনে করায় না। কোনো ধ্বনি কারো মনে জাগিয়ে দিতে পারে বিশেষ রঙের বোধ, বা স্পর্শের বোধ, বা আকৃতির বোধ। শুধু ধ্বনি কেনো, বর্ণও জাগাতে পারে নানা আবেগ; যেমন, 'দুঃখ' শব্দের বিসর্গটিকে আমার মনে হয় যুগল অশ্রুবিন্দু ব'লে। তাই ধ্বনি যে আবেগঅনুভূতি জন্ম দেয়, তা অনেকাংশেই মনে-করা-ধরনের। অর্থাৎ ধ্বনিপ্রতীকতাতত্ত্বের শক্তি কম; খুব কমসংখ্যক ভাবের সাথেই আমরা জড়িয়ে দিতে পারি বিশেষ বিশেষ ধ্বনিকে।

বাঙলা ভাষার ধ্বনিপ্রতীকতাতত্ত্বের প্রথম, ও চরম, প্রয়োগ করেন রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। তাঁরা ছিলেন বাঙলা ভাষার দু-প্রধান *নবব্যাকরণবিদ*, যাঁরা উদঘাটন করতে চেয়েছিলেন খাঁটি বাঙলা ভাষার বিভিন্ন সূত্র। রবীন্দ্রনাথই প্রথম লক্ষ্য করেন যে খাঁটি বাঙলা শব্দের একটি বড়ো অংশ গ'ড়ে উঠেছে ধ্বন্যাত্মক শব্দে। তিনি 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ' (১৩০৭) নামক প্রবন্ধে এ-ধরনের শব্দের একটি তালিকা তৈরি ক'রে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেন তাদের চারিত্র। তিনি দেখান কীভাবে বাঙলা ভাষায়

ধ্বন্যাত্মক শব্দের সাহায্যে জ্ঞাপন করা হয় এমন সব ভাব, যাদের কোনো সরাসরি সম্পর্ক নেই প্রাকৃতিক কোনো ধ্বনির সাথে। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ দিয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে রামেন্দ্রসুন্দর রচনা করেন 'ধ্বনি-বিচার' (১৩১৪) প্রবন্ধটি। এ-প্রবন্ধ দুটি ধ্বনির সাথে অর্থের সম্বন্ধ আবিষ্কারের দুটি বিস্ময়কর প্রায়স। তাঁরা দুজনই ছিলেন কল্পনা ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন; তত্তমত্ততাও তাঁদের ক'রে তুলেছিলো প্রমত্ত। কিছু কিছু তত্ত্ব মাদকের মতোই কাজ করে, মত্ত ক'রে তোলে তাত্ত্বিককে; সব কিছুতে তিনি দেখতে পান তাঁর তত্ত্বের ধ্রুব প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর তত্ত্বমাতাল হয়েছিলেন অনেকটা; তত্ত্বের ক্রিয়ায় অনেক দূরে স'রে গিয়েছিলেন বাস্তবতা থেকে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য সীমা পেরিয়ে যান নি; কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর তত্ত্বের ইশারায় দূর থেকে দূরে যেতে যেতে গ্রস্ত হন বিপজ্জনক চোরাবালিতে। রবীন্দ্রনাথ তত্ত্বটি পেছনে রেখে ধ্বনি-অর্থের সম্পর্ক খুঁজেছেন কবিপ্রতিভার সহায়তায়; আর রামেন্দ্রসুন্দর তত্ত্বটি সবলে প্রয়োগ করেছেন বাঙলা ধ্বনি-অর্থের ওপর। রবীন্দ্রনাথ সিদ্ধান্তে পৌঁচেছিলেন, 'যে-সকল অনুভূতি শ্রুতিগ্রাহ্য নহে, আমরা তাহাকেও ধ্বনিরূপে বর্ণনা করিয়া থাকি।' এ-তত্ত্ব অবলম্বন ক'রে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বোধকে ক'রে তুলেছেন শ্রুতিগ্রাহ্য। এ-কাজে তিনি বার বার আশ্রয় নিয়েছেন অনুমানের; তবে তিনি একটি সীমার মাঝে থেকে রক্ষা করেছেন নিজেকে। ধ্বনি-অর্থের মিলনতত্ত্বকে চরম স্তরে নিয়ে গেছেন রামেন্দ্রসুন্দর;— তাঁর দীর্ঘ ব্যাপক পরিশ্রমী প্রবন্ধটিতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও কল্পিত শিহরণজাগানো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় পাশাপাশি। তিনি প্রতিটি ধ্বনিকে উচ্চারণস্থান ও রীতি অনুসারে জড়িয়ে দিয়েছেন বিশেষ ধরনের অর্থের সাথে; ওই ধ্বনিসমবায়ে গঠিত শব্দে আবিষ্কার করেছেন ধ্বনির সাথে সহজাতভাবে জড়িত অর্থ। এ-প্রক্রিয়ায় বহু শব্দের অর্থের সাথে যুক্ত করেছেন শব্দের ধ্বনি-উপাদানকে। তাঁর কিছু আবিষ্কার চমৎকার; অনেক আবিষ্কার বিহ্বলকর। তিনি অবশ্য, প্রবন্ধের শেষে, স্বীকার করেছেন যে তাঁকে 'প্রচুর পরিমাণে অনুমান ও কল্পনার সাহায্য লইতে হইয়াছে। বহুস্থলে হয়ত কষ্ট-কল্পনারও অভাব নাই।'

বাঙলা কবিতা ব্যাখ্যায় ধ্বনিপ্রতীকতাতত্ত্বের সুশৃঙ্খল প্রয়োগ হয় নি; কোনোকোনো সমালোচক কখনো কখনো বিচ্ছিন্নভাবে ধ্বনি ও ভাবকে মেলানোর চেষ্টা করেছেন। সম্প্রতি ডক্টর সন্‌জীদা খাতুন *ধ্বনি থেকে কবিতা* (বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশনা বিভাগ, শান্তিনিকেতন, ১৯৮৭) গ্রন্থে বাঙলা কবিতা ব্যাখ্যায় ধ্বনিপ্রতীকতাতত্ত্ব প্রয়োগ করেছেন ব্যাপকভাবে। তিনি অবশ্য *ধ্বনিপ্রতীকতা* কথাটিকে এড়িয়েই চলেছেন; মাত্র একবার এ-শব্দটি ব্যবহার করেছেন সারাটি বইতে; তবে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে ধ্বনি ও কবিতার ভাবের মধ্যে রয়েছে সহজাত সম্পর্ক। আমরা জানি ধ্বনি বা সুরের সাথে সন্‌জীদা খাতুনের রয়েছে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক; তিনি সমকালের অন্যতম প্রধান রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী। ধ্বনি যে তাঁর জীবনের বাস্তব ও স্বপ্নকে অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করে, তা অনুমান করতে পারি। ধারণা করতে পারি যে তিনি অনেক ধ্বনিকে জড়িয়ে দেখেন অনেক আবেগঅনুভূতির সাথে; বিচিত্র ধ্বনি-উদ্দীপক তাঁর মনে জাগায় বিচিত্র সাড়া। অর্থাৎ বিচিত্র ধ্বনি-ছাপে তাঁর অন্তর্লোক বিচিত্র রঙে অঙ্কিত। তবে ওই ধ্বনি-ছাপেই

AMARBOI.COM

তিনি সন্তুষ্ট নন; বিজ্ঞানীর মতো তিনি মিলিয়ে দেখতে চেয়েছেন ধ্বনিরাশি তাঁর মনে যে-আবেগঅনুভূতি জাগায় তার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রয়েছে কিনা? এ-উদ্যোগ নিতে গিয়ে তিনি শিল্পী থেকে হয়ে উঠতে চেয়েছেন বিজ্ঞানী ও কবিতার ভাষ্যকার, যার পরিচয় পাই *ধ্বনি থেকে কবিতা* বইটিতে। কবিতা ব্যাখ্যার একটি চমৎকার উদ্যোগ তাঁর বইটি : এ-বইয়ের অনেক উদঘাটন আমাদের পরিতৃপ্ত করে, অনেক সিদ্ধান্ত প্রশ্নাকুল ক'রে তোলে; এবং অনেক ব্যাখ্যা করে দ্বিধান্বিত। বইটি পড়ার সময় বার বার আমার মনে হচ্ছিলো আমাদের বহু অভাবের মধ্যে একজন মহিলা সমালোচকের অভাবও আমাদের ছিলো; ওই অভাব পূরণ করলেন সন্‌জীদা খাতুন। তিনিই হয়ে উঠলেন আমাদের প্রথম, বর্তমানে একমাত্র, মহিলা সমালোচক। তাঁর বইটি আমাদের অঞ্চলে কবিতা সমালোচনার একটি নতুন ধারার সূত্রপাত ঘটালো। তিনি, এবং এ-ধারার নতুন সমালোচকেরা যদি ধ্বনিপ্রতীকতাতত্ত্ব আশ্রয় ক'রে কবিতা ব্যাখ্যার আরো উদ্যোগ নেন, তাহলে আমাদের গরিব সমালোচনা সাহিত্য কিছুটা সচ্ছল হয়ে উঠবে। যদি এর আর বিকাশ নাও ঘটে, তবু তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন এ-কারণে যে প্রথাবদ্ধ বাঙলায় তিনি একটি অপ্রথাগত ধারার সূচনা ঘটানোর জন্যে নিয়োগ করেছিলেন শ্রম ও মেধা।

ধ্বনি থেকে কবিতা বইটিকে ভাগ করতে পারি দুটি ভাগে। প্রথম ভাগে রয়েছে তিনটি পরিচ্ছেদ : 'ভাষাধ্বনির স্বকীয় গুণ প্রসঙ্গে', 'কবিতার ভাবব্যঞ্জনায় ধ্বনির ভূমিকা', ও 'বাংলাভাষার ধ্বনিচরিত্র'; এবং দ্বিতীয় ভাগেও রয়েছে তিনটি পরিচ্ছেদ : 'ধ্বনি থেকে কবিতা', 'রবীন্দ্রনাথের কবিতার পাঠান্তরে ধ্বনি', ও 'অনুচিন্তা'। প্রথম ভাগের পরিচ্ছেদ তিনটিতে সন্‌জীদা খাতুন প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন তাঁর তত্ত্ব; এবং দ্বিতীয় ভাগের প্রাণ-পরিচ্ছেদ 'ধ্বনি থেকে কবিতা'য় ওই তত্ত্ব প্রয়োগ ক'রে ব্যাখ্যা করেছেন পাঁচটি বাঙলা কবিতার ভাবব্যঞ্জনা। 'ভাষাধ্বনির স্বকীয় গুণ প্রসঙ্গে' পরিচ্ছেদে তিনি পরিচয় দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ-রামেন্দ্রসুন্দর ও পশ্চিমের বিভিন্ন বিশশতকী ভাষাবিজ্ঞানীর মত ও সিদ্ধান্তের। ধ্বনি ও ভাবের সহজাত সম্পর্ক সম্বন্ধে বিভিন্নজনের মত আলোচনা ক'রে, তাঁদের রচনা থেকে উদ্ধৃত দিয়ে এ-পরিচ্ছেদে তিনি ধ্বনি ও ভাবের সহজাত সম্পর্ক সম্বন্ধে পাঠকের মনে অনেকটা বিশ্বাস সৃষ্টি করতে পেরেছেন। 'কবিতার ভাবব্যঞ্জনায় ধ্বনির ভূমিকা' পরিচ্ছেদে তিনি বেশ সংক্ষেপে দেখিয়েছেন কীভাবে ধ্বনি কবিতায় বিস্তার করে নিজের আন্তর প্রভাব। 'বাংলাভাষার ধ্বনিচরিত্র' পরিচ্ছেদটি প্রথম ভাগের প্রধান পরিচ্ছেদ; এখানে তিনি বিস্তৃতভাবে, বিভিন্ন বাঙলা ধ্বনিবিজ্ঞানীর মতের সহায়তায়, নির্ণয় করেছেন বাঙলা ধ্বনিরাশির বিচিত্র বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন ধ্বনি সহজাতভাবে কী ভাব জ্ঞাপন করে, তাও তিনি নির্দেশ করেছেন। এতে তাঁকে বিশেষ সাহায্য করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর; তিনি রামেন্দ্রসুন্দরের 'ধ্বনি-বিচার' প্রবন্ধটির সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন পুরোপুরি। *ধ্বনি থেকে কবিতা* বইটির প্রথম ভাগের পরিচ্ছেদ তিনটি আমাদের পরিচ্ছন্ন ধারণা দেয় বাঙলা ধ্বনিরাশি সম্বন্ধে; এবং সেগুলোর দ্যোতিত ভাবও অনেকটা জড়ো হয় মনের মধ্যে।

দ্বিতীয় ভাগের প্রথম পরিচ্ছেদ 'ধ্বনি থেকে কবিতা'য় তিনি 'ধ্বনিসমাবেশ জরিপ করে, পরে বাচ্য ও ব্যঞ্জিত অর্থের সঙ্গে তার যোগ সন্ধান' করেছেন পাঁচটি কবিতায়। কবিতাগুলো রবীন্দ্রনাথের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা', সত্যেন্দ্রনাথের 'চম্পা', নজরুলের 'সর্বহারা', জীবনানন্দের 'আমাকে একটি কথা দাও', ও শঙ্খ ঘোষের 'ভিখিরির আবার পছন্দ'। কবিতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর ধ্বনির হিশেব নিয়েছেন, কোন শ্রেণীর ধ্বনি কী পরিমাণে বসেছে একেকটি কবিতায় তা দেখিয়েছেন, এবং ধ্বনিগুলোর সহজাত বৈশিষ্ট্য কীভাবে কবিতার ভাবকে সমর্থন ক'রে কবিতাটিকে বিশিষ্ট ক'রে তুলেছে, তা দেখিয়েছেন। 'বাঙলাভাষার ধ্বনিচরিত্র' পরিচ্ছেদে তিনি ছিলেন ধ্বনিবিজ্ঞানী; আর এ-পরিচ্ছেদে হয়ে উঠেছেন কবিতার ভাষ্যকার। বৈজ্ঞানিকতা ও কাব্যবোধের মিলনে এ-পরিচ্ছেদটি হয়ে উঠেছে মূল্যবান, যদিও কবিতা যাঁরা প্রথাগতভাবে ভোগ করতে চান, তাঁদের কাছে এর অনেক কিছু মনে হ'তে পারে বাড়াবাড়ি। কিছুটা বাড়াবাড়ি করেছেনও তিনি; ধ্বনি ও কবিতাকে যেভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন খাপেখাপে, তাতে বিস্ময় জাগে মাঝেমাঝে। তবে পরিশ্রমের কোনো ত্রুটি করেন নি তিনি; অন্তর্দৃষ্টিরও পরিচয় দিয়েছেন চমৎকার। কবিতাগুলোর সানজীদীয় ভাষ্যের পরে পাঠকের মনে বেশ আবেশ সৃষ্টি হয়; মনে হয় ধ্বনি দিয়ে ভাবকে যেনো অনেকখানি ছুঁলাম। কবিতাগুলোর শারীর উপাদানের মধ্যে এতো ভাব যে ব্যঞ্জিত হয়, এরকম আগে মনে হয় নি; কিন্তু সন্‌জীদা খাতুনের ব্যাখ্যার পর তা মেনে নিতে ইচ্ছে হয়। 'রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠান্তরে ধ্বনি' পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার কয়েকটি পাঠান্তর একইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। 'অনুচিন্তা' পরিচ্ছেদে তিনি ফিরে তাকিয়েছেন আগের পরিচ্ছেদগুলোর দিকে; বইটি ভ'রে তিনি কী করেছেন, কতোটা করতে পেরেছেন, তা বুঝে নিতে ও বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন।

সন্‌জীদা খাতুনের *ধ্বনি থেকে কবিতা* একটি তত্ত্বপ্রধান গবেষণাগ্রন্থ; এবং একটি বিশেষ তত্ত্ব তিনিই প্রথম প্রয়োগ করলেন বাঙলা কবিতা ব্যাখ্যায়। তাই বইটির সূচনা পরিচ্ছেদটি হ'তে পারতো কিছুটা অন্যরকম। তিনি এ-পরিচ্ছেদে বিভিন্নজনের বিভিন্ন মতের পরিচয় দিয়েছেন ছিন্নবিচ্ছিন্নভাবে, তার বদলে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করতে পারতেন ধ্বনিপ্রতীকতাতত্ত্বটি; এবং তাঁকে চ'লে যেতে হতো অনেক অতীতে। দরকার হতো প্লাতোর *ক্রাতিলুস*-এ যাওয়া; পরিচয় দিতে পারতেন পুরোনো গ্রিস ও ভারতের স্বভাব বনাম প্রথাবাদী বিতর্কের। তিনি তৈরি করতে পারতেন একটি সুষ্ঠু তত্ত্ব। তিনি তা না ক'রে সংকলন করেছেন বিভিন্নজনের মতামত, যা অনুভূতিকে নাড়া দেয়; কিন্তু কোনো সুষ্ঠু সৌষ্ঠবমণ্ডিত তত্ত্বের সাথে পরিচিত করিয়ে দেয় না। প্রথম পরিচ্ছেদে, রামেন্দ্রসুন্দরের অনুসরণে, তিনি বলেছেন, 'এভাবে জাতিগত সংস্কার ভাষার ধ্বনিতেও জাতীয় বৈশিষ্ট্য মুদ্রিত করতে পারে।' এ-সিদ্ধান্তকে কি ব্যাপক উপাত্ত দিয়ে সমর্থন করা সম্ভব? জাতি ও ভাষার মধ্যে সম্পর্ক আকস্মিক; 'জাতিগত সংস্কার'-এর ব্যাপারটিও অনেকটা উপকথা। ধ্বন্যাত্মক শব্দ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'কাব্যে এ-সব শব্দের স্বীকৃতি বেশি।' আসলে কি কবিতায় ধ্বন্যাত্মক শব্দ বেশি ব্যবহৃত হয়? আমার তা মনে হয় না, যদিও ছড়ায় বা ওই জাতীয় রচনায় এসব শব্দের ব্যবহার

লক্ষ্য করার মতো। সুধীরকুমারের সাথে তিনিও একমত হয়েছেন যে 'আমাদের ভাষায় ই-কার ক্ষুদ্রত্ব এবং আ-কার বিশালতা বা বড়ত্ব-সূচক, যেমন, —একটি-একটা' ইত্যাদি। আমার এমন কোনো সংস্কার নেই; বরং 'ই' আমার কাছে গুরুত্ব, আর 'আ' অবহেলা দ্যোতিত করে। যখন বলি 'একটি ছেলে' তখন তাকে বেশ গুরুত্ব দিই, আর যখন বলি 'একটা ছেলে' তখন করি তাকে অবহেলা, এমনকি গোপন ঘেন্নাও প্রকাশ ক'রে থাকি।

তিনি বিশ্বাস করেন, 'কবিতায় উচ্চারিত ধ্বনির আবেদনই প্রথম।' এতে কোনো সন্দেহ নেই, ভাষার চরিত্রই এই। কিন্তু ভয় হয়, কারণ 'প্রথম' শব্দটি যেনো অনেকটা 'প্রধান' তাৎপর্যও জ্ঞাপন করতে চায়। রবীন্দ্রনাথ থেকে তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে 'কবিতা নিঃশব্দে পড়বার বস্তু নয়, কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়েই তার রূপ ভালো করে প্রকাশ পায়।' এ-মতটিও গ্রহণ করতে দ্বিধা লাগে; কারণ আমি দেখেছি কবিতা যখন নিঃশব্দে মনে প্রবেশ করে, তখনি আন্তরিকভাবে ভেতরে ঢোকে। ধ্বনির আলোড়নে মুগ্ধ হওয়া রূপসীর শরীরে শোভায় মুগ্ধ হওয়ারই সমান। তিনি বলেছেন, 'নীরব পাঠও কার্যত হয় ধ্বনিময়।' এটা ঠিকই যে নীরব পাঠের সময়ও আমাদের মনে হয় যে আমরা ধ্বনিপরম্পরা উচ্চারণ ক'রে চলেছি, কিন্তু তা প্রতিভাসমাত্র। সন্‌জীদা খাতুন বেশ বিপজ্জনক চোরাবালিতে পা দিয়েছেন "ধ্বনি'র পরিধি' অংশে। তিনি বলেছেন, 'কাব্যছন্দ অপরিবর্তিত রেখে মূল কবিতাতে ব্যবহৃত পদের পরিবর্তে সমার্থক অন্য শব্দ ব্যবহার করে মূলের ধ্বনিবিপর্যয় ঘটালে বোঝা যাবে, শব্দার্থ বজায় থাকলেও, পরিবর্তনে কবিতার মূল স্বর বিঘ্নিত হচ্ছে।' এটা বোঝানোর জন্যে তিনি নিয়েছেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'চম্পা' ও তার 'ধ্বনিবিপর্যয়' গ্রস্ত রূপান্তর। তবে এ শুধু ধ্বনিপরিবর্তন নয়; এখানে একটি কবিতার বদলে রচিত হয়েছে আরেকটি কবিতা, তাও ব্যাকরণিকের আঙুলে, কবির আঙুলে নয়। এ-দুটি কবিতাকে কিছুতেই সমার্থক ব'লে মেনে নিতে পারি না। কারণ পরিপূর্ণ সমার্থকতা কিংবদন্তিমাত্র; তাই কোনো রচনার রূপান্তর কখনোই মূলের সমার্থক হ'তে পারে না। এখানে যে-পরিবর্তন ঘটেছে, তাতে ধ্বনিবিন্যাসের বদল তো ঘটেছেই; কিন্তু মূলত ঘটেছে শব্দ ও ভাবের বদল। 'আমারে ফুটিতে হল বসন্তের অন্তিম নিশ্বাসে', আর 'বিকশিনু দৈবযোগে মধুঋতু-বিদায়ের শ্বাসে' সমার্থক নয়। এখানে মূল পার্থক্য ধ্বনির নয়; বরং শব্দের ও অর্থের। ধ্বনি বদলেছে, কারণ শব্দ বদলেছে; এবং মূল পংক্তি ও রূপান্তর-পংক্তির শাব্দ ও ব্যঞ্জিত অর্থ এক নয়। 'ফুটিতে হল'র মধ্যে লুকিয়ে আছে অনিচ্ছার ও বাধ্যবাধকতার ব্যঞ্জনা, আর 'বিকশিনু'র মধ্যে রয়েছে সক্রিয়তার ভাব, যা ' দৈবযোগে'র সহায়তায় অক্রিয় হয় না; আর 'অন্তিম' ও 'বিদায়' একই অর্থ ও ব্যঞ্জনা জ্ঞাপন করে না। তাই মূল কবিতা ও তার রূপান্তর দিয়ে ধ্বনির মহিমা বোঝানো যায় না। ধ্বনিকেই তিনি গুরুত্বপূর্ণ ব'লে ভেবেছেন ব'লে আর্থ ভিন্নতা ব্যাখ্যা করেছেন ধ্বনির ভিন্নতা ব'লে। যেমন, তিনি উদাহরণ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের 'অধর ছুঁয়ে বাঁশিখানি চুরি করে হাসিখানি', যেখানে 'করে' প্রকাশ করে এক অর্থ, আর 'কোরো' উচ্চারণ প্রকাশ করে আরেক অর্থ। এখানে যে দ্ব্যর্থতা ঘটেছে, তা বাঙলা লেখনপ্রণালির জন্যেই ঘটেছে; আর

AMARBOI.COM

এ-অর্থ পার্থক্যের মূলে রয়েছে রৌপ পার্থক্য। সচেতন লেখায় এ-পার্থক্য নির্দেশ ক'রে দেয়া হয়। এখানে ঠিক ক'রে নিতে হবে কোন রূপটি বিশুদ্ধ এখানে; রূপ ঠিক হয়ে গেলে ধ্বনিপার্থক্য ঘটবে না। এমন আরেকটি উদাহরণ দিয়েছেন তিনি : 'দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই' ও 'দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু, পরকে করিলে ভাই'। তিনি বলেছেন, "বন্ধু' পদের আগে কমা-চিহ্ন না থাকলে 'ট' উচ্চারণ ও-কারান্ত হতে পারে, কমা-চিহ্ন যোগে 'নিকট্'-ই হবে।' এখানে যে দ্ব্যর্থতা, তাও ধ্বনির কারণে নয়; এটা ঘটেছে রৌপ পার্থক্যবশত, কিন্তু লেখনপ্রণালির ত্রুটির জন্যে তা নির্দেশিত হয় নি। যদি 'নিকট' বিশেষণ হয় 'বন্ধু'র, তাহলে শব্দ দুটির মধ্যে কমা বসবে না, বেশি যত্ন নিলে মাঝে একটা হাইফেন বসানো যায়, আর তখন 'নিকট'-এর উচ্চারণ হবে স্বরান্ত; এবং 'নিকট' যদি হয় স্থানিক বিশেষণ, 'বন্ধু' হয় সম্বোধনপদ, তাহলে 'নিকট'-এর উচ্চারণ হবে ব্যঞ্জনান্ত। অর্থাৎ সন্‌জীদা খাতুন যেখানে মনে করেন যে উচ্চারণ পার্থক্যের জন্যে ঘটেছে আর্থ পার্থক্য, সেখানে আসলে রৌপ পার্থক্যের জন্যে ঘটেছে উচ্চারণ পার্থক্য। লেখার অযত্ন দায়ী এ-গোলমালের জন্যে।

'বাংলাভাষার ধ্বনিচরিত্র' পরিচ্ছেদটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও চমৎকার; কিন্তু কোনো কোনো সিদ্ধান্ত মেনে নিতে দ্বিধা হয়। তিনি বাঙলা স্বরধ্বনির হ্রস্ব-দীর্ঘত্ব স্বীকার করেছেন; এবং দেখিয়েছেন যে প্রতিটি বাঙলা স্বরধ্বনিই হ্রস্ব-দীর্ঘ হ'তে পারে। তাঁর মতে 'শীল' ও 'শিল', 'বেশ' (পোশাক) ও 'বেশ' (অনুমোদন) প্রভৃতি উদাহরণে স্বরধ্বনির হ্রস্ব ও দীর্ঘত্বঘটিত ভিন্নতা ঘটে। কিন্তু এ-ভিন্নতা তাৎপর্যপূর্ণ নয়; ইচ্ছে করলে যে-কোনো স্বরধ্বনিকে আমরা দীর্ঘ করতে পারি, তবে তা আর্থ তাৎপর্যপূর্ণ নয় ব'লে ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবেও গুরুত্বপূর্ণ নয়। তিনি মেনে নিয়েছেন যে 'সংস্থান ভেদে বাংলার সাতটি স্বরধ্বনিরই হ্রস্ব ও দীর্ঘ দুই রূপ রয়েছে'; তবে এ-মানা নিরর্থক। এর কোনো তাৎপর্য নেই। ধ্বনিব্যাখ্যায় তিনি মেনে নিয়েছেন সাংগঠনিক মূলধ্বনিতত্ত্ব। মূলধ্বনিতত্ত্ব এখন অনেকটা বাতিল হয়ে গেছে, এখন আর একেকটি মূলধ্বনিকে স্বতন্ত্র অবিভাজ্য একক ব'লে মানা হয় না; বরং মনে করা হয় একগুচ্ছ স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি ব'লে। সাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্যতত্ত্ব যদি তিনি গ্রহণ করতেন, তাহলে তাঁর ব্যাখ্যা বেশ ভিন্ন হতো।

'ধ্বনি থেকে কবিতা' পরিচ্ছেদে প্রথমে তিনি ধ্বনির স্বকীয় গুণতত্ত্বানুসারে ব্যাখ্যা করেছেন 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতাটি। এ-আলোচনার ভূমিকায় তিনি এমন কটি শব্দ ব্যবহার করেছেন, যাতে মনে হয় আপন তত্ত্ব সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দেহ নন; কিছুটা দ্বিধা তাঁরও রয়েছে। তিনি যখন বলেন, 'এক এক সংস্কৃতিতে এরকম নানা ধারণা সঞ্চিত হয়ে যায়, তার আপন একটি ধারা সৃষ্টি হতেই পারে'; বা 'সেই রুদ্ধ মুক্ত দলের বিন্যাসের ধরনে ভিন্ন ভিন্ন বোধ জাগা বিচিত্র নয়'। 'হতেই পারে' বা 'বিচিত্র নয়' ধরনের উক্তি শুনে মনে হয়, তিনি যেনো নিজের তত্ত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত নন। এ-পরিচ্ছেদে পাঁচটি কবিতা বিশ্লেষণ করেছেন তিনি; প্রতিটি কবিতার ধ্বনির হিশেব নিয়েছেন, ধ্বনিগুণ ব্যাখ্যা করেছেন, এবং কবিতার ভাবের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন

ধ্বনির বৈশিষ্ট্যগুলোকে। তবে মনে হয় এতো হিশেবনিকেশ, এতো পরিশ্রম যেনো ঠিক ফলটি দিচ্ছে না। তিনি কাব্যিক গদ্যে প্রতিটি কবিতার ভাবও ব্যাখ্যা করেছেন, এবং দেখিয়েছেন কবিতাটির ধ্বনিগুলো সমর্থন করে তার ভাবকে। তবে একে মনে হয় মিলিয়ে দেয়া;—যেনো ভাবটি আগে বুঝে নিয়েছেন আলোচক, পরে তার কাজ হয়েছে ভাব সমর্থন ক'রে ধ্বনিগুলোকে ব্যাখ্যা করা। এর বদলে তিনি পারতেন ভাবব্যাখ্যা পুরোপুরি ত্যাগ করতে; তিনি নিতে পারতেন শুধু ধ্বনির হিশেব, এবং ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারতেন যে কবিতাটি এমন ধ্বনি রয়েছে, এমন তার বিন্যাস, তাই ভাব হবে এমন। তাহলে প্রমাণিত হতো তত্ত্বটির শক্তি; আমরা ধ্বনির হিশেব নিয়েই কবিতার ভাব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারতাম। তা হয় নি ব'লে মনে হয় ভাষ্যকার তাঁর ধ্বনিবিষয়ক জ্ঞান দিয়ে ধ্বনির সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন কবিতার ভাবকে। কবিতা পাঁচটিকে তিনি এমনভাবে ব্যাখ্যা করছেন, যেনো এগুলো বাঙলা ভাষার শ্রেষ্ঠ কবিতা। খুব বেশি শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন তিনি কবিতাগুলোর প্রতি, এবং ধ্বনি ব্যাখ্যা ক'রে তাদের অতিমহিমা দেখিয়েছেন। আমার বোধে তাঁর গৃহীত কবিতাগুলোর মধ্যে দুটি উৎকৃষ্ট কবিতা; অন্য তিনটি অতো ভালো নয়। এমন ঘটেছে 'রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠান্তরে ধ্বনি'তেও। এ-পরিচ্ছেদে যে-কবিতাটির অসামান্যতা ব্যাখ্যা করেছেন তিনি, সেটি খুব উৎকৃষ্ট কবিতা নয়, রবীন্দ্রনাথের হওয়া সত্ত্বেও।

কয়েকটি ছোটোখাটো বিষয়েও প্রশ্ন জাগে। যেমন, তিনি 'গর্জন' শব্দে একটি 'হসন্ত ঘৃষ্ট জ'-এর কথা বলেছেন। এ-শব্দে হসন্ত জ্ কোথায়? 'গর্জন'-এর উচ্চারণ করি আমরা [গর্‌জোন], এখানে তো কোনো হসন্ত জ্ নেই; তাহলে কি তিনি এর উচ্চারণ করেন [গর্জ্-জোন]? এ একটু বাড়াবাড়ি নয়? 'দীর্ঘশ্বাস' শব্দেও তিনি পেয়েছেন একটি 'রেফ-সংশ্লিষ্ট হসন্ত গ'। কোথায় সেটি? তাহলে কি এর উচ্চারণ করবো [দীর্গ্‌ঘোশ্‌শাস্]? 'যাকে আবহমানকাল ভালোবেসে এসেছি সেই নারীর' পংক্তিটি সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'ভালোবাসার উষ্মশ্বাস উষ্ণধ্বনির (নাকি উষ্মশ্বাস উষ্ণধ্বনির?) ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ছত্রটিতে।' হয়তো এখানে মুদ্রণত্রুটি ঘটেছে; ভাষ্যকার এখানে ভালোবাসার উষ্ণশ্বাস ও উষ্মধ্বনির কথাই হয়তো বলেছেন। যদি তাই হয়ে থাকেন (না বলে পংক্তিটি বেশ উদ্ভট হয়ে ওঠে) তাহলে এ-ব্যাখ্যা মেনে নিতে কষ্ট হয়। জীবনানন্দের ভালোবাসায় উষ্ণতার থেকে কোমল মধুর বিষণ্ন শীতলতাই বেশি।

বইটি গবেষণাগ্রন্থ হ'লেও গবেষণার রীতিনীতি কখনোকখনো অবহেলিত হয়েছে। যেমন, তিনি কোনো কোনো মন্তব্য বা উদ্ধৃতির উৎস নির্দেশ করেন নি; বা তিনি হয়তো ব্যবহার করেছেন কোনো একটি বইয়ের কোনো একটি বিশেষ প্রবন্ধ, কিন্তু প্রবন্ধটির নামোল্লেখ না ক'রে পুরো বইটির নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন, ভর্তৃহরি সম্পর্কে বলেছেন যে ওই কবি-বৈয়াকরণ *বাক্যপদীয়*তে গ-ধ্বনি শুনলেই 'গোরু'র স্মৃতি জাগার কথা নিয়ে পরিহাস করেছেন। জানতে ইচ্ছে করে বইটির কোন অংশে এমন পরিহাস করেছেন তিনি, পরিহাসটিই বা কি? তিনি বলেছেন ফার্থ 'তাঁর *পেপারস*

ইন লিংগুইস্টিক্স বইয়ে' প্রতিবাদ করেছেন একটি মতের। পুরো বইতে, নাকি বিশেষ কোনো প্রবন্ধে? তিনি কি বইটি নিজে দেখেছেন? একজন বিখ্যাত সমালোচকের নামও ভুল মুদ্রিত হয়েছে, রেনে ওয়েলেক হয়েছে আলবার্ট ওয়েলেক। এ-ধরনের বইতে কারো নামের পাশে শ্রদ্ধাবাচক শব্দ প্রয়োগের দরকার পড়ে না, তিনি তা সাধারণত করেনও নি; কিন্তু মুহম্মদ আবদুল হাই নামটির সাথে সব সময় ব্যবহার করেছেন 'সাহেব' শব্দটি। এর কোনো দরকার ছিলো? গ্রন্থপঞ্জিটিও একটু অগোছালো। গৃহীত রচনাগুলো লেখক-নামানুসারে বর্ণানুক্রমভাবে দেয়াই সাধারণ রীতি; কিন্তু তা এলোমেলো হয়ে গেছে। এসব দ্বিমত ও ছোটোখাটো ত্রুটি সত্ত্বেও আনন্দের সাথেই স্বীকার করতে হয় বইটির মূল্য। বইটি ধ্বনির মহিমা সম্পর্কে আমাদের ক'রে তুলবে আরো সচেতন, কবিতা ভোগের সময় ধ্বনির তাৎপর্য উপভোগেরও আগ্রহ পোষণ করবো এ-বই পড়ার পর। শাণিত হবে আমাদের ধ্বনিসংবেদনশীলতা। বাঙলাদেশের সমালোচনা সাহিত্যে *ধ্বনি থেকে কবিতা* গৃহীত হবে একটি অভিনব, ও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ব'লে। বইটি তাঁকে গৌরব এনে দেবে।

জীবন ক্রমশ ও *মায়ের কাছে যাচ্ছি* : আত্মজীবনী ও আত্মজৈবনিক উপন্যাস

আবু রুশ্‌দ্‌ ও রশীদ করীম, দুই সহোদর, আমাদের দুই গুরুত্বপূর্ণ কথাশিল্পী। বাঙলাদেশের কথাসাহিত্যের আধুনিক ভিত্তি রচনায় ও বিকাশে তাঁরা দুজন পালন করেছেন মূল্যবান ভূমিকা। সম্প্রতি এ-দুই সহোদরের এমন দুটি বই বেরিয়েছে, যে-দুটিকেও গণ্য করতে পারি সহোদর গ্রন্থ ব'লে; একটি আবু রুশ্‌দের আত্মজীবনী *জীবন ক্রমশ*, অন্যটি রশীদ করীমের উপন্যাস *মায়ের কাছে যাচ্ছি*। বই দুটি পড়ার পর মনে হয় যে-পরিবার জন্ম দিয়েছে এ-দুই কথাশিল্পীকে, সে-পরিবারই যেনো তার দু-সন্তানের হাত দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে বই দুটি। একটি রূপ পেয়েছে অব্যবহিত বাস্তবের বিবরণমুখর আত্মজীবনীর, অন্যটি ওই বাস্তবকে রূপান্তরিত করেছে উপন্যাসে। তাই বই দুটি সহোদরের মতো রক্তের সম্পর্কে জড়িত। কিন্তু অভিন্ন পিতামাতা থেকে অবিকল অভিন্ন সন্তানেরা উদ্ভূত হয় না, কখনো কখনো সম্পূর্ণ বিপরীত মানুষের উদ্ভব ঘটে; এটা দেখতে পাই আবু রুশ্‌দ্‌-রশীদ করীম ভ্রাতৃযুগলের মধ্যেই। আবু রুশ্‌দ্‌ বাহ্যবাস্তবের অধিবাসী, অনেকটা প্রাকৃত, স্পর্শকাতরতাহীন; আর রশীদ করীম বাহ্যবাস্তবকে পেরিয়ে মনোবাস্তবে থাকতেই পছন্দ করেন। তিনি বেশ সংস্কৃত, ও প্রবল স্পর্শকাতর। আবু রুশ্‌দ্‌ মোটামুটি খাপ-খাওয়া মানুষ, আর রশীদ করীম বেশ খাপ-না-খাওয়া মানুষ। তবে মিল ও রয়েছে তাঁদের, বিশেষ ক'রে রাজনীতিবোধে তাঁরা একই রকমের; বেশ সরল চোখে তাঁরা দেখেন রাজনীতিক ব্যাপারগুলোকে, এবং নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে আক্রান্ত বা হ'লে ক্ষুব্ধ হন না। আবু রুশ্‌দ্‌ যে-পটভূমি থেকে যাত্রা করেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে, সে-পটভূমিই রশীদ করীমের উপন্যাসের ভিত্তি; এবং দুটি বইয়ে অনেক ঘটনা পাওয়া যায়, যা অভিন্ন, বা উপন্যাসটিতে কিছুটা রূপান্তরিত। তাই *জীবন ক্রমশ*কে যদি বলি আত্মজীবনী, তাহলে *মায়ের কাছে যাচ্ছি*কে বলতে হবে আত্মজৈবনিক উপন্যাস। একটি একজনের বাহ্যজীবনের ইতিবৃত্ত, অন্যটি আরেকজনের বাহ্য ও আন্তর জীবনের ইতিকথা। দু-সহোদর একই সময়ে তাকিয়েছেন নিজেদের দিকে, রচনা করেছেন দু-রকমের শিল্পকর্ম, এবং প্রকাশ করেছেন একই সময়ে, ১৯৮৯-এর ফেব্রুয়ারিতে। বই দুটি, এবং পেছনের দু-ব্যক্তি, পাঠকের কাছে স্বচ্ছ হয়ে ধরা পড়েন যদি বই দুটি পড়া হয় একই সময়ে, প্রথমে আত্মজীবনীটি প'ড়ে নিয়ে উপন্যাসটিতে প্রবেশ করলে চমৎকার পুরস্কার মেলে।

আত্মজীবনীও এক ধরনের উপন্যাস, এক ধরনের *রিমেমব্র্যান্স অফ থিংজ পাস্ট*; এবং বাঙলার বদ্ধসমাজের জন্যে বিশেষ দুরূহ শিল্পকর্ম। রবীন্দ্রনাথ স্মৃতির পাতায় খামখেয়ালি এমন এক শিল্পীর ছবি আঁকার কথা বলেছেন, যে ছোটোকে বড়ো করে, বড়োকে ছোটো করে। অমন স্বেচ্ছাচারীর তুলিতে যে-ছবি আঁকা হয়, তা হয়তো শিল্পকলা হিশেবে চমৎকার, কিন্তু তা আত্মজীবনীর দাবি মেটায় না। আমার ধারণা

রবীন্দ্রনাথ ওই খামখেয়ালি শিল্পীর কথা বলেছেন বঙ্গীয় বদ্ধসমাজের বিধিনিষিধের কথা ভেবে। এখানে সব কথা বলা যায় না, এখানে সত্যকে চেপে রাখতে হয়; এখানে বলতে হয় শুধু সেটুকু যেটুকু বলা যায়। শিল্পীদের জীবন নিয়ে সমস্যা বিশেষভাবেই বেশি; কারণ তাঁদের বাহ্যজীবনের থেকে আন্তর জীবনটাই বেশি বর্ণাঢ্য ও ব্যাপক; কিন্তু সে-জীবনের হিরণ্ময় অংশই বদ্ধ সামাজিক দৃষ্টিতে অমার্জনীয় পাপাচার। তাই বাঙলায় আত্মজীবনী হয়ে ওঠে নিজেকে দেবতা বানানোর বই, বা সামাজিক রাজনীতিক ইতিহাস। এসব বই ভিন্নভাবে সফল হ'তে পারে, কিন্তু ব্যর্থ আত্মজীবনী হিশেবে। আত্মজীবনীতে চাই আমরা ব্যক্তিকে, তাঁর অন্তরঙ্গ বৈধঅবৈধ জীবন, ও স্বপ্নকামনাবাসনাকে, এবং তাঁর সময়কে। এমন আত্মজীবনী বাঙলা ভাষায় দুর্লভ। রাসেল বা নেরুদার আত্মজীবনীর কথা বাঙলা ভাষায় ভাবতেই পারি না। কে আছেন এমন সাহসী, যিনি উদ্যোগী হবেন তাঁর জীবন ও মৃত্যুকে কলঙ্কিত ক'রে তুলতে? কপটতার দেশে তাই আত্মজীবনীতে আশ্রয় নিতে হয় কপটতার; বহু কিছু লুকিয়ে লিখতে হয় এমন একটি বই, যার দিকে তাকিয়ে লেখক ও পাঠক উভয়েই দুঃখিত বোধ করেন। এখানে আত্মজীবনী লেখা সাহসের কাজ; লেখক জানেন যা তাঁর লেখার কথা তিনি তা লিখতে পারবেন না, তবুও তিনি লিখছেন; এবং জেনেশুনেই তিনি একটি ব্যর্থ বই লেখার নিয়তি বরণ ক'রে নিচ্ছেন। তাই বাঙলা ভাষায় কোনো আত্মজীবনীই বিশ্বমানের হয়ে উঠতে পারে নি।

আবু রুশ্‌দের *জীবন ক্রমশ* তাঁর জীবনের তিনদশকের বিবরণ : ১৯১৯-এ কলকাতায় জন্ম নেয়া থেকে শুরু ক'রে ৪৭-এর দেশবিভাগ ও ঢাকায় নতুন জীবন শুরু করা পর্যন্ত জীবনকাহিনী বর্ণনা করেছেন তিনি বইটিতে। শেষ তিনটি পৃষ্ঠায় তিনি কিছু কথা বলেছেন শেখ মুজিবর রহমান সম্বন্ধে। বইটি লেখকের বিশাল আত্মীয়মণ্ডলি ও তাঁর সহকর্মীদের পরিচিতিগ্রন্থ; তিনি নিজের সম্পর্কে যেটুকু বলেছেন, তা বেশ স্বল্প। বইটিতে পাওয়া যায় আবু রুশ্‌দের বাল্যের কলকাতার বিভিন্ন সড়কের পরিচয়, এবং পাওয়া যায় তাঁর দাদা কলকাতা পুলিশের চিফ ইনস্পেক্টর খান সাহেব আবদুর রহিম থেকে শুরু ক'রে অসংখ্য বিখ্যাত-অবিখ্যাত আত্মীয়স্বজন ও সহকর্মীদের পরিচয়। এঁদের মধ্যে অনেকেই অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। লেখক তাঁর বাল্যজীবনের বর্ণনা দিয়েছেন, লেখাপড়ার কথা বলেছেন, চাকুরিতে প্রবেশের ও অধ্যাপনাকে পেশা হিশেবে বেছে নেয়ার কথা বলেছেন। অর্থাৎ তাঁর তিন দশকের জীবনের বাহ্যিক বহু ঘটনা, ও বহু ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার কথা রয়েছে বইটিতে। এর ফলে কারো কারো মুখ চোখের সামনে ভাসে, কোনো কোনো ঘটনা স্ফুলিঙ্গের মতো মনে জ্ব'লে ওঠে, কিন্তু যিনি সবচেয়ে অবহেলিত থেকে যান, যার মুখ সবচেয়ে নিষ্প্রভ ব'লে মনে হয়, তিনি আবু রুশ্‌দ্ নিজে।

জীবন ক্রমশ কে একজন কথাশিল্পীর আত্মজীবনী ব'লে মনে হয় না; মনে হয় একজন শিক্ষকের জীবনবিবৃতি। এ-বইতে যে-আবু রুশ্‌দ্‌কে পাই, তিনি পুরোপুরি বাহ্যিক মানুষ; কোনো স্বপ্ন তাঁকে আলোড়িত করে না, কোনো বিষাদ তাঁকে ভারাতুর

করে না। লেখকের কোনো অন্তরঙ্গ আন্তর জীবন নেই, কোনো কামনাবাসনা দ্বারা মথিত হয় নি তিনি কখনো। তাঁর কোনো সাফল্যের উল্লাস নেই, ব্যর্থতার হাহাকার নেই। তাঁর রয়েছে শুধু বাস্তব; তবে সে-বাস্তবও খণ্ডিত পারিপার্শ্বিক সামান্য বাস্তব। একটি দারুণ সময়ের মধ্যে বেড়ে উঠেছেন তিনি, দেখেছেন বা বাস করেছেন মানব-ইতিহাসের কিছু মর্মস্পর্শী ভয়াবহ ঘটনার মধ্যে; কিন্তু তা তাঁর জীবন বা কল্পনাকে আলোড়িত করে নি। তাঁর জীবনে কোনো সোনার টুকরোর মতো গোপন ঘটনা নেই, কোনো মহৎ উপাখ্যান নেই; তাঁর জীবনে রয়েছে শুধু আত্মীয় ও সহকর্মীবর্গ। তাঁর রাজনীতিক দৃষ্টিও খুবই সরল। তাঁর আত্মীয় ও সহকর্মীবিবরণীর মধ্যে তাঁর জীবনের যে-দু-একটি ঘটনা মনে থাকে, তা হচ্ছে ফুটবল ক্লাবের চাঁদা মেরে দেয়া, বই চুরি ক'রে বিক্রি ক'রে সিনেমা দেখা, পতিতালয়ে ব্যর্থতা, ছোটো এক ভাই ও উন্মাদ এক ভাইয়ের মৃত্যুর ঘটনা। বেশ বড়ো একটি বইয়ে এতোটুকু মার্মিক উপাখ্যান বেশি তৃপ্তি দিতে পারে না। আবু রুশ্‌দ্‌ সব কিছু দেখেছেন বেশ সরল দৃষ্টিতে, তাই যাঁরই নাম লেখা হয়েছে তাঁর কলমে, তাঁকেই তিনি ভূষিত করেছেন চূড়ান্ত বিশেষণে। তাঁর চোখে কেউ জাঁদরেল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, কেউ জাঁদরেল হেডমাস্টার; তাঁর চোখে সৈয়দ আলী আশরাফ 'যশস্বী অধ্যাপক, সুপণ্ডিত ও কবি হিশেবে' প্রসিদ্ধ, সৈয়দ আলী আহসান 'বিরল ব্যক্তিত্ব'। তিনি বলেন, 'আমার পুরনো ছাত্রদের মধ্যে রাজনীতিক ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত সর্বাধিক সাফল্য লাভ করেছেন বাঙলাদেশের বর্তমান ভাইস-প্রেসিডেন্ট জনাব এ কে এম নূরুল ইসলাম।' একজন শিক্ষক হিশেবে তাঁর তো বিচার করা উচিত ছিলো জনাব ইসলামের 'সাফল্য' আসলে সাফল্য, না শোচনীয়তা? শুধু একজন সম্পর্কেই আবু রুশ্‌দ্‌ কিছুটা স্পষ্ট সমালোচনা করেছেন; তিনি তাঁর আরেক ছাত্র, সম্ভবত তাঁর সবচেয়ে ব্যর্থ ও সবচেয়ে সফল ছাত্র, শেখ মুজিবর রহমান। কিন্তু তিনি যদি তাঁর এ-ছাত্রের সমালোচনাটুকু ক'রেই থেমে যেতেন, তাহলে শিক্ষকের কণ্ঠস্বর শুনতাম; কিন্তু সামন্য সমালোচনার ক্ষতিপূরণ হিশেবে যে তাঁকে অনেকগুলো প্রশংসার কথা বলতে হয়েছে, এতে বুঝি শিক্ষক সাধারণ সুবিধাসচেতন মানুষে পরিণত হয়েছেন। *জীবন ক্রমশ* একজন সীমাবদ্ধ মানুষের সীমাবদ্ধ উপখ্যান; এর কোনো উচ্চাভিলাষ নেই। এ-সীমাবদ্ধতা শুধু তাঁর ব্যক্তিগত নয়, তাঁর প্রজন্মেরও। বইটির মূল্য এখানে যে এটি আবু রুশ্‌দের লেখা।

রশীদ করীমের *মায়ের কাছে যাচ্ছি* আত্মজৈবনিক উচ্চাভিলাষী উপন্যাস। উচ্চাভিলাষী সব কিছুর আমি অনুরাগী; ব্যর্থ উচ্চাভিলাষও সফল লোকপ্রিয় সামান্য অভিলাষের চেয়ে অনেক মূল্যবান। *মায়ের কাছে যাচ্ছি* উপন্যাস, অপন্যাস নয়। ২৭টি পরিচ্ছেদে ৪০৭ পাতায় রশীদ করীম বলেছেন তাঁর বহুমুখি উপাখ্যান, যা তাঁর বাস্তব ও অবাস্তব জীবনের শিল্পরূপ। তিনি সম্ভবত কখনো আত্মজীবনী লিখবেন না, তাই এ-উপন্যাসটিতে তিনি চালিয়েছেন ভিন্ন ধরনের আত্মজীবনী রচনার নিরীক্ষা। আবু রুশ্‌দের *জীবন ক্রমশ*-এ এমন কিছু পরিবেশ, ঘটনা ও পাত্রপাত্রী পাই, যা এ-উপন্যাসে অবিকল বা রূপন্তরিত হয়ে দেখা দিয়েছে। যেমন, যে-পরিবেশে জন্মেছেন, বেড়ে উঠেছেন রুশ্‌দ্‌ ও করীম; সে-একই পরিবেশে বড়ো হয়েছে *মায়ের*

কাছে যাচ্ছি র নায়ক কামর, যার পুরো নাম কামরুদ্দীন আহমদ। তাঁদের দাদা ছিলেন কলকাতা পুলিশের প্রথম ভারতীয় চিফ ইন্সপেক্টর, আর কামরের 'গ্রান্ড ফাদার' ও ছিলেন 'ফার্স্ট ইন্ডিয়ান চিইফ ইন্সপেক্টর অফ ক্যালকাটা পুলিশ'। আবু রুশ্‌দ্‌ তাঁর এক মেধাবী অনুজ, যার নাম হেদায়েৎ, যে উন্মাদ হয়ে হেমায়েতপুর হাসপাতালে সকলের অবহেলায় মারা যায়, তার কথা বেদনার সাথে বলেছেন; আর কামরও বলেছেন তাঁর উন্মাদ তওফিক ভাইয়ের কথা, যার একই রকম অবহেলিত মৃত্যু ঘটে হেমায়েতপুরে। এ-ভাইটি আবু রুশ্‌দ্‌ ও রশীদ করীম দুজনকেই নাড়া দিয়েছিলো, অপরাধবোধে ভারাক্রান্ত ক'রে তুলেছিলো। তার নামপরিচয়হীন কবর সম্পর্কে আবু রুশ্‌দ্‌ বলেছেন, 'সে আমাকে যে কবরটা দেখালো তা হেদায়েৎ-এর কবর কিনা সঠিকভাবে জানবার উপায় নেই, কারণ কবরটা নামহীন। তবে সেটা যদি তার কবর হয়ে থাকে তবে আমার দুর্দশাগ্রস্ত ভাই তার খাঁটি ও পরিষ্কার মনের উপযুক্ত এক পরিবেশ পেয়েছে।' আর রশীদ করীম নায়ক কামরের মানসিক রোগগ্রস্ত অবহেলিত তওফিক ভাইয়ের শেষ উক্তিতে—'বাট দেয়ার ইজ সোলেস ইন দ্য থট দ্যাট আই য়্যাম গোইং টু মাই মাদার। আমি আমার মায়ের কাছে যাচ্ছি।'—পেয়েছেন তাঁর জৈবনিক উপন্যাসের স্মরণীয়, তাৎপর্যপূর্ণ, মন-কেমন-করা নাম। তাই *মায়ের কাছে যাচ্ছি* র আত্মজৈবনিকতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকে না।

মায়ের কাছে যাচ্ছি কামরের, জনাব কামরুদ্দীন আহমদের, জীবনবৃত্তান্ত; তবে এ-বৃত্তান্ত শুধু বাহ্যবাস্তবের নয়, মনোবাস্তবেরও। তাকে কেন্দ্র ক'রে এসেছে অন্যান্য চরিত্র; তিনিও কখনো কখনো গিয়ে পড়েছেন বিভিন্ন পাত্রপাত্রী ও পরিস্থিতির মধ্যে, যেমন বাস্তবে আমরা সবাই জড়িয়ে পড়ি বিভিন্ন পরিস্থিতি ও পাত্রের সাথে। কাহিনী বলা হয়েছে কখনো স্মৃতিচারণায়, কখনো স্বগতোক্তি-সম্বোধনে, কখনো রচয়িতার বিবৃতিতে। কাহিনী বর্ণনার এ-রীতিকে চালচ্চিত্রিক রীতিও বলতে পারি। পুরো কাহিনীকে দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথম ভাগে রয়েছে কামরের বাল্য ও তরুণ জীবন ও প্রতিবেশের বিবরণ; আর দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে বয়স্ক, প্রতিষ্ঠিত কিন্তু ব্যর্থ, কামরের জীবন ও ভাবনাবেদনার উপাখ্যান। প্রথম ভাগে কামর বেড়ে উঠেছে কলকাতার এক গলিতে, দরিদ্র পরিবারে, আক্রান্ত হয়েছে, কাঞ্চন নামক একটি কিশোরীর প্রেমে পড়েছে, ব্যর্থ হয়েছে; দ্বিতীয় ভাগে কামর যাপন করেছেন তার বাহ্যিকভাবে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু মানসিকভাবে ব্যর্থ জীবন। প্রথম ভাগে পাত্রপাত্রীর সংখ্যা একটু বেশিই, অনেককেই মনে রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে না, এমনকি লেখকও কামরের একমাত্র বোনটির নামও সব সময় ঠিক মতো মনে রাখতে পারেন নি। ওই প্রায়-অদৃশ্য বোনটি কখনো সহেলি, কখনো সালেহা হয়ে উঠেছে লেখকের মনের ভুলে। এ-ভাগের সবচেয়ে বড়ো ঘটনা কামরের প্রেম, কাঞ্চনের সাথে একটি প্রায়-নিরাবেগ ভালোবাসা, যা তার জীবনটিকেই বদলে দেয়। দ্বিতীয় ভাগে কামর প্রশান্ত, অনেকটা দার্শনিকভাবে যাপন করেছেন নিজের অপারিবারিক ও মানসিকভাবে ব্যর্থ, কিন্তু সামাজিক আর্থনীতিকভাবে সফল জীবন। আত্মজীবনীকে উপন্যাসে পরিণত করার জন্যে কামরকে রাখা হয়েছে চিরকুমার, যার ফলে অনেক জটিলতা থেকে বেঁচে গেছেন ঔপন্যাসিক।

AMARBOI.COM

*মায়ের কাছে যাচ্ছি*র কামর নির্ভুল স্মরণ করিয়ে দেয় রশীদ করীমের *বড়ই নিঃসঙ্গ*র শরিফকে; *বড়ই নিঃসঙ্গ*র শরিফই *মায়ের কাছে যাচ্ছি*তে দেখা দিয়েছে কামররূপে। *মায়ের কাছে যাচ্ছি*কে বলতে পারি রশীদ করীমের আর একটি *বড়ই নিঃসঙ্গ*। রশীদ করীম বাঙলাদেশে খাপ-না-খাওয়া চরিত্রের অনন্য চিত্রকর। *বড়ই নিঃসঙ্গ* উপন্যাসে তিনি সৃষ্টি করেছেন এমন একটি খাপ-না-খাওয়া বহিরস্থিত চরিত্র, যার সংবেদনশীলতা, মানবিকতা আমাদের আলোড়িত ও মথিত করে, এবং সে আমাদের বুকের ভেতরের অধিবাসী হয়ে ওঠে। কিন্তু কামরের সে-সংবেদনশীলতা নেই, মথিত করার শক্তি নেই, তার খাপ-না-খাওয়ার ব্যাপারটিকে মনে হয় অনেকটা আরোপিত। তার প্রধান সীমাবদ্ধতা সে অনুভব ও উপলব্ধির বদলে বই পড়ে, বইপড়া কথা আওড়ায়, সুযোগ পেলেই বক্তৃতা দিতে শুরু করে। কামর, অনেকটা হ্যামলেটের মতো, নিজের বক্তৃতা দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি ক'রে নেয় সামান্য ছুতোয়; এবং পাতার পর পাতা ভ'রে কথা বলার নামে ভাষণ দেয়। কামর এতো প্রসঙ্গে এতো কথা বলেছে—ক্রিকেট, চার্চিল, জিন্নাহ, অতিপ্রাকৃতিক গল্প, হ্যামলেট ও আরো বহু বিষয়ে এতো কথা বলেছে, সাধারণ বইপত্রে পাওয়া যায় এমন সব জ্ঞানের কথা এতো শুনিয়েছে যে তাকে প্রগাঢ় মনে করতে দ্বিধা লাগে। এসব অংশ, যা ১০০ পাতারও বেশি জায়গা জুড়ে আছে, উপন্যাসে থেকে ছেটে ফেললে কোনো ক্ষতি হয় না; বরং কামর আরো অনেক আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে।

*মায়ের কাছে যাচ্ছি*র প্রথম ভাগের প্রধান ঘটনা কামর-কাঞ্চনের প্রথম ও শেষ প্রেম। প্রথম প্রেম যে এতো নিরাবেগ, স্বপ্ন ও আলোড়নহীন হ'তে পারে, তা ভাবতেও কষ্ট হয়, অথচ এরই জন্যে নষ্ট হয়ে গেলো দুটি জীবন—কামর ও কাঞ্চন। কাঞ্চনকে বিশেষ সম্মানের চোখে দেখা হয়েছে উপন্যাসটিতে, তার সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে বহু সম্ভ্রান্ত বিশেষণ; কিন্তু কাঞ্চানকে দেখা গেছে খুবই কম, এবং যেটুকু দেখা গেছে তাতে তাকে এতোটা আরাধ্য মনে হয় না যতোটা আরাধ্য মনে করেছেন লেখক। একটি দৃশ্যেই শুধু তারা প্রেমের উচ্ছলতা বোধ করেছে, সেটা অভিবাসনের পথে গরুর গাড়িতে; আর মাত্র একটি উক্তিতে কাঞ্চনের রক্তের লাল রঙ দেখা গেছে—কামর তার বুক দেখে ফেলার পর যখন সে বলে, 'দেখছিলেই যদি তো বলো কেমন?' উপন্যাসটিতে রয়েছে অজস্র ঘটনা। যেহেতু এটি প্লটনির্ভর, ছকবাঁধা উপন্যাস নয়, তাই এতে ঘটনা এসেছে জীবনের মতো গড়িয়ে, পূর্বপরিকল্পিতভাবে নয়। সব ঘটনা মিলে, এবং আরো অনেক ঘটনা নিশ্চয়ই ছিলো যা লিপিবদ্ধ হয় নি, গ'ড়ে উঠেছেন কামর, ও *মায়ের কাছে যাচ্ছি*। কিছু ঘটনা মনে বেশ দাগ কাটে। সবচেয়ে বেশি দাগ কাটে গাড়ির তলায় পিশে যাওয়া ছেলেটির ও তার গরিব মা-বাবা রুস্তম-কানিজের কাহিনী। তাদের একটি সন্তান গাড়ির চাকার তলে পিশে গিয়েছিলো ব'লে তারা কিছু টাকা পেয়েছিলো, খেতে পেয়েছিলো, কিছুটা স্বচ্ছল হয়ে উঠেছিলো; তাই অবচেতনে তারা আরেকটি সন্তান পিষ্ট হওয়া কামনা করতো। তওফিক ভাইয়ের অবহেলিত মৃত্যুও দাগ কাটে, আর তার শেষ কথাগুলো বুকে বাজতে থাকে—'আমি আমার মায়ের কাছে যাচ্ছি।' দাগ কাটে উন্মাদ মুক্তিযোদ্ধা ও তার পতিতা স্ত্রীর কাহিনীও।

কিছু ঘটনা ও মন্তব্য সম্বন্ধে প্রশ্নও জাগে। বুক ছুঁলে ছেলে হয় কিনা বিষয়ে দুটি যুবক যখন আলোচনা করে, তখন অবিশ্বাস্য মনে হয়। ওই সময় কি যুবকেরা এতোই শিশু ছিলো? কাঞ্চন যখন কামরকে হঠাৎ প্রশ্ন করে, 'তুমি চুমুটুমু খেতে চাও না তো?', এবং নিজেই যখন বলে, 'কখনো চুমু খেতে চেও না! আমার ভীষণ ভয় করে।' তখন খাপছাড়া মনে হয় কথাগুলোকে; নাকি ধ'রে নেবো তার এসব কথা প্রেমিককে ওই ভীতিকর কাজে উৎসাহিত ক'রে তোলার পরোক্ষ প্রচেষ্টা? বাঙলাদেশ হয়ে যাওয়ার পর একবার অভিযোগ ওঠে যে কামর কমিউনিস্ট। মফিজ নামে একটি যুবক তাকে বলে, 'আপনি জাহাজে কিসব বলেছেন, অনেকেরই ধারণা হয়েছে, আপনি কমিউনিস্ট। এমনকি আপনার সম্পর্কে খোঁজখবরও নেয়া হচ্ছে।' এরকম ঘটতে পারতো পাকিস্তানের প্রথম বছরগুলোতে। নাকি অভিযোগ উঠেছিলো 'নকশাল' বা 'সিরাজ সিকদারের দল' বলে? স্বাধীনতার পর একবার কার্জন হলে গিয়েছিলেন কামর। সেখানে এক লোক তাকে বলে, 'সো ইউ আর য়্যান আউটসাইডার। ইউ আর কোরাপটিং আওয়ার ইউথস...'। একেও অবিশ্বাস্য মনে হয়। এতো ইংরেজি আর এ-ধরনের প্রাচীন গ্রিসীয় অভিযোগ গত দু-দশকে কার্জন হল এলাকায় উচ্চারিত হওয়ার কথা নয়। কামরের রাজনীতিক বোধও বেশ সরল, বা তার শ্রেণীর। কামরের বহু বাজে বিশ্বাস আছে, তার মাঝে একটি—'আইয়ুব খান যেসব রাস্তাঘাট ও সরকারী দালানকোঠা বানিয়ে দিয়ে গেছেন, তার জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।' কামর মাঝেমাঝে এমনই সরলচিত্ত, রাস্তাঘাট প্রভৃতি যেনো ওই একনায়ক পিতার পয়সায় বানিয়েছে। কামর অবশ্য শ্রদ্ধাপরায়ণ মানুষ; অতিকায় কিছু দেখলেই শ্রদ্ধায় সে নত হয়। বাল্যকালে অত্যাচারী জন অ্যান্ডারসনকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলো, তারপর জিন্নাহ, গান্ধি, আইউব, মুজিব-সবাই তাঁকে মুগ্ধ করেছে। উপন্যাসটি শেষ হয়েছে উন্মাদ মুক্তিযোদ্ধা লোকমানের কণ্ঠে *সিরাজউদ্দৌলা* নাটকের বিখ্যাত সংলাপ—'অন্যায় আমিও করেছি, আপনারাও করেছেন।...'—আবৃত্তি ও 'গুলবাগ' শব্দটির ব্যবহার সম্পর্কে মন্তব্য ক'রে। লেখক হয়তো এ-সংলাপ উচ্চারণ ক'রে মুজিবকে মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন, কিন্তু তাঁকে খুব বেশি মনে পড়ে না। উপন্যাসটি শেষ হয়েছে বেশ সাধারণভাবে, এমনভাবে যে মনে হয় না মায়ের কাছে যাচ্ছি। রশীদ করীম আত্মজীবনকে শিল্পরূপ দেয়ার সাধনা করেছেন *মায়ের কাছে যাচ্ছি* উপন্যাসে। পরিশ্রম করেছেন তিনি, যা শুধু একজন গুরুত্বপূর্ণ ঔপন্যাসিকের কাছেই আশা করতে পারি। অপন্যাসদূষিত সময়ে তিনি যে উচ্চাভিলাষ দেখিয়েছেন, তার ব্যর্থতাও অভিনন্দন দাবি করে। *মায়ের কাছে যাচ্ছি* বাঙলাদেশের একটি প্রধান উপন্যাস হিশেবে গণ্য হবে না, কিন্তু একটি প্রধান প্রয়াস ব'লে স্বীকৃত হবে। বইটি স্মরণ করিয়ে দেয় জীবন দুরূহ, আর তার শিল্পরূপায়ণ দুরূহতর।

AMARBOI.COM

বাঙলা গদ্যচর্চা ও বিদ্যাসাগর

যখন বলি *বাঙলা ভাষা* বা *বাঙলা গদ্য,* তখন অসচেতন কিন্তু দৃঢ়ভাবে পুষি এমন ধারণা যে একটি ভাষা রয়েছে, যার নাম বাঙলা; এবং তার, অন্যান্য ভাষার মতোই, রয়েছে বক্তব্যপ্রকাশের একটি রীতি : গদ্য। বাঙলা ভাষা বা গদ্যের এক আদর্শ রূপের ধারণা যে খুব স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে বাঙালির মনে, তার মূলে যাঁর প্রতিভা কাজ করেছে সবচেয়ে বেশি, তাঁর নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। যে-ভাষাকে এখন বলি *বাঙলা ভাষা,* কয়েক দশক আগেও যাকে বলা হতো *বঙ্গভাষা*, বা *বাঙ্গলা* বা *বাঙ্গালা ভাষা,* রামমোহনের মতো অনেকে যাকে বলেছেন *গৌড়ীয় ভাষা,* উনিশশতকের শুরু দিকে যে-ভাষার কোনো নাম খুঁজে না পেয়ে অনেকেই যাকে বলতেন শুধু *ভাষা*, তার কি রয়েছে কোনো একক রৌপ পরিচয়? সেটি কি একটি ভাষা, নাকি বহু আঞ্চলিক ভাষার সমষ্টি? যে-ভাষায় সামাজিক যোগাযোগ সম্পন্ন বা ভাবপ্রকাশ করে বিক্রমপুরের, দিনাজপুরের, চট্টগ্রামের, যশোরের, সিলেটের, বীরভূমের, ঢাকার, কলকাতার, অর্থাৎ বাঙলা ভাষাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকার বাঙালি, সেগুলোই কি *বাঙলা ভাষা,* নাকি ওই সব আঞ্চলিক রূপ পেরিয়ে বাঙলা ভাষার রয়েছে একটি বা একাধিক সর্বজনীন ভাষিক রূপ, যাকে মনে করা হয় *বাঙলা ভাষা* ? আঞ্চলিক রূপগুলো অবশ্যই বাঙলা, ওই রূপগুলোর মধ্যে রয়েছে নানা মিল আর অমিল; কিন্তু যখন আমরা বাঙলা ভাষা বা গদ্যের কথা বলি, তখন বোঝাই না ওই আঞ্চলিক রূপগুলোকে, বোঝাই বাঙলা ভাষার দুটি মানরূপকে, যে-দুটি পেরিয়ে গেছে আঞ্চলিকতার সীমা; হয়ে উঠেছে সর্বজনীন, সর্ববঙ্গীয় বা বাঙলা ভাষা। ওই দুটি রূপের প্রথমটির, সাধুরূপটির, সুস্থিতিবিধানকর্তার নাম বিদ্যাসাগর। আজকের শিক্ষিত বাঙালির কাছে হয়তো চলতি রীতিটিই বাঙলা ভাষা; কিন্তু কয়েক দশক আগে শিক্ষিত বাঙালির কাছে বাঙলা ভাষা ছিলো সাধুভাষা, যে-ভাষা ছিলো সর্ববঙ্গীয়, যে-ভাষায় লেখার মাধ্যমে পরস্পরের সাথে জড়িত থেকেছে বাঙালি। বিদ্যাসাগরের প্রতিভা বাঙালিকে দিয়েছে অনেক কিছু, কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে বাঙলা ভাষার এক সর্ববঙ্গীয় সুস্থিত রূপ, যাকে একদা বাঙালি মনে করেছে বাঙলা ভাষা।

মানুষ ভাষিক প্রাণী; মানুষের প্রতিটি গোত্র সামাজিক যোগাযোগ বা ভাববিনিময়ের জন্যে ব্যবহার ক'রে থাকে কোনো-না-কোনো *ভাষা* ; তবে সব ভাষা সমান বিকশিত বা *মান* সম্পন্ন নয়। বহু ভাষা আছে পৃথিবীতে, যেগুলো পালন করে সামাজিক যোগাযোগের প্রাথমিক দায়িত্ব; আর রয়েছে বেশ কিছু ভাষা, যেগুলো পালন করে ব্যাপক ভূমিকা। যে-সব ভাষা পালন করে ভাষার প্রাথমিক দায়িত্ব, সেগুলো হয়তো লেখাই হয় না, ব্যবহৃত হয় কোনো সংকীর্ণ অঞ্চলে। সে-সব ভাষাকে বলতে পারি *উপভাষা* । ব্যাপক দায়িত্ব পালন করে যে-সব ভাষা, যেগুলো পেরিয়ে যায় আঞ্চলিকতার সীমা, সামাজিক যোগাযোগের প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও

যেগুলো ব্যবহৃত হয় সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায়, সেগুলোকেই সাধারণত দেয়া হয় *ভাষা* র মর্যাদা। প্রশ্ন করতে পারি *ভাষা* কাকে বলে? কালকেন্দ্রিকভাবে অর্থাৎ এক বিশেষ সময়ে এক বিশেষ অবস্থা অনুসারে ভাষা হচ্ছে একটি বিশেষ *আদর্শ* বা *রীতি*, বা পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত ভাষিক আদর্শ বা রীতির সমষ্টি। •কালানুক্রমিকভাবে ভাষা হচ্ছে এমন এক সাধারণ ভাষা, যার বিসংহতির ফলে জন্ম নেয় একাধিক উপভাষা, বা ভাষা হচ্ছে একাধিক উপভাষার সংহতির ফলে উদ্ভূত কোনো সাধারণ ভাষা। ভূমিকা অনুসারে ভাষা হচ্ছে এমন এক উপরিপন্ন মানরূপ, যা হয়তো প্রথম ও প্রাত্যহিক ভাষা নয় তার ভাষীদের। বিভিন্ন উপভাষীদের পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমই ভাষা। কোনো ভাষাই সহজাতভাবে দুর্বল নয়, পৃথিবীর সমস্ত মহৎ ভাষাই এক সময় অনুন্নত বা অবিকশিত ভাষা ছিলো। কোনো ভাষা যখন জাতি ও রাষ্ট্রের সাথে জড়িত হয়, তখনই সূচনা হয় তার উন্নতি বা বিকাশের। প্রত্যেক আত্মমর্যাদাশীল জাতিরই থাকতে হয় একটি নিজস্ব ভাষা, যে-ভাষা পরিপূর্ণরূপে বিকশিত। জাতীয়তাবাদের চরিত্র হচ্ছে জাতির জন্যে একটি বিশেষ ভাষা নির্ধারণ করা, দেশে প্রচলিত উপভাষাগুলোর মধ্য থেকে একটিকে বেছে নিয়ে সকলের কাছে সেটিকেই ভাষারূপে উপস্থিত করা। ওই ভাষাটি হয় একটি *মানভাষা*, যেটি পালন করে রাষ্ট্রের বা জাতির সমস্ত ভাষিক দায়িত্ব। উনিশশতকে বাঙালির জাতীয় চেতনা উদ্যোগ নিয়েছিলো এমন একটি ভাষা স্থির করার, অজস্র মানুষের সাধনায় গ'ড়ে উঠছিলো তার কাঠামো; ওই কাঠামোকে সুস্থিত করেছিলেন বিদ্যাসাগর। পাণিনি ব্যাকরণ লিখে সুস্থিত করেছিলেন সংস্কৃত ভাষা, আর বিদ্যাসাগর বাঙলা ভাষার একটি সর্ববঙ্গীয় মানরূপ সুস্থিত করেছিলেন গদ্য লিখে।

মানভাষা এমন এক বিধিবদ্ধ ভাষিক রূপ, যা গৃহীত কোনো বড়ো ভাষাসমাজে, এবং ব্যবহৃত হয় ভাষার আদর্শ কাঠামোরূপে। ওই ভাষা বিধিবদ্ধ, অর্থাৎ নির্দিষ্ট তার সমস্ত নিয়মশৃঙ্খলা, কোনো বড়ো ভাষাসমাজ সেটিকে মানে নিজের ভাষা ব'লে, এবং ওই রূপটিকেই গণ্য করে ভাষিক শুদ্ধতার নিয়ামকরূপে। মানভাষার থাকতে হয় দুটি বড়ো গুণ : *নমনীয় সুস্থিতি*, ও *মননীকরণশক্তি*। নমনীয় সুস্থিতি বোঝায় ভাষাটি ঠিকমতো বিধিবদ্ধ হয়ে সুস্থিত হবে, তার যাচ্ছেতাই প্রয়োগ চলবে না; তবে ওই বিধিগুলো বেশি কঠোর হবে না, হবে নমনীয়, যাতে সময়বদলের সাথে সম্ভব হয় তার উৎকর্ষসাধন। মননীকরণশক্তি ভাষাকে প্রাত্যহিক যোগাযোগের ভাষা থেকে উন্নীত করে জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার ভাষায়। মানভাষা একগুচ্ছ উপভাষা অঞ্চলকে সংহত করে একটি মানভাষাঞ্চলে, এবং প্রতিবেশী ভাষাসমাজের সাথে নির্দেশ করে নিজ অঞ্চলের স্বাতন্ত্র্য। মানভাষা তার ভাষীদের এনে দেয় মর্যাদা, তাদের প্রতিষ্ঠিত করে শক্তিমানমণ্ডলিতে, এবং নির্দেশ করে শুদ্ধতার মানরূপ। ভাষাসমাজ অনুগত থাকে তার মানভাষার প্রতি, গৌরব বোধ করে ওই ভাষা নিয়ে, এবং থাকে মানভাষাসচেতন। কোনো ভাষাকে মানভাষা হয়ে ওঠার জন্যে জয় করতে হয় দুটি সমস্যাকে : একটি *বিধিবদ্ধকরণসমস্যা*, আরেকটি *বিশদীকরণসমস্যা*। বিধিবদ্ধকরণ হচ্ছে 'ন্যূনতম রৌপ বৈচিত্র্য বা ভিন্নতা', আর বিশদীকরণ হচ্ছে 'সর্বাধিক ভূমিকাগত বৈচিত্র্য বা ভিন্নতা'।

AMARBOI.COM

ন্যূনতম রৌপ বৈচিত্র্য হচ্ছে এমন এক বিশুদ্ধ ভাষারীতি, যার প্রতিটি শব্দের রয়েছে মাত্র একটি বানান ও উচ্চারণ, প্রত্যেক অর্থের জন্যে রয়েছে মাত্র একটি শব্দ, এবং সমস্ত উক্তির জন্যে রয়েছে মাত্র একটি ব্যাকরণিক কাঠামো। সুষ্ঠু যোগাযোগের জন্যে এমন ভাষাই আদর্শ বিধি, তবে এমন সুস্থিতি অর্জন করতে পারে শুধু সংস্কৃত বা লাতিনের মতো মৃত ভাষা, যাতে বিধিবিধানের ফলে থামিয়ে দেয়া হয়েছে ভাষিক বিবর্তন। অতি বিধিবদ্ধকরণের ফলে কোনো একটি ভাষারীতি চিরকাল বা খণ্ডকালের জন্যে স্থির অবিচল হয়ে ওঠে। এ-প্রক্রিয়ার বিপরীত হচ্ছে সর্বাধিক ভূমিকাগত বৈচিত্র্য : একটি পূর্ণবিকশিত ভাষার কাছে আশা করা হয় যে ভাষাটি মেটাবে তার ভাষাসমাজের সমস্ত ভাষিক প্রয়োজন। ওই ভাষা পালন করবে নানা দায়িত্ব, বহু জটিল ভূমিকা : সেটি যেমন পালন করবে ব্যক্তিগত ও সামাজিক যোগাযোগের দায়িত্ব, তেমনি সেটি দিয়ে চর্চা করা যাবে সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞান, চালানো যাবে রাষ্ট্র; সেটিকে ক'রে তোলা যাবে দীর্ঘনিশ্বাসের মতো কোমল আর বজ্রের মতো নির্মম। এমন কোনো বাঙলা ভাষা ছিলো না উনিশশতকের আগে; এমন একটি ভাষা সৃষ্টির প্রয়াস চলে উনিশশতকের প্রথম ছ-দশক ধ'রে। ওই প্রয়াসের পরিণতিদাতা বিদ্যাসাগর। তাঁর গদ্যে বাঙালি পায় একটি বিধিবদ্ধ ভাষাকাঠামো।

বাঙলা গদ্যচর্চা ও বিদ্যাসাগর সম্পর্কে আলোচনার শুরুতে ওপরের আলোচনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, কেননা বিদ্যাসাগরপরবর্তীদের গদ্য হচ্ছে ব্যক্তিগত রীতি বা স্টাইল সৃষ্টি, আর বিদ্যাসাগরের গদ্য হচ্ছে জাতির জন্যে একটি ভাষাকাঠামো সৃষ্টি। বিদ্যাসাগর একটি মান বা নর্ম, আর তাঁর পরবর্তীরা ওই মান অর্জন বা ওই মান থেকে স'রে যাওয়ার সাফল্য বা ব্যর্থতা। বাঙলা ভাষা বলতে কয়েক দশক আগেও যে-আদর্শ কাঠামোটিকে বোঝাতো, তা চূড়ান্তরূপে বিধিবদ্ধ হয়েছিলো বিদ্যাসাগরের গদ্যে। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বিশ্লিষ্টীকরণের ফলে উদ্ভূত অপভ্রংশ থেকে একটি বাঙলা ভাষা জন্ম নেয় নি, নিয়েছিলো অনেক উপভাষা। ওই উপভাষাগুলোই, আদি-মধ্য ও উনিশশতকের কয়েক দশক জুড়ে, ছিলো বাঙলা ভাষা; তখন ছিলো না বাঙলা ভাষার কোনো মানরূপ। মধ্যযুগেই শুরু হয়েছিলো মানরূপের বিকাশ, তবে তা ঘটছিলো অসচেতন প্রক্রিয়ায়, এবং অত্যন্ত ধীরে বিকশিত হচ্ছিলো একটি সর্ববঙ্গীয় ভাষারীতি, যা উনিশশতকে রূপ নেয় সাধুভাষার। উনিশশতকের আগে বাঙলা ভাষার ছিলো নানা আঞ্চলিক বৈচিত্র্য, তা ছিলো অনুন্নত অবিকশিত ভাষা; তার রূপ বিধিবদ্ধ হয় নি, ভূমিকাও বিশদ হয় নি। তখন তার ছিলো ব্যাপক রৌপ বৈচিত্র্য, কিন্তু ভূমিকাগত বৈচিত্র্য ছিলো সীমাবদ্ধ। উনিশশতকেই সচেতনভাবে বিকাশ ঘটানো হয় একটি বিধিবদ্ধ মান বাঙলা ভাষার। উনিশশতকীরা অবশ্য খুঁজেছিলেন একটি লেখ্য বাঙলা মানভাষারূপ, যাতে সৃষ্টি করা যাবে সাহিত্য, চর্চা করা যাবে জ্ঞানবিজ্ঞান, প্রচার করা যাবে সংবাদ, পালন করা যাবে লেখ্য সমস্ত দায়িত্ব। এরই ফলে উদ্ভূত হয় সাধুরীতিটি, যা শুধুই লেখ্য। উনিশশতকের বাঙলা মানভাষাসন্ধানীরা একটি সর্বগ্রাসী জীবন্ত মানভাষা সৃষ্টির বদলে উদ্ভাবন করেন সীমাবদ্ধ দায়িত্বপালনের উপযোগী একটি ভাষারীতি। এতে অবশ্য তাঁদের কৃতিত্ব অসামান্য : তাঁরা ভাষাটির ভূমিকা বিশদ

করতে না পারলেও বিধিবদ্ধ করতে পেরেছিলেন ভাষাটির মানরূপ। এ-মানরূপ বিধিবদ্ধকরণে যাঁর ভূমিকা প্রধান, তিনি বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর শুধু ব্যক্তিগত রীতি নন, তিনি বাঙলা ভাষার কাঠামো।

অনেক ভাষাঞ্চলে দেখা যায় এমন পরিস্থিতি : কোনো ভাষার একটি রূপ ব্যবহৃত হয় লেখায় ও সাহিত্যে, আরেকটি রূপ কথোপকথনে বা সামাজিক যোগাযোগে। এটা দ্বিরীতিক পরিস্থিতি, যাতে একটি রীতিকে মনে করা হয় উচ্চ অন্যটিকে নিম্ন। উচ্চরীতিটি পায় ভাষার মর্যাদা। উনিশশতকের প্রথমার্ধে মানভাষাসন্ধানীরা সৃষ্টি করেছিলেন একটি উচ্চরীতি, যার নাম সাধুভাষা বা রীতি। বাঙলা মানভাষা বিধিবদ্ধকরণপ্রক্রিয়ার একটি মহিমাময় পরিণতি সাধুরীতি। মধ্যযুগে কোনো মান বাঙলা ভাষা ছিলো না, ছিলো নানা আঞ্চলিক ভাষিক বৈচিত্র্য; তবে মধ্যযুগের সাহিত্যও এগিয়ে চলছিলো একটি ভাষিক আদর্শের দিকে, যাকে উনিশশতকের গদ্যলেখকেরা দেন সুসংবদ্ধ সুস্থিত মানরূপ। সাধুভাষায় বিধিবদ্ধকরণপ্রক্রিয়াটি সফলভাবে কাজ করে, তাই রীতিটি অর্জন করে সুস্থিতি; কিন্তু তাঁরা এর ভূমিকা বিশদ করতে পারেন নি, তাই এটি হয়ে ওঠে অর্ধেক দায়িত্ব পালনের উপযোগী, অর্থাৎ শুধুই লেখ্য। তবু সাধুরীতি উদ্ভাবন ও বিধিবদ্ধকরণ ঘটনা হিশেবে অসামান্য, কেননা বাঙালি এ-রীতিতেই প্রথম পায় তার ভাষার একটি সর্ববঙ্গীয় আদর্শরূপ; এবং এটিকেই মনে করে নিজের ভাষা। তাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন বাঙালির জন্যে একটি ভাষা, বিধিবদ্ধ করেছিলেন তার রূপ, এবং ওই রূপটি ব্যবহার করেছিলেন একটি আধুনিকতামনস্ক জাতির বাস্তব ও স্বপ্নকে ধরার জন্যে। উনিশশতকে বাঙলা ভাষা নিয়েছিলো সাধুরীতির রূপ, যার ব্যাপকতার সাথে পূর্ববর্তী বাঙলা ভাষাগুচ্ছের কোনো তুলনা হয় না। বিদ্যাসাগরের গদ্যে ওই রীতিটি পায় চূড়ান্ত রূপ; বিদ্যাসাগর বাঙালিকে উপহার দেন একটি ভাষা।

সাধুরীতি মনে পড়িয়ে দেয় বিদ্যাসাগরকে, আর বিদ্যাসাগর মনে পরিয়ে দেন সাধুরীতি, ও গদ্যকে। বিদ্যাসাগর, সাধুভাষা বা রীতি, গদ্য অবিচ্ছেদ্য; বিদ্যাসাগর অর্থই গদ্য বা সাধুভাষা। মধ্যযুগ থেকে উনিশশতক পর্যন্ত বাঙলা গদ্যের, সাধুভাষার, যে-বিকাশ ঘটে, তাতে চোখে পড়ে দুটি ব্যাপার : ওই গদ্য পড়ার সময় অবিরাম বোধ করতে হয় যে মধ্যযুগের বাঙালি চিন্তা করতে শেখে নি; তাই সৃষ্টিও করতে পারে নি চিন্তাপ্রকাশের উপযুক্ত ভাষার রূপ। ভাষা ও চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করে পরস্পরকে; বিকশিত ভাষা ঘটাতে পারে চিন্তার বিকাশ, এবং গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা ভাষাকে দিতে পারে গুরুত্বপূর্ণ রূপ। বাঙালি চিন্তা করতে শেখে উনিশশতকে, তাই উনিশশতকেই বিকাশ ঘটে গদ্যের। ষোড়শ থেকে উনিশশতকের ছ-দশক ধ'রে চলেছিলো বাঙলা গদ্যের আদর্শকাঠামোর খোঁজ : স্থির করতে হয়েছিলো বাঙলার শব্দসম্ভার, বিধিবদ্ধ করতে হয়েছিলো শব্দের রূপ ও বানান, সুস্থিত করতে হয়েছিলো বাক্যকাঠামো, এবং শব্দসম্ভারকে পূর্ণ করতে হয়েছিলো অভিনব বিভিন্ন অর্থে। সেটা ছিলো না গদ্যশিল্পসৌন্দর্য সৃষ্টির সময়, ছিলো গদ্যসৃষ্টির সময়, যার জন্যে দরকার ছিলো মূল্যবান সুশৃঙ্খল চিন্তা। যদি ষোলো বা সতেরো শতকে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা জাগতো বাঙালির মনে বা মস্তিষ্কে, গদ্যের বিকাশ

ঘটতো সে-সময়েই, তখনই পাওয়া যেতো বাঙলা ভাষার আদর্শ কাঠামো। বাঙলা গদ্য প্রথম চিন্তা করতে শুরু করে বিদেশিদের রচনায়, আইনের অনুবাদে; বাঙালির লেখা উনিশশতকপূর্ব গদ্যের যে-উদাহরণ পাই, তা বেদনাদায়ক এজন্যে নয় যে ওই গদ্য অবিকশিত; তা শোকাবহ এ-কারণে যে বাঙালি চিন্তা করতে শেখে নি। বিদ্যাসাগরের *বেতালপঞ্চবিংশতি* র (১৮৪৭) পূর্ব পর্যন্ত যে-গদ্য পাই, তার রূপ বিধিবদ্ধ হয় নি, শব্দসম্ভার অনির্ণীত ও শব্দের রূপ অবিধিবদ্ধ, বাক্য বিশৃঙ্খল; তবে এসবই বাইরের ব্যাপার, যা ভেতরের তা হচ্ছে বাঙালির মস্তিষ্কে জন্মে নি সুশৃঙ্খল ও মূল্যবান চিন্তা। ছিন্নবিচ্ছিন্ন আবেগ কবিতা জাগাতে পারে, কিন্তু গদ্যের জন্যে দরকার সুশৃঙ্খল চিন্তা।

সুশৃঙ্খল চিন্তা কতো দুরূহ, তা ভাষায় প্রকাশ কেমন দুরূহতর, তা বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তী সাধারণদের চেষ্টা থেকে নয়, এক অসাধারণের প্রয়াস থেকেই অনুমান করতে পারি। তিনি রামমোহন, যিনি বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ লিখেছিলেন, বাঙলা ভাষার প্রকৃতিও বুঝেছিলেন, কিন্তু বাঙলা ভাষাটিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেন নি। রামমোহন *বেদান্ত গ্রন্থ*-এর (১৮১৫) 'অনুষ্ঠান'-এ চিন্তা ও বাক্যের দ্বন্দ্ব মেটানোর জন্যে দিয়েছিলেন এমন পরামর্শ :

> প্রথমত বাঙগলা ভাষাতে আবশ্যক গৃহব্যাপার নির্ব্বাহের যোগ্য কেবল কথকগুলিন শব্দ আছে এ ভাষা সংস্কৃতের জেরূপ অধীন হয় তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে দ্বিতীয়ত এ ভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোনো শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে না ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাসপ্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থ বোধ করিতে হঠাৎ পারেণ না ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থবোধের সময় অনুভব হয় অতএব বেদান্তশাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ২ ইহাতে মনোযোগের নূন্যতা করিতে পারেণ এ নিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি। জাঁহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবেক আর জাঁহারা ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস দ্বারা সাধু ভাষা কহেন আর সুনেন তাঁহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক। বাক্যের প্রারম্ভে আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করতে উচিত হয়। জে২ স্থানে যখন জাহা জেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা সেই রূপ ইত্যাদিকে পূর্ব্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন।

বিদ্যাসাগরপূর্ব বাঙলা গদ্যের প্রায় সব বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে উদ্ধৃতিটিতে : অনেক শব্দের রূপ ও বানান স্থির হয় নি, বাক্যের কাঠামো পায় নি নিশ্চিত অবয়ব, শব্দের ক্রম অস্থির; তবে এতে চিন্তার চেষ্টা স্পষ্ট। কিন্তু চিন্তা যে পদেপদে বিপন্ন এখানে, তা ধরা পড়ে, যা আরো বড়ো হয়ে ধরা পড়ে এরও আগের গদ্যে। শীর্ণ চিন্তা যেমন পাওয়া যায় সতেরোশতকের কড়চায় : *তুমি কি। আমি জীব। তুমি কোন জীব। আমি তটস্থ জীব। থাকেন কোথা। ভাণ্ডে।*, তেমনি পাওয়া যায় রামরাম বসুর *রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র*-এ (১৮০১) : *সংপ্রতি সর্ব্বারম্ভে এ দেশে প্রতাপাদিত্য নামে এক রাজা হইয়াছিলেন তাহার বিবরণ কিঞ্চিত পারস্য ভাষায় গ্রন্থিত আছে সাঙ্গ পাঙ্গ রূপে সামুদাইক নাহি*, পাওয়া যায় বিদ্যাসাগরপূর্ব সমগ্র গদ্যে। বিদ্যাসাগরপূর্ব গদ্যের সাথে

এক দিকে চমৎকার মিল রয়েছে চর্যাপদের ভাষার; হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদের ভাষাকে যেমন বলেছিলেন সন্ধ্যাভাষা, বিদ্যাসাগরপূর্ব বাঙলা গদ্যকেও তেমনি বলতে পারি সন্ধ্যাভাষা বা সন্ধ্যাগদ্য, যার আলোআঁধারি জন্মেছে চিন্তার আলোআঁধারি থেকে। বিদ্যাসাগরে কেটে যায় আঁধারটুকু, জ্ব'লে ওঠে আলো। বিদ্যাসাগর পূর্ববর্তীদের থেকে পাওয়া ভাষার সমস্ত বিশৃঙ্খলাকে বিন্যস্ত করেন একটি সুশৃঙ্খল ভাষাকাঠামোতে, যার শব্দসম্ভার সুপরিকল্পিত, শব্দের রূপ বিধিবদ্ধ, বানান সুস্থির, এবং বাক্যকাঠামো সুস্থিত অবয়বসম্পন্ন। বিদ্যাসাগরই প্রথম বাঙালি, যিনি আয়ত্ত করেছিলেন সুশৃঙ্খল চিন্তা ও সুশৃঙ্খল বাক্য। মালার্মে বলেছেন কবির কাজ, গোত্রের ভাষাকে পরিস্রুত করা; বিদ্যাসাগর কবি ছিলেন না, কিন্তু তিনি পরিস্রুত করেছিলেন তাঁর জাতির ভাষা। তিনি জাতিকে উপহার দিয়েছিলেন একটি ভাষাকাঠামো, যার স্থান ব্যক্তিগত গদ্যরীতি বা স্টাইলের অনেক ওপরে।

যে-কোনো ভাষা চারটি স্তরের : ধ্বনি, রূপ বা শব্দ, বাক্য ও অর্থের সৃষ্টিশীল সংশ্রয়। মানভাষাকে বিধিবদ্ধ হ'তে হয় চারটি স্তরেই, এবং লিখিত মানভাষার জন্যে দরকার সুস্থির বানানরীতি। বিদ্যাসাগর এ-চারটি স্তর ও বানানরীতিতে, প্রতি ক্ষেত্রেই, পরিচয় দেন তাঁর পূর্ববর্তী ও সমকালীনদের থেকে অনেক বেশি সুপরিকল্পনার ও সুস্থিরতার : তাঁর কোনো বানান বিশৃঙ্খল নয়, কোনো শব্দ অব্যবস্থিত নয়, যা অন্যদের লেখায় তখন ছিলো স্বাভাবিক; তাঁর কোনো শব্দে নেই 'গ্রাম্য বর্বরতার' ছাপ-হঠাৎ একটি অপভ্রষ্ট শব্দ ব্যবহার ক'রে তিনি বোধকে আকাশ থেকে আবর্জনায় নামিয়ে আনেন নি, তাঁর কোনো সমাসবদ্ধ পদ উৎকট নয়, এবং তাঁর বাক্য সুশৃঙ্খল চিন্তার সুস্থির প্রকাশ। বিদ্যাসাগরের গদ্যে প্রথমেই চোখে পড়ে বাঙলা ভাষার শব্দ অবয়বের সুষ্ঠু পরিকল্পনা। বহু উপভাষার মধ্য থেকে একটিকে মান বাঙলা ভাষায় রূপ দিতে গিয়ে বাড়াতে হয়েছিলো শব্দসম্ভার, অনিবার্য হাত পাততে হয়েছিলো সংস্কৃতের কাছে। জাতির জীবনের সমস্ত লিখিত দায়িত্ব পালন সম্ভব ছিলো না তদ্ভব ও আঞ্চলিক, এবং কিছু বিদেশি শব্দে; তাই তৎসম শব্দের উদারতায় গ'ড়ে তুলতে হয়েছিলো অভিনব বাঙলা ভাষার শব্দ অবয়ব। উনিশশতকের দ্বিতীয়াংশ থেকে, অনেকের মনে, এমন ধারণা জন্ম নিতে থাকে যে ফোর্ট উইলিয়মের ভেতর ও বাইরের পণ্ডিতদের ষড়যন্ত্রে বাঙলা ভাষা হয়ে ওঠে সংস্কৃতের উপনিবেশ; নইলে দেশি-তদ্ভব ও ইসলামি শব্দে বাঙলা হয়ে উঠতো একটি চমৎকার ভাষা। খুব ভুল ধারণা এটি; সংস্কৃতের সাহায্য ছাড়া বহু-আঞ্চলিক বাঙলা ভাষা আজকের বাঙলা ভাষা হয়ে উঠতে পারতো না। বিদেশি শব্দ সম্পর্কে বাঙলা ভাষাঞ্চলে অনেক দিন ধ'রেই চলছে একটি ভুল ধারণা : একদল বাঙলা ভাষায় বিদেশি শব্দের প্রাচুর্যকে সমৃদ্ধি ব'লে মনে করেন, তবে তা সমৃদ্ধি নয় দারিদ্র্য। বাঙলা ভাষায় বিদেশি শব্দ ঢুকেছে ভাষাসাম্রাজ্যবাদী প্রক্রিয়ায়, তার অধিকাংশই চাপিয়ে দেয়া হয়েছে বাঙলা ভাষার ওপর। বাঙলা ভাষা বিদেশি শব্দ নিজের প্রয়োজনে স্বেচ্ছায় নেয় নি, রাজনীতিক কারণে ওগুলো ঢুকেছে বাঙলা ভাষায়। সংস্কৃতের কাছে ঋণ করা ছাড়া বাঙলা ভাষার একটি শক্তিশালী কাঠামো বিধিবদ্ধ করা অসম্ভব, এটা বুঝেছিলেন বিদ্যাসাগর। তাঁর

পরিমিতিবোধও ছিলো অসামান্য।

বাঙলা ভাষার শব্দ অবয়ব পরিকল্পনায় বিদ্যাসাগর পরিচয় দিয়েছিলেন অন্যদের থেকে গভীর অন্তর্দৃষ্টির : তিনি তৎসম, তদ্ভব ও বিদেশি শব্দের অনুপাত স্থির করেছিলেন ঠিকভাবে, এবং করেছিলেন তার সুষ্ঠু প্রয়োগ। তাঁর গদ্যে প্রত্ন বা অপরিচিত শব্দ বেশি মেলে না; *নির্বৃত, আস্যে, দুর্বিগাহ, একৈকের, প্রত্যানিত, ক্রব্যাদ, প্রত্যাহর্তা, রশ্মি (বল্গা), সংহিত, দীর্ঘায়ুরস্তু, দুষ্পরিহর* –এর মতো শব্দ কিছু মেলে, কিন্তু মনে হয় না উৎকট, কেননা তা বিষয়ের সাথে খাপ খেয়েছে চমৎকারভাবে। তাঁর সমাসও পীড়াদায়ক নয়, সাধারণত চারটির বেশি শব্দের সমাস করেন নি তিনি, যখন করেছেন তখন নিয়েছেন পরিচিত মনোরম শব্দ। তাঁর সমাসবদ্ধ শব্দ সাধারণত *লোকান্তরপ্রাপ্তি, লক্ষযোজনবিস্তীর্ণ, বোধসুধাকর, নবমালিকাকুসুমকোমলা, গিরিতরঙ্গিণীতীরবর্তী* ধরনের। বাক্যিক প্রয়োজনে তিনি বারবার ব্যবহার করেছেন 'পূর্বক' যুক্ত শব্দ : *প্রাণসংহারপূর্বক, আহ্লাদপ্রদর্শনপূর্বক, অবগাহনপূর্বক, প্রবেশপূর্বক, পরিত্যাগপূর্বক, বিরাগপ্রদর্শনপূর্বক, অপত্যস্নেহবিস্মরণপূর্বক, রাজ্যাধিকারপরিহারপূর্বক, অতিদীর্ঘনিশ্বাসভারপরিত্যাগপূর্বক* প্রভৃতি এবং *সমভিব্যাহারে, কার্যান্তরব্যপদেশে, যৎপরোনাস্তি* প্রভৃতিও মেলে মাঝেমাঝে। তিনি *মাদৃশ, এতাদৃশী, ঈদৃশ, এতাদৃশ* ধরনের সর্বনাম ও নির্দেশক ব্যবহার করেছেন, এবং তিনিই প্রথম ব্যবহার করেছেন দ্বিতীয় পুরুষের সম্মানসূচক সর্বনাম *আপনি* । তাঁর আগে আত্মবাচক*আপন* পাওয়া যায়, কিন্তু দ্বিতীয় পুরুষ সম্মানসূচক*আপনি* প্রথম মেলে বিদ্যাসাগরেই। তিনি *জিজ্ঞাসিলেন, সম্বোধিয়া*র মতো নামধাতু ব্যবহার করেছেন, বাঙলা ভাষার ক্রিয়ার অভাব কাটানোর জন্যে প্রচুর ব্যবহার করেছেন*গমন করিলেন*–ধরনের যুক্ত ক্রিয়া, কিন্তু *জন্ম গ্রহণ করে* বা*করিল* না লিখে*জন্মে* ও লিখেছেন প্রচুর। তিনি*সখে, শকুন্তলে, অনুসূয়ে, প্রিয়বন্ধো, কুলগুরো, হা পরমোপকারিন্ সখে, বিধে* ধরনের সম্বোধন ব্যবহার করেছেন প্রচুর। অনুপ্রাসের সুমিত ব্যবহার পাই তাঁর রচনায় : *শীতল সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ মন্দ সঞ্চার, মধুকর মাধবীলতার অভিনব মুকুলে মধুপান করিতেছিল, গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমাণ জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত, এই সেই সিদ্ধ শবরী শ্রমণা* র সঙ্গীত যেমন পাই, তেমন পাই *বুঝিলাম, আজ উদ্যানলতা, সৌন্দর্যগুণে, বনলতার নিকট পরাজিত হইল*র মতো কবিত্ব।

বিদ্যাসাগর সাধুভাষার কাঠামো বিধিবদ্ধ ও সুস্থিত করেছিলেন একটি, তবে বিষয় ও লক্ষ্য অনুসারে সৃষ্টি করেছিলেন তিনটি ব্যক্তিগত গদ্যরীতি বা স্টাইল। সাধুভাষার যে–কাঠামোটি চূড়ান্তরূপে সুস্থিতি পায় তাঁর প্রধান রচনাগুলোতে, অন্যদের বই থেকে জন্ম নেয়া তাঁর মৌলিক বইগুলোতে, সেটিই তাঁর প্রধান বা বিদ্যাসাগরী রীতি : ওই রীতিটি তিনি ব্যবহার করেন তাঁর কথাশ্রেণীর বইগুলোতে। *বেতালপঞ্চবিংশতি* (১৮৪৭), *শকুন্তলা* (১৮৫৪), *সীতার বনবাস* (১৮৬০), *ভ্রান্তিবিলাস*–এ (১৮৬৯) মুদ্রিত তাঁর এ–মহিমামণ্ডিত রীতিটি। এ–রীতিটিই কিছুটা কঠোর কর্কশ হয়ে ওঠে *বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব* [প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তক

(১৮৫৫)], *বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার* [প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তক (১৮৭১, ১৮৭৩)], এবং কোমল হয়ে ওঠে ব্যক্তিগত শোকাকুল *প্রভাবতীসম্ভাষণ*-এ। তাঁর প্রধান রীতির একটি সরলিত রূপ ব্যবহার করেন তিনি পাঠ্যপুস্তকগুলোতে : *কথামালা* (১৮৫৬), *বোধোদয়* (১৮৫১), *বর্ণপরিচয়* -এ (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, ১৮৫৫)। তিনি তাঁর প্রধান রীতিটিতে কিছুটা সাধুচলতি মিশিয়ে, আরবিফারসি শব্দ ছড়িয়ে তৈরি করেন একটি লঘু পরিহাসপরায়ণ গদ্যরীতি, যার পরিচয় পাই *অতি অল্প হইল* (১৮৭৩), *আবার অতি অল্প হইল* (১৮৭৩), *ব্রজবিলাস* (১৮৮৪), *রত্নপরীক্ষা* (১৮৮৬) প্রভৃতিতে। তবে তাঁর তিনটি রীতি একই সাধুরীতির তিন রকম উৎসারণ।

বিদ্যাসাগরের গদ্য বাক্যকেন্দ্রিক, তাঁর গদ্যে লক্ষণীয় হচ্ছে বাক্যসৃষ্টির কৌশল। বিদ্যাসাগরের স্বভাবে চিন্তা বা ভাব পরস্পরসম্পর্কিত, পরম্পরাগ্রথিত। তিনি সুশৃঙ্খল পরম্পরায় প্রকাশ করেছেন চিন্তা বা ভাব, তাই সরল সংক্ষিপ্ত বাক্য সৃষ্টি করেছেন কম; তিনি রচনা করেছেন সাধারণত মিশ্রবাক্যসংগঠন। মিশ্রবাক্যসংগঠনের ভেতরে তিনি গেঁথে দিয়েছেন উপবাক্যের পর উপবাক্য; একাধিক মিশ্রবাক্যসংগঠনকে পরিণত করেছেন যৌগিক সংগঠনে, এবং যখনি কোনো পদ বা উপবাক্যের ভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে তাঁর, তিনি সেটি বসিয়েছেন কমার ভেতরে। এমনকি নিয়ে এসেছেন বাক্যের শুরুতে, এবং সেটিকে কমা দিয়ে বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখেছেন বাক্যের পরবর্তী অংশ থেকে। তাঁর বাক্যে বিভিন্ন যতিচিহ্নের, কমা ও সেমিকোলনের, যে-প্রাচুর্য দেখা যায়, তা বিশেষবিশেষ ভাবকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়ার জন্যেই। কয়েকটি সরল বাক্য নিচ্ছি :

[ক] একদা, এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল।

[খ] এক কুকুর, মাংসের এক খণ্ড মুখে করিয়া, নদী পার হইতেছিল।

[গ] এক ব্যাঘ্র, পর্বতের ঝরনায় জলপান করিতে করিতে, দেখিতে পাইল, কিছু দূরে, নীচের দিকে, এক মেষশাবক জলপান করিতেছে।

প্রথম বাক্যে একটি, দ্বিতীয়টিতে দুটি, এবং তৃতীয়টি পাঁচটি কমা ব্যবহার করেছেন বিদ্যাসাগর, যেখানে আজ কোনো কমাই ব্যবহার করা হবে না। তিনি ব্যবহার করেছেন, কেননা প্রতিটি পৃথক ও গুরুত্বপূর্ণ ভাবকে তিনি পৃথক মূল্য দিয়েছেন। তাঁর কথাশ্রেণীর রচনাগুলোতে ভাব এসেছে একের পর এক, যেগুলোকে তিনি পৃথক সরল বাক্যে প্রকাশ না ক'রে দিয়েছেন মিশ্রবাক্যসংগঠনের রূপ। সরল বাক্য ভাষাকে সরল করে না, আবার মিশ্র বা যৌগিক বাক্যও ভাষাকে জটিল করে না; জটিলতা সৃষ্টি হয় যদি বাক্য থেকে লুপ্ত হয়ে যায় বাক্যের জন্যে আবশ্যিক উপাদান। বিদ্যাসাগর সংযোগ ও মিশ্রণ ঘটিয়েছেন বাক্যের, কিন্তু আবশ্যিক উপাদান লোপ করেন নি; তাই তাঁর বাক্য দুর্বোধ্য নয়। বিদ্যাসাগর কথাশ্রেণীর রচনাগুলোতে বিবৃত করেছেন ঘটনা ও অনুভবক্রম, ওই ক্রমের প্রয়োজনে তিনি ব্যবহার করেছেন এমন এক ধরনের বাক্যসংগঠন, যাকে বলতে পারি ক্রমিক বাক্যসংগঠন। এ-ধরনের সংগঠন তৈরি হয় 'ইয়া' - বা 'পূর্বক' -অন্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার বারবার ব্যবহারে। দুটি উদাহরণ :

[ক] রাজা, অমরফল বারাঙ্গনার হস্তগত *দেখিয়া,* বিস্ময়াপন্ন হইলেন; এবং, ফল *লইয়া,* পুরস্কারপ্রদানপূর্বক, তাহাকে বিদায় *দিয়া,* ভাবিতে লাগিলেন, এই ফল রাজ্ঞীকে দিয়াছি; ইহা কিরূপে বারাঙ্গনার হস্তগত হইল। পরে, সবিশেষ অনুসন্ধানদ্বারা, তিনি পূর্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন, এবং, সাংসারিক বিষয়ে নিরতিশয় বীতরাগহইয়া, বিবেচনা করিতে লাগিলেন, সংসার অতি অকিঞ্চিৎকর, ইহাতে সুখের লেশমাত্র নাই; অতএব, বৃথা মায়ায় মুগ্ধহইয়া, আর ইহাতে লিপ্ত থাকা, কোনও ক্রমে, শ্রেয়স্কর নহে *[বেতালপঞ্চবিংশতি]* ।

[খ] সীতার ক্রন্দনশব্দ শ্রবণগোচর*করিয়া,* সন্নিহিত ঋষিকুমারেরা শব্দ অনুসারে ক্রন্দনস্থানে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, এক অসূর্যম্পশ্যারূপা কামিনী, হাহাকার ও শিরে করাঘাত*করিয়া,* অশেষবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন। *দেখিয়া,* তাঁহাদের কোমল হৃদয়ে যার পর নাই কারুণ্যরস আবির্ভূত হইল। তাঁহারা, ত্বরিত গমনে বাল্মীকিসমীপে উপস্থিত*হইয়া,* বিনয়নম্র বচনে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! আমরা, ফল কুসুম কুশ সমিধ আহরণের নিমিত্ত, ভাগীরথীসন্নিহিত অটবীবিভাগে পর্যটন করিতেছিলাম; অকস্মাৎ স্ত্রীলোকের আর্তনাদ শুনিতে পাইলাম, এবং ইতস্ততঃ অনুসন্ধান*করিয়া,* কিয়ৎ ক্ষণ পরে দেখিতে পাইলাম, এক অলৌকিক রূপলাবণ্যে পরিফূর্ণা কামিনী, নিতান্ত অনাথার ন্যায়, একান্ত কাতরা*হইয়া,* উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন কমলা দেবী ভূমণ্ডলে অবতীর্ণা হইয়াছেন *[সীতার বনবাস]* ।

প্রথম উদাহরণে বিদ্যাসাগর কয়েকটি বাক্যকে নানাভাবে রূপান্তরিত ক'রে পরিণত করেছেন দুটি মিশ্রবাক্যে। প্রথম বাক্যটির শুরুতেই তিনি একটি সরল বাক্যের [রাজা বিস্ময়াপন্ন হইলেন] ভেতরে কর্মরূপে গ্রথিত করেছেন একটি উপবাক্য [অমরফল বারাঙ্গনার হস্তগত দেখিয়া (= দেখিলেন)], যার ক্রিয়াটি পেয়েছে অসমাপিকারূপ; তারপর ব্যবহার করেছেন সমাপিকা ক্রিয়া। এর ফলে বাঙলা বাক্যে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার ক্রম স্থির রয়েছে। এ-মিশ্রবাক্যটির সাথে যুক্ত করেছেন আরেকটি মিশ্র বাক্য, যাতে ক্রমিকভাবে এসেছে সংকুচিত উপবাক্য- 'ফল লইয়া', 'পুরস্কারপ্রদানপূর্বক', 'তাহাকে বিদায় দিয়া', এবং শেষে বসিয়েছেন সমাপিকা ক্রিয়া, এবং এর সাথে সম্পূরক উপবাক্যরূপে গেঁথে দিয়েছেন একটি যৌগিক বাক্য-'এই ফল রাজ্ঞীকে দিয়াছি; ইহা কিরূপে বারাঙ্গনার হস্তগত হইল' [= এই ফল *আমি* রাজ্ঞীকে দিয়াছি; *কিন্তু* ইহা কিরূপে বারাঙ্গনার হস্তগত হইল]। বাক্যটির শুরুতে আছে একটি মিশ্রবাক্য, তার সাথে 'এবং' দিয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে আরেকটি মিশ্রবাক্য, যেটি সাংগঠনিকভাবে জটিলতর। ভাবের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ বাক্যটি ঘটনা ও ভাবনার ক্রম। বিদ্যাসাগর ক্রমিক ভাবনা প্রকাশ করেছেন ক্রমিক মিশ্রবাক্যসংগঠনের সাহায্যে। দ্বিতীয় বাক্যটির শুরুতে একটি যৌগিক বাক্যকে [পরে *রাজা* সবিশেষ অনুসন্ধান করিলেন *এবং রাজা* পূর্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন] পরিণত করেছেন মিশ্রবাক্যে, এবং এর সাথে সংযুক্ত করেছেন সাংগঠনিকভাবে বেশ জটিল একটি মিশ্রবাক্য। মিশ্রণের ফলে বাক্যের ভাব দুর্বোধ্য হয় নি; তিনি ভাবের ক্রমকে গ্রথিত রেখেছেন পরস্পরের সাথে। তিনি প্রধান উপবাক্যের ভেতরে রূপান্তরিত উপবাক্যগুলোকে ঘিরে দিয়েছেন কমা দিয়ে, কেননা ওই বাক্যগুলো রূপান্তরের ফলে বাক্যের কাঠামো হারিয়ে ফেললেও বিদ্যাসাগর ভোলেন নি যে ওগুলো বাক্য, এবং বহন করে গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য। বাক্যগঠনে বিদ্যাসাগরের রীতি এই, এবং এ হচ্ছে বিদ্যাসাগরী গদ্যের প্রকৃতি। একাধিক মিশ্রবাক্যের যৌগিকরূপ বা যৌগিক বাক্যের

মিশ্ররূপের সাহায্যে ভাবপ্রকাশ বিদ্যাসাগরের স্বভাব। সরল বাক্যসংগঠন তিনি ব্যবহার করেন এমন ভাবপ্রকাশের জন্যে, যা নিরপেক্ষ, অন্য কোনো ভাবের সাথে ক্রমিকভাবে সংযুক্ত নয়।

দ্বিতীয় উদাহরণটিতে প্রথম বাক্যটি মিশ্রবাক্য, যাতে একটি বাক্য রূপান্তরিত হয়েছে, এবং ক্রিয়াটি পেয়েছে অসমাপিকারূপ [সীতার ক্রন্দনশব্দ শ্রবণগোচর করিয়া], বিন্যস্ত হয়েছে বাক্যের শুরুতে। এর সাথে সংযুক্ত ক'রে দেয়া হয়েছে একটি জটিলতর মিশ্রবাক্যসংগঠন। এটি একটি যৌগিক বাক্য, তবে বিদ্যাসাগর 'এবং' দিয়ে সংযুক্ত করেন নি, তিনি সেমিকোলন ব্যবহার ক'রে লোপ ক'রে দিয়েছেন সংযোজকটি। এর পরের বাক্যটিও মিশ্রবাক্য, যাতে একটি উপবাক্য [তাঁহারা ইহা দেখিলেন] রূপান্তরিত হয়ে পেয়েছে 'দেখিয়া' অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ, এবং গেঁথে দেয়া হয়েছে একটি সরল বাক্যের গায়ে। তৃতীয় বাক্যটির শুরুতে একটি যৌগিক বাক্যকে [তাঁহারা ত্বরিত গমনে বাল্মীকিসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহারা বিনয়নম্র বচনে নিবেদন করিলেন] রূপান্তরিত করা হয়েছে একটি ক্রমিক মিশ্রবাক্যসংগঠনে [তাঁহারা, ত্বরিত গমনে বাল্মীকিসমীপে উপস্থিতহইয়া, বিনয়নম্র বচনে নিবেদন করিলেন], এবং তার গায়ে গেঁথে দেয়া হয়েছে একটি উক্তি, যা গ'ড়ে উঠেছে বিদ্যাসাগরী ধরনের দীর্ঘ মিশ্রবাক্যে। বিদ্যাসাগর ক্রমিক সংগঠনে একের পর এক ক্রিয়ার অসমাপিকারূপ ব্যবহার করেন না, সমাপিকার পর অসমাপিকা, তারপর সমাপিকা, এমন ক্রম মেনে চলেন [যেমন : শুনিতে পাইলাম...অনুসন্ধান করিয়া...দেখিতে পাইলাম...কাতরা হইয়া...করিতেছেন]।

বিদ্যাসাগরের গদ্য সুপরিকল্পিত মিশ্রবাক্যের গদ্য; তা দুর্বোধ্য নয়, কেননা তিনি কোনো উপাদান বাদ দেন নি বাক্য থেকে। মিশ্রবাক্যের ফাঁকেফাঁকে বিদ্যাসাগর বিন্যস্ত করেছেন সরল ও হ্রস্ব বাক্য, এবং ওই বাক্যের শাব্দ অবয়ব গ'ড়ে তুলেছেন সুপরিকল্পিত তৎসম শব্দে, বাক্যে পদের ও উপবাক্যের ক্রমবিন্যাস করেছেন বাঙলা ভাষার প্রতিভা অনুসারে, এবং সৃষ্টি করেছেন বাঙলা ভাষার আদর্শ সাধুকাঠামোটি। তাঁর গদ্যে ইংরেজি বাক্যসংগঠনেরও প্রভাব পড়েছে, তবে তিনি তাকে খাপ খাইয়ে দিয়েছেন বাঙলা ভাষার স্বভাবের সাথে। সাধুকাঠামোটিকে তিনি চরমভাবে সুস্থিত করেন নি, কোনো জীবন্ত ভাষার কাঠামো চরমভাবে কেউ সুস্থিত করতে পারেন না; পাণিনি হওয়ার জন্যে দরকার একটি মৃততাষা। সাধুকাঠামোটি নমনীয়ভাবে সুস্থিত, যার ফলে তাঁর কাঠামোর ওপর ভিত্তি ক'রেই পরে বিকাশ ঘটেছে নানা ধরনের ব্যক্তিগত গদ্যরীতি। বিদ্যাসাগর যে অবিচল ভাষিক কাঠামোতে বিশ্বাসী ছিলেন না, বিশ্বাসী ছিলেন নমনীয় কাঠামোতে, তার পরিচয় দিয়েছেন তিনি নিজেরই গদ্যে; তিনি ব্যবহার করেছেন একাধিক রীতি। তাঁর কাঠামোটিকে যুক্তিতর্কতথ্য দিয়ে ভ'রে তুললে জন্মে বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহবিষয়ক পুস্তকগুলোর গদ্য, আর ব্যক্তিগত কাতরতা সংক্রমিত করলে সৃষ্টি হয় *প্রভাবতীসম্ভাষণ*-এর গদ্য :

> বৎসে প্রভাবতি! তুমি, দয়া, মমতা ও বিবেচনায় বিসর্জন দিয়া, এ জন্মের মত, সহসা, সকলের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়াছ। কিন্তু আমি, অনন্যচিত্ত হইয়া, অবিচলিত স্নেহভরে তোমার চিন্তায় নিরন্তর এরূপ নিবিষ্ট থাকে যে, তুমি, এক মুহূর্তের নিমিত্ত, আমার দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইতে পার নাই।

একটি লঘু রীতি তিনি তৈরি করেছিলেন*অতি অল্প হইল, আবার অতি অল্প হইল, ব্রজবিলাস, রত্নপরীক্ষা* য়। এগুলো বেরিয়েছিলো ছদ্মনামে, এগুলো থেকে মুছে ফেলা দরকার ছিলো বিদ্যাসাগরকে; নিজেকে মুছে ফেলতে পার'ই ছিলো এগুলোর সাফল্য। এগুলো লেখার জন্যে দরকার ছিলো ব্যক্তিত্ববদল, আর বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব হচ্ছে তাঁর গদ্য, তাই তিনি স'রে গিয়েছিলেন নিজের ব্যক্তিত্ব বা রীতি থেকে। এগুলোতে মেলে সাধুচলতির মিশ্রণ : *তাঁর/তাঁহার, হয়েছে/কহিতেছে, হয়ে/হইয়া, লিখেছেন/লিখিয়াছিলেন*-এর মতো মিশ্রণ তিনি এগুলোতে ঘটিয়েছেন স্বেচ্ছায়, যেমন পরিকল্পিত বিভ্রান্তিসৃষ্টির জন্যে ব্যবহার করেছেন*বেহদা, ফেসাৎ, মেহনৎ, চালাকি খেলিয়াছেন* প্রভৃতি। স্বেচ্ছাবিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্যে না হ'লে 'আমি যে কিস্তি *দিয়াছিলাম, তাতেই* খুড় মাৎ*হয়েছেন*'-এর মতো দূষিত বাক্য লিখতেন না তিনি। তাঁর এ-রীতিটি লঘু, মর্মান্তিক কৌতুককর, এবং স্বেচ্ছাদূষিত। এটা বোঝায় যে বিদ্যাসাগর বিশ্বাসী ছিলেন নমনীয়তায়।

বিদ্যাসাগরের প্রধান কাঠামোটি নির্ভার হয়ে উঠেছে তাঁর পাঠ্যপুস্তকে, বিশেষ ক'রে *বর্ণপরিচয়* ও *বোধোদয়*-এ। নির্ভার হওয়ার কারণ তাঁর লক্ষ্য-পাঠকেরা, যারা বিদ্যালয়ের ছাত্র। তিনি তৎসম শব্দ ও শব্দের ভার কমিয়ে, কথ্য ক্রিয়া বসিয়ে এগুলোর ভাষাকে ক'রে তুলেছিলেন মনোরম। সরল বাক্য এগুলোতে বেশি, কিন্তু মিশ্রবাক্য এড়িয়ে যান নি তিনি। যেমন :

[ক] সদা সত্য কথা কহিবে। যে সত্য কথা*কয়*, সকলে তাহাকে ভালবাসে। যে মিথ্যা কথা*কয়*, কেহ তাহাকে ভাল বাসে না, সকলেই তাহাকে ঘৃণা করে [*বর্ণপরিচয়* -দ্বিতীয় ভাগ, প্রথম পাঠ]।

[খ] আমি*যে* সময়ের*যে* কাজ, *সে* সময়ের*সে* কাজ করি। এজন্য*বাবা* আমাকে ভালবাসেন। আমি*তাঁর* কাছে যখন*যা* চাই, *তাই* দেন। যদি আমি এখন, পড়িতে না গিয়া, তোমার সহিত খেলা করি, *বাবা* আমাকে আর ভালবাসিবেন না [*বর্ণপরিচয়* -দ্বিতীয় ভাগ, পঞ্চম পাঠ]।

[গ] পারদ, রৌপ্যের ন্যায় শুভ্র ও উজ্জ্বল। এই ধাতু জল অপেক্ষা প্রায় চৌদ্দগুণ ভারী। ইহা আর আর ধাতুর মতন কঠিন নহে, জলের ন্যায় তরল; যাবতীয় তরল দ্রব্য অপেক্ষা অধিক ভারী; সর্বদা দ্রব অবস্থায় থাকে; কিন্তু মেরুসন্নিহিত দেশে লইয়া গেলে জমিয়া যায় [*বোধোদয়*, পারদ]।

উদাহরণ তিনটিতে সরল বাক্য আছে মাত্র দুটি। প্রথম উদাহরণ দুটিতে সাধুরীতি কথ্যের কাছাকাছি হয়ে উঠেছে; এ-দুটিতে শুধু 'কয়', 'যে', 'সে', 'বাবা', 'যা', 'তাই' প্রভৃতি চলতি রূপই নেই, সর্বনামের চলতি 'তাঁর' রূপটিও বসেছে। তৃতীয় উদাহরণটিতে বিদ্যাসাগরের প্রধান গদ্যরীতিটি হয়ে উঠেছে নির্ভার।

বিদ্যাসাগর সাধুরীতির যে-কাঠামোটি সুস্থিত করেন, উনিশশতকের মাঝভাগে সেটি হয়ে ওঠে বাঙলা ভাষা, মানকাঠামো, লেখ্য বাঙলার শুদ্ধতার নিয়ামক। তখন থেকে দেখা দেয় দুটি প্রবণতা : একটি ওই মান অর্জন, আরেকটি ওই মান থেকে স'রে যাওয়া। এ-সময়ে আরেকটি রীতি বা বাঙলা মানভাষার বিকাশ ঘটছিলো মৌখিকভাবে, যার নাম চলতি ভাষা। এটি তখন যদিও বিধিবদ্ধ হয়ে ওঠে নি, তবু উনিশশতকের মাঝভাগেই, অসময়ে, এটি লিপ্ত হয় সাধুরীতির সাথে সংঘর্ষে; এবং জয়ের জন্যে তাকে অপেক্ষা করতে হয় আরো আধশতকেরও বেশি সময়। বিদ্যাসাগরের

সুস্থিত রীতির বিরুদ্ধে উনিশশতকের পঞ্চাশদশকের বিদ্রোহ ওই রীতির রৌপকাঠামোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছিলো না, ছিলো তার শাব্দ অবয়ব ও ভঙ্গির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। বিদ্রোহীরাও সাধুরীতির রৌপ কাঠামো ছেড়ে দিতে চান নি, চেয়েছিলেন তার ভেতরে কথ্য কণ্ঠস্বর বাজাতে। বঙ্কিমচন্দ্রও ছাড়েন নি ওই রীতির রৌপ কাঠামো, তিনি তাতে সংক্রামিত করেন ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য। বিশশতকে অর্ধেক দায়িত্বপালনের উপযোগী সাধুরীতি হেরে যায় পূর্ণদায়িত্ব পালনের উপযোগী চলতির কাছে, বাঙালি পায় আরেকটি ভাষাকাঠামো। তবে এর সাথে বিদ্যাসাগরের রীতির প্রধান পার্থক্য ক্রিয়া ও সর্বনামের রূপে, গৌণ পার্থক্য শাব্দ অবয়বে; আর বাক্যিক পার্থক্য খুবই কম। বিদ্যাসাগর তাঁর জাতিকে শুধু গদ্য নয়, দিয়েছিলেন একটি ভাষিক কাঠামো; তাঁর পরবর্তীরা ওই কাঠামোর ওপর তুলেছেন বিচিত্র ব্যক্তিগত গদ্যের সৌধ, যার ভিত্তিতে প্রত্যক্ষপরোক্ষভাবে আছেন বিদ্যাসাগর।

AMARBOI.COM

মানুষের ভাষা

ভাষা মানবজাতির শ্রেষ্ঠ সহজাত সম্পদ। শ্রেষ্ঠ, কেননা ভাষা ছাড়া মানুষ হয়ে উঠতো না মানুষ; আর সহজাত, কেননা অন্তত একটি ভাষার সহজাত অধিকার নিয়ে জন্ম নেয় প্রতিটি মানুষ। এমন মানবসমাজ পাওয়া যাবে না, যাদের কোনো ভাষা নেই; আবার মানুষ নয় এমন কোনো প্রাণীও পাওয়া যাবে না, যাদের ভাষা আছে। এ-ছোটো গ্রহটি ছাড়া মহাজগতের আর কোথাও মানুষ নেই, আর মানুষ ছাড়া ভাষা নেই অন্য কোনো প্রাণীর; তাই মানুষ ও ভাষা জড়িত নিবিড় সম্পর্কে। মানুষ অনন্য, এবং তার অনন্য সম্পদ ভাষা। মানুষ জন্ম নেয় ভাষাব্যবহারের সহজাত শক্তি নিয়ে; আর অর্জন করে সে-ভাষাটি, যে-ভাষাসমাজে সে বেড়ে ওঠে। মানুষকে ভাষা ঋণ করতে হয় না, কিনতে হয় না, এমনকি শিখতেও হয় না সচেতনভাবে; মানুষ হ'লেই তার একটি ভাষা থাকে; আর মানুষ না হ'লে তার কোনো ভাষা থাকে না। 'মানুষের ভাষা' কথাটি উদাহরণ বাহুল্য হেত্বাভাসের। 'ভাষা'র আগে অধিকারসূচক 'মানুষের' পদটি অপ্রয়োজনীয় ও বিভ্রান্তিকর। 'ভাষা' বলাই যথার্থ ও যথেষ্ট; এতেই বোঝা যায় নির্দেশ করা হচ্ছে মানবজাতির সে-সম্পদটিকে, যাকে বাঙলায় বলা হয় 'ভাষা'। 'মানুষের' ভাষা বললে এমন একটি ইঙ্গিতও দ্যোতিত হয় যে মানুষ ছাড়া অন্য কিছুর বা কারো ভাষা রয়েছে; তবে আর কারো বা কিছুর ভাষা নেই, যদিও সম্প্রসারিত বা রূপকার্থে বিভিন্ন প্রসঙ্গেই ব্যবহার করা হয় 'ভাষা' শব্দটি। পাখির ভাষা, পশুর ভাষা, ফুলের ভাষা, মৌমাছির ভাষা, সংকেতের ভাষা, দেহের ভাষা, রঙের ভাষা, গণিতের ভাষা, যন্ত্রের ভাষা, এমন কি নীরবতা বা স্তব্ধতার ভাষার কথাও ব'লে থাকি আমরা। এ-সবই জ্ঞাপন করে 'ভাষা'র রূপকার্থ। মানবভাষার প্রকৃতি ও ব্যাপকতা নেই পাখির, পশুর বা মৌমাছির ভাষায়; গণিত বা যন্ত্রের কৃত্রিম ভাষাও মানবভাষার স্বাভাবিক গুণ সামান্য পরিমাণেও ধারণ করে না; আর ফুলের ভাষা, রঙের ভাষা, বা স্তব্ধতার ভাষা তো পুরোপুরি কাব্যিক রূপক। ধ্বনি, রূপ বা শব্দ, বাক্য, ও অর্থের এমন এক অসামান্য সংশ্রয় স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি করেছে মানুষ, যা তার জীবন ও স্বপ্নের মতোই ব্যাপক। মানুষ কিছু স্বতন্ত্র ধ্বনি সৃষ্টি করে, সেগুলোর বিন্যাসে গ'ড়ে তোলে অর্থজ্ঞাপক শব্দ, সে-শব্দগুলোকে নানাভাবে সংগঠিত ক'রে সৃষ্টি করে বাক্য; এবং বাক্যের সাহায্যে প্রকাশ করে এমন কিছু, যাকে কোনো উপযুক্ত শব্দের অভাবে বলতে পারি 'বক্তব্য'। ভাষার সাহায্যে মানুষ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে, অভিশাপ দেয়; আদেশ দেয় ও অনুরোধ জানায়; নিবেদন করে প্রেম, প্রকাশ করে ঘৃণা; সত্য কথা বলে, মিথ্যাও বলে নিয়মিত; বাস্তবসম্মত কথা যেমন বলে তেমনি বলে ও বলতে পারে পুরোপুরি অবাস্তব কথা। ভাষার সাহায্যে মানুষ শ্রোতাকে মুগ্ধ, বিচলিত, উত্তেজিত করে; রচনা করে এমন তত্ত্ব ও শিল্পকর্ম, যা ভাষা ছাড়া সম্ভব হতো না অন্য কোনো উপায়ে। মানবজাতির সৃষ্টিশীলতার, ও তার আন্তর ও বাহ্যজীবনের সমগ্ররূপ ধরা পড়ে ভাষায়।

বাঙলা 'ভাষা' শব্দটি 'ভাষ্' ধাতু থেকে জন্মেছে, যার অর্থ 'বলা, কথা বলা'। 'ভাষা' সংস্কৃতে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ, এর অর্থ 'উক্তি'। পুরোনো ভারতে বৈদিক বা সংস্কৃতকে ভাষা বলা হতো না, বলা হতো সংস্কৃত বা বৈদিক; আর প্রাকৃত বা সাধারণ মানুষের অসংস্কৃত বুলিকেই বলা হতো ভাষা। যেমন, মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, প্রাচ্যা, অবন্তী এ-পাঁচটি প্রাকৃতকে বলা হতো 'পঞ্চবিধ ভাষা'। রামমোহন রায়ও তাঁর ব্যাকরণে বাঙলাকে এমনভাবে 'ভাষা' বলেছেন, যাতে বোঝা যায় তিনি যে-ভাষাটির ব্যাকরণ লিখছেন, তা প্রাকৃত মানুষের ভাষা বা উক্তি সমষ্টি। বাঙলায় 'ভাষা' শব্দটি এক ধরনের ক্রিয়া বা বেশ বিমূর্ত ধারণা নির্দেশ করে; কিন্তু ইংরেজি 'ল্যাংগুয়েজ' শব্দটি আক্ষরিকার্থে প্রকাশ করে বেশ স্থূল ধারণা, নির্দেশ করে একটি প্রত্যঙ্গকে। শব্দটি এসেছে ফরাশি 'লঁগ' থেকে, আর 'লঁগ' এসেছে লাতিন 'লিংগুয়া' থেকে, যার অর্থ 'জিভ'। কথা বলার সময় জিভ খুবই সক্রিয় ভূমিকা নেয়, তাই 'জিভ'ই রূপকার্থে হয়ে উঠেছে ভাষা। সাধারণের কাছে ভাষা ধ্বনির সমষ্টি; আর যারা ভাষার ভূমিকা লক্ষ্য করতে চায়, তারা ভাষাকে মনে করে সংবাদ সংজ্ঞাপনের এক রকম প্রণালি। অভিধানগুলো পাঠককে সাহায্য করার জন্যে সব সময়ই ব্যগ্র থাকে; প্রতিটি শব্দের সমস্ত তাৎপর্য পৌঁছে দিতে চায় পাঠকের কাছে। যে- কোনো ভালো ইংরেজি অভিধান খুললে গুচ্ছগুচ্ছ অর্থ বা সংজ্ঞা পাওয়া যায় ভাষার। পাওয়া যায় 'ল্যাংগুয়েজ'-এর এমন সংজ্ঞাগুচ্ছ : ১ (ক) মনুষ্যোক্তি (খ) মনুষ্যোক্তির সাহায্যে সংজ্ঞাপনের ক্ষমতা (গ) উক্তিতে ব্যবহৃত বাগধ্বনি, বা তার লিখিত প্রতীক। ২ (ক) সংজ্ঞাপনের যে-কোনো উপায়, যেমন অঙ্গভঙ্গি, পশুর ধ্বনি (খ) সংবাদপ্রেরণের জন্যে ব্যবহৃত বিশেষ প্রতীক, বা সূত্রগুচ্ছ, যেমন কম্পিউটারে ব্যবহৃত। ৩ কোনো জাতি, গোত্র প্রভৃতির ব্যবহৃত সমস্ত বাগধ্বনি, শব্দ ও সেগুলোর বিন্যাসের রীতি। বড়ো আকারের অভিধানে পাওয়া যায় ভাষার আরো অনেক অর্থ। এসব সংজ্ঞায় ভাষার খণ্ডিত চারিত্র ও রূপকার্থ ধরা পড়ে, তবে মানবভাষার গভীর প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায় না।

'ভাষা' শব্দটি কোনো বিশেষ ভাষা নির্দেশ করে না; এটি ভাষা সম্পর্কে একটি নির্বিশেষ ধারণা দেয়, যদিও কোনো নির্বিশেষ ভাষা নেই। পৃথিবীতে আমরা বাঙলা, ইংরেজি, ফরাশি, জর্মন, রুশ প্রভৃতি ভাষা দেখি, কোনো নির্বিশেষ ভাষা দেখি না; তবে 'ভাষা' শব্দটি উচ্চারণের সময় বোধ করি যে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার মধ্যে রয়েছে প্রকৃতিগত মিল, যেনো তাদের সবার চরিত্র একই রকম, তাদের রয়েছে সর্বজনীন চারিত্র, যদিও ভাষায় ভাষায় বাইরের ভিন্নতা মনে হ'তে পারে দুস্তর। প্রথাগত, বিশেষ ক'রে দার্শনিক ব্যাকরণবিদেরা তো মনেই করতেন পৃথিবীর সব ভাষা আসলে ভেতরে এক, তাদের ভিন্নতা শুধু বাহ্যিক। আপাতদৃষ্টিতে মনে হ'তে পারে কোনো মিল নেই বাঙলা, জাপানি, হটেন্টট্, সোয়াহিলি, মাওরি, ইংরেজি প্রভৃতির মধ্যে; কিন্তু মানবভাষারাশির মধ্যে রয়েছে গভীর ঐক্য। কোনো কোনো ভাষায়—ফরাশি, ইতালীয়, স্পেনীয় প্রভৃতিতে—বিশেষ ও নির্বিশেষ ভাষা বোঝানোর জন্যে রয়েছে দুটি পৃথক শব্দ। ফরাশিতে 'লঁগাজ' বোঝায় নির্বিশেষ ভাষা, 'লঁগ' বোঝায় বিশেষ কোনো ভাষা। বাঙলায় একাধিক শব্দ নেই, একই শব্দ দিয়ে আমরা ভাষার বিশেষ ও সর্বজনীন

প্রকৃতি নির্দেশ করি। ভাষার নির্বিশেষ বা সর্বজনীন চারিত্র রয়েছে, তবে কোনো বিশেষ ভাষা আশ্রয় না ক'রে পাওয়া যায় না ভাষার সর্বজনীন রূপটি। 'ভাষা' বলতে বোঝানো হয় 'মানব ভাষা' বা 'স্বাভাবিক ভাষা'। যোগযোগ বা সংজ্ঞাপনের জন্যে যে-সমস্ত পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, সেগুলোকেও বিশেষ অর্থে ভাষা বলা হয়, তবে সেগুলো 'কৃত্রিম ভাষা', স্বাভাবিক বা মানবভাষা নয়।

ভাষা কাকে বলে

এ-প্রশ্নের পাওয়া যাবে শতো শতো উত্তর। প্রথাগত ব্যাকরণবিদেরা প্রায় আড়াই হাজার বছর ধ'রে ভাষার সংজ্ঞা লিখে আসছেন। তাঁদের কাছে ভাষা হচ্ছে মানুষের উচ্চারিত ধ্বনির সমষ্টি, যার সাহায্যে মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে। আধুনিক কালে ভাষাবিজ্ঞানীরা নিজেদের তাত্ত্বিক কাঠামো অনুসারে ভাষার নানা সংজ্ঞা রচনা করেছেন, বার বার সংজ্ঞা বদল করেছেন। কারণ 'ভাষা কী' তা শুধু বোঝানো সম্ভব বিশেষ কোনো তাত্ত্বিক কাঠামো অনুসারে; তা ছাড়া ভাষার কোনো সংজ্ঞা রচনা অসম্ভব। তাঁদের সংজ্ঞাগুলোর প্রত্যেকটি আকর্ষণীয়, প্রত্যেকটিকেই সাধারণের মনে হবে অনবদ্য, কিন্তু প্রতিটিই কোনো-না-কোনোভাবে ব্যর্থ। অ্যাডওয়ার্ড স্যাপিরের মতে ভাষা হচ্ছে স্বেচ্ছায় উৎপাদিত প্রতীকের সাহায্যে ভাব, আবেগ ও কামনা সংজ্ঞাপনের সম্পূর্ণ মানবিক ও অপ্রবৃত্তিগত পদ্ধতি। এ-সংজ্ঞাটির রয়েছে অনেক খুঁত; যেমন—ভাষা শুধু ভাব, আবেগ, কামনা প্রকাশ করে না, করে আরো বহু কিছু; আর স্বেচ্ছায় উ ৎপাদিত প্রতীকের রয়েছে আরো অনেক পদ্ধতি, যা ভাষা নয়। 'অপ্রবৃত্তিগত' বিশেষণটিও এখন আর গ্রহণযোগ্য নয়; কারণ এখন অনেকটা বিশ্বাস করা যায় যে ভাষা অনেকটা মানুষের সহজাত বা প্রবৃত্তিগত। ব্লক ও ট্র্যাগারের মতে ভাষা হচ্ছে স্বেচ্ছাচারী বাকপ্রতীকের সংশ্রয়, যার সাহায্যে কোনো সামাজিক গোত্র পরস্পরিক সহযোগিতা করে। 'স্বেচ্ছাচারী' বলতে বোঝানো হচ্ছে বাকপ্রতীকগুলো ধ্রুব নয়, ইচ্ছেমতো স্থির করা। এ-সংজ্ঞায় ভাষার ভাবসংজ্ঞাপনের কোনো কথা নেই, এতে জোর দেয়া হয়েছে ভাষার সামাজিক ভূমিকার ওপর। ভাষা শুধু সামাজিক ভূমিকা পালন করে না, পালন করে আরো বহু ভূমিকা, তাই এ-সংজ্ঞাটিতে ভাষা বেশ সংকীর্ণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। এ-সংজ্ঞায় ভাষা বলতে শুধু কথ্য ভাষা বা উক্তিকে বোঝানো হয়েছে; তবে ভাষা শুধু উক্তিতে সীমাবদ্ধ নয়। কথা না ব'লেও আমরা ভাষা ব্যবহার করতে পারি; তবে ভাষা ও উক্তির মধ্যে রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। হলের মতে ভাষা হচ্ছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যাতে মানুষেরা অভ্যাসগত মৌখিক-শ্রুতিগত স্বেচ্ছাচারী প্রতীকের সাহায্যে পরস্পরের সাথে সংজ্ঞাপন ও মিথস্ক্রিয়া সম্পন্ন করে। এ-সংজ্ঞায় ভাষার ভূমিকা অনেক বেড়েছে; ধ্বনি উৎপাদন ও শ্রবণ দুটি ব্যাপারই এসেছে। ভাষাকে প্রতিষ্ঠান বলায় কোনো একটি ভাষা যে ওই সমাজের সংস্কৃতির অংশ, তাও নির্দেশিত হয়েছে। কিন্তু এ-সংজ্ঞায় 'অভ্যাসগত' বিশেষণটি ভাষাকে মানুষের একটি আচরণে পরিণত করেছে। মার্কিন সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান তিন দশক ধ'রে ছিলো আচরণবাদী মনস্তত্ত্বনিয়ন্ত্রিত। তাঁদের কাছে ভাষাও একটি অভ্যাস বা

AMARBOI.COM

আচরণ। ব্লুমফিল্ড মনে করতেন ভাষা হচ্ছে 'বিকল্প আচরণ', অর্থাৎ মানুষ ভাষা ব্যবহার ক'রে থাকে কোনো কাজের বিকল্পরূপে, কাজটি নিজেই সম্পন্ন করলে ভাষাব্যবহারের দরকার পড়ে না। আচরণবাদীদের মতে মানুষ কোনো উদ্দীপকের দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়ে সাড়া দেয়; ভাষাব্যবহারও এক রকম সাড়া, এবং তা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ মানুষের ভাষাব্যবহারের কোনো স্বাধীন শক্তি নেই, বিশেষ উদ্দীপকের প্রভাবেই মানুষ ভাষাব্যবহাররূপ সাড়া দিয়ে থাকে। ভাষার এমন আচরণবাদী ব্যাখ্যা আর গ্রহণযোগ্য ব'লে মনে করা হয় না। এখন মনে করা হয় যে ভাষা উদ্দীপক থেকে মুক্ত। চমস্কির মতে ভাষা হচ্ছে একরাশ (সসীম বা অসীম) বাক্যের সমষ্টি, যার প্রতিটি সসীম দৈর্ঘ্যসম্পন্ন, ও সসীম একগুচ্ছ উপাদানে গঠিত। এ-সংজ্ঞাটি আগের সংজ্ঞাগুলো থেকে সম্পূর্ণ ভিন;—এটিতে ভাষার সংজ্ঞাপন-ভূমিকা সম্পর্কে কিছু বলা হয় নি, এতে ভাষার উপাদানগুলোর প্রতীকধর্মিতা সম্পর্কেও কিছু বলা হয় নি, এটিতে জোড় দেয়া হ'য়েছে ভাষার সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যের ওপর। চমস্কির কাছে ভাষা হচ্ছে অসংখ্য বাক্যের সমষ্টি। ওপরের সংজ্ঞাটিতে ধ্বনির কোনো কথা বলা হয় নি; তবে বুঝতে হবে যে প্রতিটি ভাষায়ই রয়েছে সীমিত সংখ্যক ধ্বনি বা বর্ণ; আর প্রতিটি ভাষা যদিও অসংখ্য বাক্যের সমষ্টি, তবে প্রতিটি বাক্য গ'ড়ে ওঠে সীমিত সংখ্যক ধ্বনিতে। ভাষাকে মনে করতে পারি এক বিমূর্ত সংশ্রয়রূপে, যা বাস্তবায়িত হয় একগুচ্ছ ধ্বনিরূপে;—ধ্বনিগুলো বিন্যস্ত হয় শব্দে, আর শব্দ বিন্যস্ত হয়ে গঠিত হয় বাক্য; এবং প্রকাশ করে এমন কিছু, যাকে কোনো শব্দের সাহায্যেই ঠিকমতো ধারণ করা যায় না, তবে তাকে বলতে পারি 'বক্তব্য'। চমস্কির সংজ্ঞাই ভাষার চূড়ান্ত সংজ্ঞা নয়, কারণ চমস্কি ভাষার বক্তব্য সম্পর্কে বলেন নি কিছু, কিন্তু ওই বক্তব্য ছাড়া ভাষার প্রয়োজন মানুষ কখনো অনুভব করতো না। কারো মনে মিষ্টি মধুর ধ্বনি সঞ্চার করার জন্যে মানুষ মুখ্যত ভাষা সৃষ্টি করে নি, ভাষা সৃষ্টি করেছে, কেননা মানুষ কিছু প্রকাশ করতে চায়, পেশ করতে চায়, এবং চায় আরো অনেক কিছু, যা সম্পন্ন হ'তে পারে শুধু ভাষারই সাহায্যে।

অধিকাংশ মানুষের কাছে ভাষা হচ্ছে উচ্চারিত ধ্বনির সমষ্টি, বা ভাষা হচ্ছে 'উক্তি'। তবে ভাষা ও ধ্বনিসমষ্টি বা উক্তিকে অভিন্ন ভাবা ঠিক নয়। ভাষা ধ্বনি ছাড়াও বাস্তবায়িত হ'তে পারে। ধ্বনিকে গণ্য করতে পারি ভাষার মাধ্যম হিশেবে; তবে এটা ঠিক যে ভাষার মাধ্যম হিশেবে ধ্বনিই শ্রেষ্ঠ। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা প্রথাগত ব্যাকরণবিরোধী ছিলেন; প্রথাগত ব্যাকরণবিদেরা যেহেতু লিখিত ভাষাকেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন, তাই সাংগঠনিকেরা জোড় দিয়েছিলেন ভাষার কথ্যতার ওপর। কথ্য ও লিখিত ভাষার মধ্যে কোনটিকে মনে করবো মৌলিক? কথ্যভাষাই যে অগ্রবর্তী বা মৌলিক, তা বিভিন্নভাবেই দেখানো যায়। যেমন, কথ্যভাষা ঐতিহাসিকভাবে লিখিত ভাষার পূর্ববর্তী, অর্থাৎ কথ্যভাষার আবির্ভাবই ঘটেছিলো আগে, পরে উদ্ভাবিত হয় লেখনপদ্ধতি। সাংগঠনিভাবেও হয়তো কথ্যভাষা লিখিত ভাষার পূর্ববর্তী, তবে তা যে হ'তেই হবে এমন নয়। মানুষ যেমন ধ্বনিবিন্যাস করতে পারে ও সেগুলো লিপিবদ্ধ করতে পারে, আবার লিপিবদ্ধ ধ্বনিকেও উচ্চারণ করতে পারে। তাই কথা বলা ও

লেখার মধ্যে কথা বলাকে যে পূর্ববর্তী হ'তেই হবে, তা নয়; তবে ঐতিহাসিকভাবে হয়তো তাই হয়েছে। ভূমিকার বেলায়ও কথ্যভাষা অগ্রবর্তী। এক সময় লেখনপদ্ধতিই ছিলো না; আর এখনো কথ্যভাষা লিখিত ভাষার থেকে বেশি কাজে ব্যবহৃত হয়। লিখিত ভাষার কাজ এখন অনেক ক'মে গেছে। তাই ভূমিকা পালনের বেলায়ও কথ্যভাষা অগ্রবর্তী। জৈবভাবেও কথ্যভাষা অগ্রবর্তী। মানুষের বিবর্তনের কোনো পর্যায়ে মানুষ বাগধ্বনি উচ্চারণ করেছিলো, বিমূর্ত ভাষাকে বাস্তবায়িত করেছিলো ধ্বনিসমষ্টিরূপে। এসব সত্ত্বেও ভাষাকে ধ্বনির সাথে অভিন্ন মনে করা ঠিক নয়। ভাষা এক বিমূর্ত সংশ্রয়, তা বাস্তবায়িত হ'তে পারে ধ্বনি—মাধ্যম, বা বর্ণ-মাধ্যমের সাহায্যে।

ভাষার উৎপত্তি

মানুষ নিজের উৎপত্তি সম্পর্কে যেমন আগ্রহী, তেমনি আগ্রহ তার ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে। কয়েক হাজার বছর ধ'রেই মানুষ প্রশ্ন ক'রে আসছে ভাষার উৎপত্তি হয়েছে কীভাবে, আদিভাষা কোনটি বা কোনগুলো, স্বর্গে কোন ভাষা বলা হতো ইত্যাদি। এসব প্রশ্নের ঠিক উত্তর কোনো দিন মিলবে না, যদিও মানুষ কয়েক হাজার বছর ধ'রেই এসব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আসছে, উত্তরে অসন্তুষ্ট থাকছে, আবার প্রশ্ন করছে, ও উত্তরে সন্তুষ্ট হ'তে পারছে না। ভাষার উদ্ভব ও আমাদের কালের ব্যবধান এতো দুস্তর যে ভাষার উৎস উদঘাটনের কোনোই সম্ভাবনা নেই। ভাষার উদ্ভবের সবচেয়ে সরল তত্ত্বটিকে বলতে পারি 'অধঃপতনতত্ত্ব'। এটি পাওয়া যাবে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে। খ্রিষ্টানরা বিশ্বাস করে স্বর্গের ভাষা ছিলো হিব্রু; আদমহাওয়া স্বর্গচ্যুত হওয়ার সময় পৃথিবীতে নিয়ে আসে হিব্রুভাষাটি; এবং ওই ভাষা থেকে, বাবেলের গোলমালের পর, জন্ম নেয় বিভিন্ন ভাষা। হিন্দুদের বিশ্বাস, ঈশ্বরের ভাষা বৈদিক বা সংস্কৃত। তবে ভাষা, অন্যান্য সব কিছুর মতোই, কোনো বিধাতার সৃষ্টি নয়। মানুষের বিবর্তনের এক পর্যায়ে মানুষই সৃষ্টি করেছিলো ভাষা। স্বর্গের ভাষা নিয়ে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বেশ কলহ রয়েছে; অনেকে রঙ্গরসিকতাও করেছেন এ নিয়ে। ভাষাতাত্ত্বিক বিকানুস (১৫১৮-১৫৭২) নানা যুক্তি পেশ ক'রে দেখিয়েছিলেন যে জর্মনই শ্রেষ্ঠ ভাষা, এটিই আদমহাওয়া বলতো স্বর্গে, এবং এটি বাবেলের গোলমাল দ্বারা আক্রান্ত হয় নি, কারণ জর্মনরা বাবেলের অট্টালিকা নির্মাণে অংশ নেয় নি। তাঁর মতে আদি বাইবেল প্রথম লেখা হয়েছিলো জর্মন ভাষায়, তবে ঈশ্বর পরে বাইবেল হিব্রুভাষায় অনুবাদ করিয়ে নেন। স্বর্গের ভাষা নিয়ে মারাত্মক কৌতুক করেছিলেন সুইডেনি লেখক আন্দ্রিয়াস কেমপে (১৬২২-১৬৮৯);—তাঁর মতে স্বর্গে আদম বলতো ডেনীয়, ঈশ্বর বলতো সুইডেনি, আর সাপটি বলতো ফরাশি!

একটি পুরোনো প্রশ্ন হচ্ছে যে পৃথিবীর ভাষাগুলো কি কোনো একটি বিশেষ ভাষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে, না শুরু থেকেই ছিলো অনেক ভাষা? ধর্মগ্রন্থগুলো তাদের বিশ্বাস অনুসারে একটি ভাষারই কথা বলে। বাইবেলে 'বাবেলের অট্টালিকা' গল্পে বলা হয়েছে আদিতে ছিলো হিব্রুভাষা। মানুষ যখন ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে থাকে, বাবেলের

অট্টালিকা নির্মাণ ক'রে, তখন হিংস্র ভগবান তাদের ভাষাভেদ ঘটিয়ে দেয়। বাবেলের লোকেরা একে অন্যের ভাষা বুঝতে না পেরে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে, আর পৃথিবীতে দেখা দেয় বিভিন্ন ভাষা। গল্পটি সত্য নয়, তবে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কোনো একটি বিশেষ ভাষা থেকে অন্য সব ভাষার উৎপত্তি ঘটেছে, এ-মতকে বলা হয় 'এক-উৎসতত্ত্ব'। তত্ত্ব হিশেবে এটা গ্রহণযোগ্য নয়, তবে এখনো অনেক ভাষাবিজ্ঞানী এ-তত্ত্বে বিশ্বাস করেন। শুরুতেই অনেক ভাষা ছিলো, এবং সে-সব ভাষার বিবর্তনের ফলে পৃথিবীর ভাষাগুলো উদ্ভূত হয়েছে, এ-মতকে বলা হয় 'বহু-উৎসতত্ত্ব'। এ-তত্ত্বটিকেই মনে হয় বেশি গ্রহণযোগ্য, কেননা মানুষের বিবর্তনের যে-স্তরে ভাষার উদ্ভব ঘটেছিলো, তখন মাত্র একটি ভাষারই উদ্ভব হয়েছিলো, এটা যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না।

ক্রাইস্টের জন্মের আগে থেকেই গ্রিক ও পুরোনো ভারতের দার্শনিকেরা ও ব্যাকরণবিদেরা ভাষার উৎপত্তি ও স্বভাব নিয়ে বিপুল তর্কবিতর্ক ক'রে এসেছেন। পুরোনো গ্রিসে একদল দার্শনিক মনে করতেন ভাষা প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক, তার উৎপত্তি হয়েছে কোনো অমোঘ বিধানের ফলে। আরেক দল মনে করতেন, ভাষা কোনো ঐশী উপহার নয়; তা সামাজিক প্রথামাত্র—মানুষ যেমন অন্যান্য প্রথা সৃষ্টি করেছে, তেমনি সৃষ্টি করেছে ভাষাপ্রথাটি। প্লাতোর *ক্রাতিলুস* সংলাপে এ নিয়ে চমৎকার বির্তক রয়েছে; তবে শেষে সক্রেটিস সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে ভাষা প্রথামাত্র, কোনো ঐশী বিধানের ফল নয়। যদি ভাষা ঐশী হতো, তবে তার সব কিছু হতো সুশৃঙ্খল, তার ঘটতো না কোনো পরিবর্তন; কিন্তু ভাষায় বিশৃঙ্খলা অনেক, আর পরিবর্তন ঘটে চলছে হেরাক্লিতাসের নদীরই মতো। ভারতেও স্বভাববাদী ও প্রথাবাদীদের বির্তক হয়েছে। যেমন, কালিদাসের মতে বাক্য ও অর্থের সম্পর্ক হরগৌরীর সম্পর্কের মতো শাশ্বত; কিন্তু প্রথাবাদীরা দেখিয়েছেন ভাষায় কোনো কিছুই শাশ্বত নয়। ধ্বনি বদলে যায়, শব্দের অর্থ বদলে যায়, বদলে যায় সব কিছু। তাই ভাষা মানুষেরই সৃষ্টি; ভাষা মানুষেরই একটি সামাজিক চুক্তি। আঠারোশতকের ইউরোপি দার্শনিকেরাও ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে অনুমানের পর অনুমান ক'রে চলেছেন। জন লক বিশ্বাস করতেন যে বিধাতা চেয়েছিলো মানুষ সমাজে বাস করবে, তাই তার ভাষার দরকার হবে; এজন্যে বিধাতাই মানুষকে ভাষা দান করে। লাইবনিৎসের ধারণা ছিলো এর বিপরীত। তাঁর মতে মানুষ নিজেকে অপরের কাছে প্রকাশ ও বোধগম্য করার বাসনা থেকেই বিকাশ ঘটায় ভাষার। ১৭১৪ খ্রিস্টাব্দে বারনার্ড ম্যানডেভিল প্রকাশ করেন তাঁর *মৌমাছির উপকথা*। এ-বইতে তিনি তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করেন ভাষা-উৎপত্তির ধর্মীয় তত্ত্ব; মত দেন যে ধ্বনির বিবর্তন প্রক্রিয়ায় উদ্ভব ঘটেছে ভাষার। রুশো ভাষার উৎপত্তি সম্পের্ক বার বার ভেবেছেন, ও বার বার নতুন তত্ত্ব প্রস্তাব করেছেন। রুশোর মতে মানুষ যেহেতু প্রাকৃতিক প্রাণী, তাই তার জীবনে দরকার ব'লে কিছু নেই, ভাষাও কোনো দরকারে সে সৃষ্টি করে নি। প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের কোনো ভাষারই দরকার পড়ে নি; তবে দুই আদিম মানুষের মিলনের ফলে যখন সন্তান জন্ম নেয়, তখন মাতা ও সন্তান সৃষ্টি করে ভাষা। রুশো বিশ্বাস করতেন যে মানুষের কোনো দরকার ছিলো না ভাষার। প্রকৃতির

AMARBOI.COM

মধ্যে মানুষ ছিলো মহান বর্বর, সম্পর্কের থেকে নিঃসঙ্গতাই ছিলো তার কাম্য। তবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে মানুষ একত্র হয়ে গ'ড়ে তোলে ভাষা। রুশোর ভাষা-উৎপত্তিতত্ত্ব নিছক অনুমান।

আঠারো শতক থেকে, ধর্মান্ধরা ছাড়া, সবাই মনে করে যে মানুষই ভাষা সৃষ্টি করেছে। কীভাবে সৃষ্টি করেছে, সে সম্পর্কে প্রস্তাবিত হয়েছে কয়েকটি তত্ত্ব। ইয়েসপারসেন (১৮৬০-১৯৪৩) সেগুলোকে চার শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন, অদ্ভুত নাম দিয়েছেন, এবং নিজেও পঞ্চম একটি তত্ত্ব পেশ করেছেন। (১) ভোভো-তত্ত্ব : এ-তত্ত্বানুসারে মানুষ ভাষা সৃষ্টি করেছে প্রাকৃতিক ধ্বনির অনুকরণ ক'রে ক'রে। (২) উহ্-আহ্-তত্ত্ব : এ-তত্ত্বানুসারে মানুষ যন্ত্রণা, ক্রোধ প্রভৃতি আবেগ প্রকাশ করতে গিয়ে ভাষা সৃষ্টি করেছে। (৩) ঢংঢং-তত্ত্ব : এ-তত্ত্বানুসারে মানুষ বিভিন্ন উদ্দীপকের সাড়া দিতে গিয়ে স্বতস্ফূর্তভাবে ভাষা সৃষ্টি করেছে। (৪) হেইয়ো-হেইয়ো-তত্ত্ব : এ-তত্ত্বানুসারে তালে তালে একত্রে কাজ করতে গিয়ে মানুষ ভাষা সৃষ্টি করেছে। (৫) লা-রে-লা-তত্ত্ব : এ-তত্ত্বানুসারে মানুষের প্রেম, কাব্যিক অনুভূতি, গান গাওয়া থেকে ভাষার উদ্ভব ঘটেছে। এ-তত্ত্বগুলোকে বেশ কৌতুককর মনে হয়; এগুলো ভাষার বাইরের দিকটি ব্যাখ্যা করতেই উৎসাহী। মানুষের মস্তিষ্ক ও ভাষার বিমূর্ত প্রকৃতি সম্বন্ধে এগুলোর কোনো ভাবনা নেই।

এসব প্রকল্পনাকে সরিয়ে দিয়ে আধুনিক বিজ্ঞান সম্প্রতি চেষ্টা চালিয়েছে ভাষার উৎপত্তি উদঘাটনের। এ-বিদ্যাকে বলা হয় 'গ্লোসোজেনেটিক্স' বা 'ভাষা-উদ্ভববিজ্ঞান'। মনে করা হয় যে মানুষের বাকপ্রত্যঙ্গগুলো কোনো অমানব স্তন্যপায়ী প্রাণীর বিবর্তনের ফলে উদ্ভূত হয়। মানুষ বিকশিত হয় ভাষিক প্রাণীরূপে। অনুমান করা হচ্ছে যে এক লক্ষ থেকে বিশ হাজার খ্রিপূ সময়ের মধ্যে উদ্ভূত হয় ভাষা। তবে এর আগে হয়তো ছিলো অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে সংজ্ঞাপনের কোনো পদ্ধতি। ভাষা-উদ্ভবের প্রথম পর্যায়ে ইশারাইঙ্গিতের ভূমিকা হয়তো ছিলো খুবই বেশি। ভাষা সৃষ্টির জন্যে মস্তিষ্ক ও বাকপ্রত্যঙ্গের সমান্তরাল বিকাশ দরকার ছিলো। মস্তিষ্ক ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে, বাকপ্রত্যঙ্গ বিকশিত হয়েছে, মানুষ ধ্বনি সৃষ্টি করেছে, সেগুলোকে বিন্যাস করেছে, এবং ভাষা উদ্ভূত হয়েছে।

ভাষা ও মন ও মস্তিষ্ক

তিন দশক আগে অধিকাংশ ভাষাবিজ্ঞানী ভাষাকে মনে করতেন মানুষের অন্য সব আচরণের মতো একটি আচরণ ব'লে। মার্কিন মনোবিজ্ঞানী ওয়াটসন অ্যামিবা থেকে মানুষ পর্যন্ত সমস্ত কিছু ব্যাখ্যার জন্যে প্রস্তাব করেছিলেন দুটি ধারণা—উদ্দীপক ও সাড়া; এবং এর সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন ভাষা। আচরণবাদী মনস্তত্ত্ব ভাষাবিজ্ঞানে নিয়ে আসেন ব্লুমফিল্ড; ভাষাকে তিনি এক রকম সাড়া ব'লেই গণ্য করেন। অর্থাৎ মানুষের কোনো স্বাধীনতা নেই ভাষা প্রয়োগের, মানুষ উদ্দীপক দ্বারা আক্রান্ত হয়ে দিয়ে থাকে ভাষিক সাড়া। আচরণবাদ লক-হিউমের *অভিজ্ঞতাবাদ*-এর পরিণতি। লক, হিউম ও অন্যান্য অভিজ্ঞাতাবাদী মনে করতেন মানুষ কোনো সহজাত

শক্তি নিয়ে জন্ম নেয় না; জন্ম নেয় *তাবুলা রাসা* বা 'শূন্যপৃষ্ঠা' রূপে। এক সময় অভিজ্ঞতার বিচিত্র লেখায় ওই পৃষ্ঠা ভ'রে ওঠে। অর্থাৎ জ্ঞান অভিজ্ঞতাজাত, তাই ভাষাও অভিজ্ঞতাজাত। এ-মতানুসারে ভাষা সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নিয়ে মানুষ জন্মায় না। জন্ম নেয়ার পর প্রতিবেশ থেকে মানব শিশু আহরণ করে ভাষা। লক-হিউমের সমকাল থেকেই আর একটি তত্ত্ব চ'লে আসছে, তার নাম *চৈতন্যবাদ*, যার মূল কথা হচ্ছে মানুষ নানা সহজাত শক্তি বা ধারণা দিয়ে জন্ম নেয়, এবং ওই ধারণা অনুসারে অভিজ্ঞতাকে শোধিত ক'রে নেয়। এ-মতানুসারে অভিজ্ঞতা জ্ঞানের মাতা নয়, জ্ঞান সহজাত। এ-তত্ত্ব 'মন' নামক ধারণায় বিশ্বাসী। চৈতন্যবাদী তত্ত্বানুসারে মানুষ ভাষা সম্পর্কে সহজাত ধারণা নিয়ে পৃথিবীতে আসে। দেকার্ত-লাইবনিৎস ছিলেন এ-মতের প্রবক্তা। আঠারো থেকে বিশশতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বিলেতে ও যুক্তরাষ্ট্রে অভিজ্ঞতাবাদ প্রবল ছিলো, তবে ফরাশি-জর্মনিতে চৈতন্যবাদ ছিলো প্রভাবশালী। অভিজ্ঞতাবাদের পরিণতি আচরণবাদ, যা মার্কিন মনোবিজ্ঞানে ও ভাষাবিজ্ঞানে প্রাধান্য বিস্তার করে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষাকে একটি আচরণ ব'লে গণ্য করেছেন, বিশ্বাস করেছেন যে মানুষ প্রতিবেশ থেকে অভিজ্ঞতার সাহায্যে সংগ্রহ করে ভাষা। তাঁরা কোনো রকম অবৈজ্ঞানিক 'মন' বা 'চৈতন্য' বা 'সহজাত বোধে' বিশ্বাসী ছিলেন না। ওই সব ছিলো তাঁদের কাছে হাস্যকর।

১৯৫৭ অব্দে চমস্কির আবির্ভাবের পর সব কিছু পাল্টে যায়। চমস্কি মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও প্রণালি পদ্ধতিগুলো ধ'রেই টান দেন, দেখান যে তাঁরা ভাষা সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ ক'রে ভুল প্রণালিপদ্ধতির সাহায্যে ভুল ভাষাবিজ্ঞান চর্চা ক'রে এসেছেন। ভাষা সম্পর্কে আচরণবাদী ধারণাটিকেও বাতিল ক'রে দেন তিনি, বাতিল করেন পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক রীতিতে; ফিরিয়ে আনেন 'মন'কে; প্রস্তাব করেন এক নতুন ধরনের চৈতন্যবাদ, যেখানে মনের বড়ো ভূমিকা রয়েছে। চমস্কি দেখান প্রতিটি ভাষা অজস্র নিয়মের সমষ্টি; কোনো মানুষের পক্ষে সচেতনভাবে অভিজ্ঞতা থেকে অতো নিয়ম আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। তিনি দাবি করেন মানুষ অবশ্যই নানা সহজাত ভাব নিয়ে জন্মায়, এবং জন্ম নেয় ভাষা সংগঠন সম্পর্কে সহজাত ধারণা নিয়ে। যদি মানুষকে অভিজ্ঞতা থেকে ভাষা আয়ত্ত করতে হতো, তাহলে পৃথিবীতে ভাষার অস্তিত্বই থাকতো না। তিনি মনে করেন মানুষের জৈবকোষে মানবভাষা সম্পর্কে একটি ধারণা খচিত হয়ে থাকে, এবং তার সাহায্যে প্রতিবেশের মুখোমুখি হয়ে মানুষ ভাষা অর্জন করে। মানবশিশুর মনের মধ্যে যেনো সর্বজনীন মানবভাষার একটি ব্যাকরণ আগে থেকেই আছে; ওই ব্যাকরণ কোনো বিশেষ ভাষার ব্যাকরণ নয়, তা ভাষার সর্বজনীন ব্যাকরণ। ওই ব্যাকরণ বা বোধের সাহায্যে মানুষ অনায়াসে ভাষা আয়ত্ত করে। মানবশিশু কোনো বিশেষ ভাষায় অধিকার নিয়ে জন্ম নেয় না। বাঙালি শিশু শুধু বাঙলা ভাষা অধিকারের শক্তি নিয়ে জন্ম নেয় না, যে-কোনো ভাষা আয়ত্তের শক্তি থাকে তার; সে-ভাষাটিই সে অবলীলায় আয়ত্ত করে, যে-ভাষা পরিবেশে তার বাল্যকাল কাটে। চমস্কির মত ভাষা সম্পর্কে ধারণা পুরোপুরি পাল্টে দিয়েছে; ভাষাকে কেউ আর উদ্দীপক-সাড়া নিয়ন্ত্রিত আচরণ ব'লে মনে করে না; মনে

করে ভাষা এমন একটি সংশ্রয়, যা স্বাধীন ও সৃষ্টিশীল। সাম্প্রতিক মনোভাষাবিজ্ঞানী ও মস্তিষ্কবিজ্ঞানীদের গবেষণা চমস্কির মতকেই প্রতিষ্ঠিত করতে যাচ্ছে।

চমস্কি যাকে 'মন' বলেছেন, তাকে যদি 'মস্তিষ্ক' হিশেবে ধরি, তাহলে তাঁর মত এর মাঝেই অনেকটা প্রশমিত হয়ে গেছে ব'লে মনে করতে পারি। মস্তিষ্ক দেহকেন্দ্র, ও খুবই জটিল। মস্তিষ্ক, বিশেষ ক'রে সেরিব্রাম বা গুরুমস্তিষ্ক দু-ভাগে বা গোলার্ধে বিভক্ত। এ-দু-গোলার্ধ সংযুক্ত কর্পাস ক্যালোসাম দিয়ে। মস্তিষ্কের বাম গোলার্ধে নিয়ন্ত্রণ করে শরীরের ডান অংশকে, আর ডান গোলার্ধ নিয়ন্ত্রণ করে শরীরের বাম অংশকে। মানুষের ভাষা নিয়ন্ত্রিত হয় মস্তিষ্কের বাম অর্ধ দিয়ে। মস্তিষ্কের এক ভাগ পালন করে বিশেষ কিছু ভূমিকা; অন্য ভাগ পালন করে অন্য কিছু বিশেষ ভূমিকা। যে-প্রক্রিয়ায় একটি ভাগ বিশেষ কিছু ভূমিকা পালনের দক্ষতা অর্জন করে, তাকে বলা হয় 'ল্যাটরলাইজেশন' বা 'পার্শ্বীয়করণ'। মনে করা হয় যে বছর দুয়েকের মতো বয়সে মানবশিশুর মস্তিষ্কের পার্শ্বীয়করণ শুরু হয়, এবং পাঁচ বছর বয়স থেকে বয়ঃসন্ধি পর্যন্ত সময়ে পার্শ্বীয়করণপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। মনে করা হয় যে ভাষা-অর্জনের জন্যে পার্শ্বীয়করণ আবশ্যিক। পার্শ্বীয়করণ শুধু মানবশিশুরই ঘটে, অন্য কোনো প্রাণীর ঘটে না; তাই মানবশিশু ভাষা অর্জন করে, অন্য কোনো প্রাণী করে না। শিশুদের ভাষা-অর্জনের ও পার্শ্বীয়করণের কাল শুরু ও শেষ হয় একই সময়ে; তাই শিশুরা ওই বয়সে অনায়াসে ভাষা অর্জন করে। কিন্তু একটু বেশি বয়সে কোনো ভাষা শিখতে বেশ কষ্ট হয়, ভালোভাবে শেখাই হয়ে ওঠে না। যাদের বাম মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত, বা পার্শ্বীয়করণ ঘটে না যাদের, তারা ভাষা নিয়ে অসুবিধায় পড়ে। মস্তিষ্কের এ-প্রক্রিয়া নির্দেশ করে যে ভাষা একান্তভাবেই একটি মানবিক ব্যাপার;—মানুষ ভাষাবোধ ও প্রয়োগের বিশেষ শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। গত কয়েক শো বছরে এমন কিছু শিশুর সংবাদ পাওয়া গেছে, যারা বনে পশু দ্বারা লালিতপালিত হয়েছে, বা সমাজবিচ্ছিন্নভাবে বেড়ে উঠেছে। এসব ভাগ্যহীন শিশুর মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছে এভিরনের ভিক্টর (১৭৯৯), নুরেমবার্গের কাসপার হাউসার (১৮২৮), মেদিনীপুরের অমলা ও কমলা (১৯২০) ও লসএঞ্জেলসের জেনি (১৯৭০)। এদের যখন পাওয়া যায় তখন তাদের পার্শ্বীয়করণের বয়স পেরিয়ে গিয়েছিলো, এবং তাদের ভাষা শেখানোর প্রয়াস বিশেষ সফল হয় নি। তাই ভাষা সম্পর্কে চমস্কির প্রস্তাবই মেনে নিতে হয় যে মানুষ শূন্যপৃষ্ঠারূপে জন্ম নেয় না, মানুষ ভাষা-অর্জনের বিশেষ শক্তি নিয়ে জন্মায়।

ভাষার চার স্তর

মানুষ যখন ভাষা ব্যবহার করে অর্থাৎ বলে ও শুনে অনুধাবন করে, তখন একটি বিস্ময়কর কাজ করে; এবং এতো অবলীলায় করে যে তাতে কেউ বিস্ময় বোধ করে না। প্রতিটি ভাষা অসংখ্য সূত্রের সমষ্টি, কেউ জানে না একেকটি ভাষায় কতোগুলো সূত্র রয়েছে; তবে ভাষীরা সে-সব সূত্র সচেতনভাবে না-জেনেই চমৎকার প্রয়োগ ক'রে থাকে। কেউ কথা বলছে, তার অর্থ হচ্ছে আর মস্তিষ্কে মুহূর্তে 'ভাব' বা 'বক্তব্য'টি গ'ড়ে উঠেছে, সাথে সাথে মস্তিষ্ক নির্দেশ দিয়েছে উপযুক্ত বাক্যসংগঠনটি সৃষ্টি করার,

সাথে সাথে উপযুক্ত শব্দরাশির বিন্যাসে গঠন করা হয়েছে বাক্য, এবং তা উচ্চারিত হচ্ছে বক্তার বাকপ্রত্যঙ্গের অনায়াস প্রচেষ্টায়। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় মুহূর্তে, যদিও বক্তব্য ধ্বনিরূপে উচ্চারণে পরিমাপযোগ্য সময় লাগে। ভাষায় এক সাথে জড়িয়ে আছে অর্থ-বাক্য-শব্দ-ধ্বনির চারটি স্তর;—ভাষীরা চারটি স্তরকে অবলীলায় একই

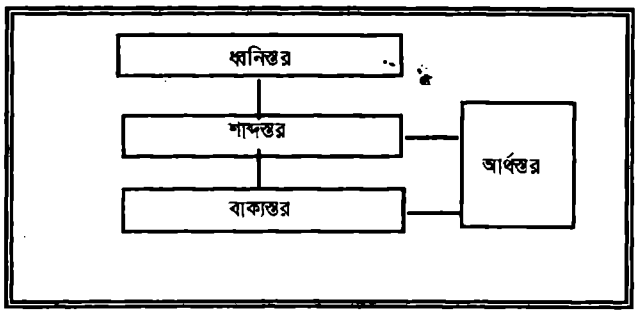

সাথে খাটিয়ে নেয়। তাই তাদের কাছে ভাষা হচ্ছে চারস্তরের এক জৈবিক সংশ্রয়। কিন্তু ভাষা বিশ্লেষণ বা বর্ণনা করার সময় চারটি স্তরকে একসাথে বর্ণনা করা যায় না; তাই চারটি স্তরকে পৃথক ক'রে নিয়ে বর্ণনা করা হয় ভাষা। স্তর চারটি আর্থস্তর, বাক্যস্তর, শাব্দ বা রূপস্তর, ও ধ্বনিস্তর। এ-চারটির কোনটি আগে, বা এগুলোর ক্রম কী, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। বক্তার দিক থেকে বিচার করলে স্তরগুলোর ক্রম হবে আর্থ, বাক্য, শাব্দ ও ধ্বনিস্তর; আর শ্রোতার দিক থেকে বিচার করলে ক্রম হবে ধ্বনি, শাব্দ, বাক্য ও আর্থস্তর। আগে ভাষা বর্ণনা শুরু করা হতো ধ্বনিস্তর থেকে, ক্রমশ যাওয়া হতো উচ্চতর স্তরে; এখন চমস্কিপ্রবর্তিত রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণে বাক্যস্তরটিকেই গণ্য করা হয় কেন্দ্রস্তর; অন্যান্য স্তরগুলোকে সহস্তর হিশেবে বিবেচনা করা হয়। এমন করা হয় রূপান্তর ব্যাকরণের তাত্ত্বিক পদ্ধতিগত প্রয়োজনে। ভাষার বর্ণনা যদি বাইরে থেকে ভেতরের দিকে আসে অর্থাৎ ধ্বনি থেকে অর্থের দিকে এগোয়, তাহলে সাধারণের বুঝতে সুবিধা হয়। ওপরে যে-চারটি স্তরের কথা বলা হয়েছে, সবাই যে এ-চারটি স্তরই মেনে নেন এমন নয়; এর থেকে বেশি বা কম, ও উপস্তরের প্রস্তাবও করেন অনেকে।

ধ্বনিস্তর

কথা বলার সময় অবিরাম অবিচ্ছিন্ন ধ্বনি উৎসারিত হয়; বাকপ্রত্যঙ্গ সৃষ্টি ক'রে যেতে থাকে ধ্বনিপরম্পরা শ্রোতার কানে এসে লাগে একরাশ গোলমাল। যে-ভাষা জানি না, ধ্বনির গোলমালই মনে হয় তাকে। ধ্বনি ভাষার সবচেয়ে বাইরের স্তর, ও সবচেয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। তাই ধ্বনিপরম্পরাই অধিকাংশ মানুষের কাছে ভাষা। প্রতিটি ভাষায় বিশ থেকে পঞ্চাশ-ষাটটির মতো ধ্বনি থাকে। মানুষের পক্ষে সুস্পষ্টভাবে স্বতন্ত্র শতো শতো ধ্বনি সৃষ্টি করা সম্ভব নয়; তাই বিভিন্ন ভাষার ধ্বনির মধ্যে মিল রয়েছে নানা রকম। তবে তাদের বিন্যাস বিভিন্ন, ও শৃঙ্খলা বিচিত্র। যতো ধ্বনি আছে

AMARBOI.COM

মানবভাষাগুলোতে, সেগুলোকে যদি ভাঙা হয় ছোটো ছোটো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যে, তবে দেখা যায় যে নানা বৈশিষ্ট্যে মিল রয়েছে এক ভাষার সাথে আরেক ভাষার, এবং অমিলও রয়েছে অনেক। মূর্ত ধ্বনি বিমূর্ত ভাষাকে বাস্তবায়িত করার মাধ্যম। তাই ধ্বনিকে ধ্বনিমাধ্যম বলা হয়। ভাষিক ধ্বনিরাশি কিছু প্রত্যঙ্গের সাহায্যে উচ্চারিত হয়; এগুলোকে বলা হয় বাকপ্রত্যঙ্গ। তবে এসব প্রত্যঙ্গের কোনোটিই মৌলিকভাবে বাকপ্রত্যঙ্গ নয়, অর্থাৎ ধ্বনি-উচ্চারণের জন্যেই এগুলো বিশেষভাবে বিকশিত হয় নি মানবদেহে। এগুলোর প্রাথমিক দায়িত্ব অন্য কিছু। ধ্বনিসৃষ্টির জন্যে দরকার বাতাস বা বায়ু বা প্রাণ; ওই প্রাণকেন্দ্র ফুসফুস। ফুসফুসের প্রাথমিক কাজ নিশ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ে রক্তে অম্লজান সরবরাহ। তেমনি, দাঁত ও জিভের কাজ খাওয়া, ঠোঁটের কাজ মুখ বন্ধ রাখা, স্বরতন্ত্রির মূল কাজ বায়ুনালিতে যাতে খাবার ঢুকে না পড়ে, তার ব্যবস্থা করা। মানুষ এ-প্রত্যঙ্গগুলোকেই লাগিয়েছে দ্বিতীয় আরেকটি কাজে, ধ্বনিসৃষ্টির কাজে। এটা পরিমিতির উদাহরণ। ধ্বনিসৃষ্টির জন্যে যদি আরেকগুচ্ছ প্রত্যঙ্গ বিবর্তনের ভুলে বা নির্বুদ্ধিতায় বিকশিত হতো, তাহলে মানুষের রূপ উৎকটরূপে ভিন্ন হতো। প্রতিটি ধ্বনির তিনটি দিক রয়েছে; এগুলো উচ্চারণগত, ধ্বনিগত, ও শ্রুতিগত দিক। ধ্বনিগুলো কথাবলার সময় বিচ্ছিন্নভাবে উচ্চারিত হয় না হয় অবিচ্ছিন্নভাবে; কিন্তু ভাষীরা বিচ্ছিন্নভাবে ওগুলোকে বোধ ক'রে থাকে। ধ্বনিরাশি যেনো খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে পড়া পাখির মতো, যে আর খাঁচায় ফিরে আসে না; কিন্তু বাকপিঞ্জর আবার সৃষ্টি করতে পারে ওই ধ্বনি, যদিও তা কখনোই অবিকল আগের মতো হয় না। ধ্বনির নিজের কোনো অর্থ নেই, তবে এগুলো পরস্পরের সাথে বিন্যস্ত হয়ে সৃষ্টি করে সার্থ বা অর্থসম্পন্ন ভাষাবস্তু, যাকে প্রথাগতভাবে বলা হয় 'শব্দ'। ভাষাবিজ্ঞানীরা অবশ্য 'শব্দ' ধারণাটিকে অবৈজ্ঞানিক গণ্য ক'রে 'রূপমূল' ধারণাটিই ব্যবহারের বেশি পক্ষপাতী। তবে 'শব্দ' ধারণাটিকেও বাদ দেয়া যাবে না কখনো।

প্রতিটি ভাষায় যে-ধ্বনিগুলো রয়েছে, সেগুলো বিন্যস্ত হয় বিশেষ শৃঙ্খলায়। বিশেষ ভাষায় বিশেষ শৃঙ্খলায় ধ্বনিরাশির বিন্যাস হচ্ছে ভাষাটির ধ্বনিতত্ত্ব বা ধ্বনিশৃঙ্খলা। বিভিন্ন ভাষায় ধ্বনির যেমন ভিন্নতা রয়েছে, তার চেয়ে বেশি রয়েছে বিন্যাসের ভিন্নতা। ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য, যাকে বলা হয় ভাষার *দ্বিসাংগঠনিকতা*, এখানে উল্লেখ করতে পারি। ভাষায় ছোটো উপাদানে গ'ড়ে ওঠে তার থেকে বড়ো উপাদান, আবার ওই উপাদানে গ'ড়ে ওঠে আরো বড়ো উপাদান বা সংগঠন। যেমন, ধ্বনিতে গ'ড়ে ওঠে শব্দ, শব্দের বিন্যাসে গ'ড়ে ওঠে পদ, পদের বিন্যাসে সৃষ্টি হয় বাক্য। ভাষার দ্বিসাংগঠনিকতার সবচেয়ে ছোটো বা মূল উপাদান ধ্বনি। ভাষার ধ্বনিবিন্যাস বর্ণনার জন্যে ভাষাবিজ্ঞানীরা তিন দশক আগে সাহায্য নিতেন 'ধ্বনিমূল' ধারণার। ধারণাটি এখনো আছে, ধ্বনিশৃঙ্খলা বোঝানোর জন্যে ধ্বনিমূল ধারণাটি বেশ সাহায্য করে; তবে ধারণাটি এখন বাতিল হয়ে গেছে। ধ্বনিমূল বলতে বোঝানো হতো ধ্বনির ক্ষুদ্রতম একককে, যার নিজের কোনো অর্থ নেই, কিন্তু অর্থস্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করতে পারে। যেমন, /প্/, অথবা /ফ্/ : এ-দুটির কোনো অর্থ নেই, তবে /পাল/, /ফাল/ রূপ দুটিতে অর্থস্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করেছে। ত্রুবেৎস্কোয়, ইয়াকবসন প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানী দেখিয়েছেন,

এবং পুরোনো ভারতের ধ্বনিবিজ্ঞানীরা জেসাসের জন্মের আগেই দেখিয়েছিলেন, যে এগুলোকে আরো ছোটো ছোটো বৈশিষ্ট্যে ভাঙা যায়। তাই ধ্বনিমূল ধ্বনির ক্ষুদ্রতম একক নয়, তবে ব্যবহারিকভাবে ধ্বনিমূল ধারণাটি বেশ উপকারী।

প্রতিটি ভাষা তার ধ্বনিগুলো বিচিত্রভাবে বিন্যস্ত ক'রে অসংখ্য শব্দ সৃষ্টি করতে পারে। অসংখ্য বলছি এজন্যে যে কোনো একটি ভাষার ধ্বনিগুলোর সাহায্যে মোট কতোগুলো শব্দ গঠিত হ'তে পারে, এর কোনো হিশেব এখনো নেয়া হয় নি; তবে হিশেব নেয়া অসম্ভব নয়। প্রতিটি ভাষার নতুন শব্দ সৃষ্টির সম্ভাবনা অসীম। একটি ভাষার ধ্বনিরাশি যতো শব্দ সৃষ্টি করতে পারে, তার অতি সামান্য অংশই প্রয়োজনে লাগে, ও গঠিত হয়ে থাকে। বাঙলা ভাষায় মৌখিক ও আনুনাসিক স্বরধ্বনি রয়েছে ষোলোটি, ব্যঞ্জনধ্বনি রয়েছে আটাশটি; অর্থাৎ বাঙলায় রয়েছে চুয়াল্লিশটি ধ্বনি। বাঙলায় মাত্র একটি ধ্বনিতে শব্দ গঠিত হতে পারে; যেমন—'ও'। দু-ধ্বনিতে গঠিত হ'তে পারে; যেমন—'এক'; তিন ধ্বনিতে গঠিত হ'তে পারে; যেমন—'একা'; চার ধ্বনিতে গঠিত হ'তে পারে; যেমন—'একটি'; পাঁচ ধ্বনিতে গঠিত হ'তে পারে; যেমন—'তোমার'; ছ-ধ্বনিতে গঠিত হতে পারে; যেমন—'তোমাকে'; সাতধ্বনিতে গঠিত হ'তে পারে; যেমন—'তোমাদের'; আটধ্বনিতে গঠিত হ'তে পারে; যেমন—'তরুণীরা'; ন-ধ্বনিতে গঠিত হ'তে পারে; যেমন—'তরুণীদের'; দশধ্বনিতে গঠিত হ'তে পারে; যেমন—'সুদূরতমা'। এভাবে আরো বহুধ্বনিতে—এগারো, বারো, তেরো, সম্ভবত বিশ-পঁচিশটি ধ্বনিতেও গঠিত হ'তে পারে বাঙলা শব্দ। যদি ধ'রে নিই যে বাঙলা শব্দ এক থেকে সর্বোচ্চ দশ ধ্বনিতে গঠিত হ'তে পারে, তবে সৃষ্টি হ'তে পারে নিম্নসংখ্যক শব্দ :

১ ধ্বনিতে গঠিত শব্দ	৪৪	৪৪
২ ধ্বনিতে গঠিত শব্দ	৪৪x৪৪	১,৯৩৬
৩ ধ্বনিতে গঠিত শব্দ	৪৪x৪৪x৪৪	৮৫,১৮৪
৪ ধ্বনিতে গঠিত শব্দ	৪৪x৪৪x৪৪x৪৪	৩,৭৪৮,০৯৬
৫ ধ্বনিতে গঠিত শব্দ	৪৪x৪৪x৪৪x৪৪x৪৪	১৬৪,৯১৬,২২৪
৬ ধ্বনিতে গঠিত শব্দ	৪৪x৪৪x৪৪x৪৪x৪৪x৪৪	৭,২৫৬,৩১৩,৮৫৬
৭ ধ্বনিতে গঠিত শব্দ	৪৪x৪৪x৪৪x৪৪x৪৪x৪৪x৪৪	৩১৯,২৭৭,৭২১,৬৮৬
৮ ধ্বনিতে গঠিত শব্দ	৪৪x৪৪x৪৪x৪৪x৪৪x৪৪x৪৪x৪৪	১৪,০৪৮,২১৯,৭৫৪,১৮৪
৯ ধ্বনিতে গঠিত শব্দ	৪৪x৪৪x৪৪x৪৪x৪৪x৪৪x৪৪x৪৪x৪৪	৬১৮,১২১,৬৬৯,১৮৪,০৯৬
১০ ধ্বনিতে গঠিত শব্দ	৪৪x৪৪x৪৪x৪৪x৪৪x৪৪x৪৪x৪৪x৪৪x৪৪	২৭.১৯৭,৩৫৩,৪৪৪,১০০,২২৪

পাঠক হিশেব ক'রে নেবেন কতোগুলো শব্দ তৈরি হ'তে পারে চুয়াল্লিশটি ধ্বনির বিন্যাসে। সংখ্যাটি ভয়াবহ, তবে এটি সংখ্যাতাত্ত্বিক প্রতারণাও। ওপরের পরিসংখ্যান অনুসারে বাঙলা ভাষার যে-কোনো ধ্বনি অন্য যে-কোনো ধ্বনির সাথে যে-কোনো স্থানে বসতে পারে; তবে তা সত্য নয়। কোনো ভাষায়ই ধ্বনির যে-কোনো বিন্যাস গ্রহণযোগ্য নয়; বিশেষ কিছু বিন্যাসই ভাষিকভাবে গ্রহণযোগ্য। যেমন, বাঙলায় কোনো শব্দ নেই, যেগুলোর ধ্বনিবিন্যাস /এএএএএ/, /ওওওওওওও/, /ক্‌ক্‌ক্‌ক্‌ক্‌ক্‌/, /টশজ্‌ম্‌খ্‌চ্‌/। প্রতিটি ভাষায় ধ্বনিবিন্যাস বা পরম্পরার রয়েছে কঠোর বিধিনিষেধ।

AMARBOI.COM

অনেক ধ্বনি পরস্পরের সাথে বসে না, বসলেও সব জায়গায় বসে না; অনেক ভাষায় ব্যঞ্জনের আগে-পরে স্বরধ্বনি থাকতেই হয়, বা দুটি বা তিনটির বেশি ব্যঞ্জনধ্বনি পর পর বসতে পারে না, বসলেও সব ধরনের ব্যঞ্জনধ্বনি পর পর বসে না। এসব বিধিনিষেধের ফলে শব্দের সংখ্যা বেশ ক'মে যায়; আবার ভাষায় থাকে অনেক ধ্বনির গ্রহণযোগ্য বিন্যাস, কিন্তু ওই বিন্যাসের কখনো দরকার পড়ে নি ব'লে কোনো শব্দ গ'ড়ে ওঠে নি। তবে দরকার পড়লে গ'ড়ে নেয়া যায়। যেমন, বাঙলায় /*ঙ্কাক্স/ বিন্যাস অসম্ভব; কিন্তু /নাগচ/, /বিবিলি/, /জুকুচামা/ বিন্যাস গ্রহণযোগ্য হ'লেও এগুলোর বিন্যাসে কোনো শব্দ তৈরি হয় নি। ধ্বনিমাধ্যমের সাহায্যে এভাবেই গ'ড়ে ওঠে ভাষার সার্থ একক। এ-ছাড়াও আরেক ধরনের ধ্বনি রয়েছে, যেগুলোকে বলতে পারি সহায়ক ধ্বনি; ওগুলোর কাজ শব্দের কোনো স্থানে জোর দেয়া, বা বাক্যের বিশেষ স্বরভঙ্গি সৃষ্টি করা। বাঙলায় জোরের ভূমিকা বেশ কম, তবে ভঙ্গির ভূমিকা ব্যাপক; আর কোনো কোনো ভাষায়, যেমন চীনা ভাষায়, ভঙ্গি মূলধ্বনিরই কাজ করে।

শাব্দস্তর

ধ্বনিতে গ'ড়ে ওঠে ভাষার রূপমূল অর্থাৎ ভাষার ক্ষুদ্রতম সার্থ একক। ধ্বনির কোনো অর্থ নেই, কিন্তু রূপমূলের অর্থ আছে; আর রূপমূল যেহেতু একক, তাই তাকে আর ভাঙা যায় না। ভাঙলে তার অর্থ নষ্ট হয়। যেমন, {ছেলে, মেয়ে, গাছ, এক, মেঘ} প্রভৃতি। এগুলো ভাঙলে এগুলোর রূপ ও অর্থ দু-ই নষ্ট হয়। প্রথাগত 'শব্দ' ধারণাটি বিজ্ঞান সম্মত না হ'লেও তাকে পুরোপুরি বিদায় দেয়া সম্ভব নয়। বলতে পারি রূপমূল এক রকম শব্দ, তবে শব্দমাত্রই রূপমূল নয়। {ছেলে, মেয়ে} রূপমূল ও শব্দ; কিন্তু 'ছেলেরা', 'মেয়েরা' শব্দ, তবে রূপমূল নয়; কেননা এগুলো একাধিক রূপমূলের সমবায়ে গ'ড়ে উঠেছে। প্রতিটি ভাষায় শব্দসৃষ্টির বিচিত্র সূত্র রয়েছে; ওই সব সূত্রের সাহায্যে সৃষ্টি করা সম্ভব অসংখ্য নতুন শব্দ। শব্দসৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'রূপতত্ত্ব' ('রূপ'-এর মূল অর্থ 'গঠন';—এখানে সে-অর্থই বোঝানো হচ্ছে, সম্প্রসারিত 'সৌন্দর্য' অর্থ বোঝানো হচ্ছে না)। শব্দসৃষ্টির প্রক্রিয়া যদিও খুবই শক্তিশালী, তবে তা পুরোপুরি সৃষ্টিশীল নয়; অর্থাৎ শব্দসৃষ্টির বিভিন্ন সূত্র কিছু পরিমাণে গ্রহণযোগ্য শব্দ সৃষ্টি করে, যা সাধারণত গৃহীত হয় না। তবে প্রতিটি ভাষায় ধ্বনি একমুঠো, কিন্তু শব্দের সংখ্যা বিপুল। শাব্দ সূত্রের সীমাবদ্ধ সৃষ্টিশীলতার একটি উদাহরণ দিই। একটি সূত্রানুসারে বাঙলায় 'আপাদমস্তক', 'আসমুদ্রহিমাচল' এরকম গুটিকয় শব্দ তৈরি হয়; কিন্তু এ-সূত্রের সাহায্যে যদি নির্বিচারে শব্দ তৈরি করতে থাকি, তবে 'আপাদশির', 'আজানুনাসিকা'র মতো মোটামুটি গ্রহণযোগ্য শব্দ তৈরি হ'তে পারে; কিন্তু 'আগ্রামনগর', 'আঢাকাচট্টগ্রাম', 'আমাটিআকাশ'-এর মতো শব্দ বিব্রতকর ব'লে মনে হবে।

শব্দ সৃষ্টির দুটি প্রক্রিয়া রয়েছে : একটি 'প্রত্যয়ন', অন্যটি 'আহরণীকরণ'। প্রথমটি বিশেষ আকর্ষণীয় নয়; এটি আসলে নতুন শব্দ সৃষ্টি করে না;—শব্দের সাথে বহুবচনচিহ্ন, বিভক্তি, ক্রিয়াসহায়ক যোগ ক'রে শব্দের নতুন রূপ তৈরি করে। যেমন,

'ছেলে'র সাথে 'রা' বা 'দের' যোগ ক'রে হয় 'ছেলেরা', 'ছেলেদের'; বা 'কর'-এর সাথে 'এছে', 'ছেন', 'লেন' যোগ ক'রে হয় 'করেছে', 'করছেন', 'করলেন'। প্রত্যয়নপ্রক্রিয়ার শক্তি সীমিত। আকর্ষণীয় হচ্ছে আহরণীকরণপ্রক্রিয়াটি, যে-প্রক্রিয়ায় গ'ড়ে উঠেছে, এবং প্রতিনিয়ত অভিনব শব্দ সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিটি ভাষায়। সব ভাষাই তার প্রয়োজনীয় শব্দসৃষ্টির সম্ভবনা বহন করে, তবে সব ভাষার আহরণী প্রক্রিয়া যে সমান সক্রিয়, এমন নয়। বাঙলা ভাষায় নতুন শব্দ আহরণের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু ওই সম্ভাবনা কাজে লাগানো হয় না; কিন্তু ইংরেজি ভাষায় প্রায়-প্রতিদিন কোনো-না-কোনো নতুন শব্দ সৃষ্টি হচ্ছে। শব্দ সৃষ্টি হয় সমাজের প্রয়োজনে; ইংরেজিকে পালন করতে হয় একটি বিশাল জটিল দ্রুত অগ্রসর সভ্যতার সমস্ত দায়িত্ব, তাই বিভিন্ন এলাকায় প্রতিদিন নতুন শব্দ সৃষ্টি হচ্ছে। বাঙলা এখনো প্রায় কৃষক সমাজের ভাষা, তাকে দায়িত্ব পালন করতে হয় কম; বাঙলায় বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি প্রভৃতি, অর্থাৎ সাহিত্য ছাড়া কিছুরই মৌলিক চর্চা হয় না, তাই বাঙলায় নতুন শব্দ সৃষ্টি হয় খুব কম। যখন সৃষ্টি হয়, তখন শব্দটির গায়ে এক ধরণের জড়তা লেগে থাকে। বাঙলা ব্যাকরণগুলোতে পাওয়া যায় পুরোনো, গঠিত শব্দের বর্ণনা; সংস্কৃত ব্যাকরণে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে শব্দগুলো, বাঙলায় অবিকল তাই ঋণ ক'রে আনা হয়। তবে বাঙলায় যে নতুন শব্দ সৃষ্টি হচ্ছে না, এমন নয়; সেগুলো সম্বন্ধে আমরা গভীরভাবে বিশেষ কিছু জানি না, কেননা এ-বিষয়ে বিশেষ গবেষণা হয় নি। তাই প্রথাগত ব্যাকরণের উদাহরণ ও অনেকাংশে অপব্যাখ্যাই আমাদের প্রধান আশ্রয়। শব্দসম্ভার প্রতিটি ভাষার এক অস্থির এলাকা। বিশেষ সময়ের চাহিদায় দলে দলে কিছু শব্দ দেখা দেয়, চাহিদা মিটে গেলে ওগুলো প্রবেশ করে অভিধানে, ঠাণ্ডা হয়ে থাকে; আবার কখনো চঞ্চল উষ্ণ জীবনের ডাকে চঞ্চল হয়ে সাড়া দেয়, পালন করে দায়িত্ব।

প্রতিটি ভাষায়ই মূল শব্দের সাথে আগে-পিছে প্রত্যয় যোগ করে শব্দ গঠনের সুযোগ রয়েছে। বাঙলায় এ-সুযোগ ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। সমাসেরও বিপুল সুযোগ রয়েছে সব ভাষায়ই। বাঙলায় প্রকৃতিপ্রত্যয় সমবায়ে, ও সমাসপ্রক্রিয়ায় বহু শব্দ আহরিত হয়। শব্দমূলের সাথে প্রত্যয়, উপসর্গ বসিয়ে 'সহিত' থেকে 'সাহিত্য', 'সাহিত্যিক', 'অসাহিত্য', 'অসাহিত্যিক', 'অপসাহিত্যিক', 'সুসাহিত্য' যেমন আহরণ করা যায়, তেমনি সমাসপ্রক্রিয়ায় আহরণ করা যায় 'রক্তগোলাপ' বা 'একনায়ক', ও আরো বহু শব্দ। উনিশশতকে বিভিন্ন সমাসপ্রক্রিয়ায় আহরিত হয়েছিলো এমন অনেক শব্দ, যা এখন বিভীষিকা জাগায়। তখন সংস্কৃত থেকে ধার করা হয়েছিলো 'অপত্রপা, 'আব্রুবাণ, 'প্রাড্ডিবাক', ও 'কোকিলকলালাপবাচাল', 'সুন্দরীমুখমনোহরান্দোলিতো-ৎফুল্লরাজীব'-এর মতো বিভীষিকা। এখন যদি তৈরি করি 'স্বৈরাচারশৃঙ্খলমুক্তি-পাগলাপামারজনতা', তবে তা হাস্যকর হবে। সমাসপ্রক্রিয়া বাঙলা শব্দসৃষ্টির একটি প্রধান সূত্র, যদিও আজকাল অধিকাংশ সমাসবদ্ধ শব্দ একশব্দ রূপে লেখা হয় না। শব্দ তৈরির নানা অভিনব কৌশলও রয়েছে, যা ইংরেজি ভাষার প্রতিভার সাথে ভালো খাপ খায়। 'এসকেলিফ্ট্', 'সেক্সপ্লয়টেশন্'-এর মতো শব্দ ইংরেজিতে প্রচুর তৈরি হয়; এবং আহরিত হয় এমন শব্দ, যা সম্পূর্ণ অভাবিত। যেমন, অস্বর্ন তৈরি করেছেন

'ফ্যানফাকিংটাস্টিক', অর্থাৎ 'ফ্যান্টাস্টিক ফাকিং'।

বাক্যস্তর

শব্দের বিন্যাসে গ'ড়ে ওঠে বাক্য; তবে বাক্য সম্পর্কহীন শব্দের পরম্পরা নয়। বাক্যে শব্দগুলো গুচ্ছেগুচ্ছে বিভক্ত থাকে;—ওই গুচ্ছগুলোকে বলতে পারি 'পদ' (প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণের পদ নয়)। বাক্য পদের সমষ্টি। বাক্য সম্পর্কে আড়াই হাজার বছর ধ'রেই সচেতন দার্শনিক ও ব্যাকরণবিদেরা; এবং তাঁরা বাক্যের সংগঠনও ব্যাখ্যা করেছেন নানাভাবে। বাক্যের গুরুত্ব সবাই বুঝেছেন, কিন্তু ঠিক মতো বর্ণনা করতে পারেন নি। ১৯৫৭ অব্দে চমস্কি যখন *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস* নামে একটি ছোটো বই প্রকাশ করেন, দাবি করেন বাক্যই ভাষার কেন্দ্রবস্তু, এবং প্রতিটি ভাষা অসংখ্য বাক্যের সমষ্টি, তখন ভাষা সম্পর্কেই ধারণা বদলে যায়। চমস্কি ওই বইতে প্রস্তাব করেন *রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ* নামে এক অভিনব ভাষিক তত্ত্ব ও ব্যাকরণকাঠামো, দেখান মানুষ ও ভাষা সৃষ্টিশীল। মানুষ যে-কোনো মুহূর্তে অভিনব বাক্য সৃষ্টি করতে ও বুঝতে পারে;—মানুষ বাক্যিক প্রাণী। বাক্য কেন্দ্র ক'রে চমস্কি এমন ভাষিক তত্ত্ব ও ব্যাকরণকাঠামো প্রস্তাব করেন, যা মানুষ ও ভাষা সম্পর্কে পুরোনো ধারাণা যেমন বদলে দেয়, তেমনি সৃষ্টি করে ভাষা ও মানুষকে ব্যাখ্যার বিশ্বব্যাপী আগ্রহ। কয়েক বছরে চমস্কি তাঁর তত্ত্ব সংস্কারসংশোধন করেন, ভাষা ও মনের সাথে গভীর সম্পর্ক নির্দেশ করেন; ও বাক্যবর্ণনার কালান্তর সাধন করেন। চমস্কি অবশ্য 'বর্ণনা' শব্দটি ব্যবহার করেন না, তিনি ব্যবহার করেন 'জেনারেট' বা 'সৃষ্টি' শব্দ; এবং দাবি করেন যে ব্যাকরণের কাজ হচ্ছে ভাষার সমস্ত, ও শুদ্ধ বাক্য সৃষ্টি করা। মানুষ আগেই বাক্য সৃষ্টি করে মস্তিষ্কে মজুত ক'রে রেখে দেয় না, যে-কোনো মুহূর্তে নতুন ও অভিনব বাক্য সৃষ্টি করতে পারে, ও বুঝতে পারে। অভিনব বলতে বিস্ময়কর বোঝানো হচ্ছে না, বোঝানো হচ্ছে এমন বাক্য, যা আগে কেউ ব্যবহার করে নি। যদি বলি, 'আমাদের পাশের বাসার মেয়েটি তেলেপোকা ভাজা খুব পছন্দ করে', তাহলে বাক্যটি নিশ্চয়ই অভিনব হবে, কারণ এটি আগে আর কখনো সৃষ্টি হয় নি; তবে এটা কোনো বিস্ময়কর বাক্য নয়। বলতে পারি, 'বৃত্তের পাঁচটি বাহু থাকে', 'কালো রঙ লাল', 'আমার টাইপরাইটি নিয়ত গর্ভবতী'—অস্বাভাবিক বাক্য এগুলো, তবে এগুলো সৃষ্টি করতে পারি, অন্যেরা বুঝতেও পারে। প্রতিটি ভাষায় বাক্য অসংখ্য;—পৃথিবীর সমস্ত বাঙলা বইয়ে যতো বাঙলা বাক্য পাওয়া যায়, তাতে বাঙলা বাক্যসম্ভার নিঃশেষিত নয়। কোনো ভাষার বাক্যের সবচেয়ে বড়ো অংশটি কখনোই উচ্চারিত হবে না। বাক্য আমরা বোধ করি, ও প্রয়োগ করি; তবে বোধ ও প্রয়োগ এক জিনিশ নয়। বোধ অসচেতন ব্যাপার, প্রয়োগ বাস্তব কাজ। বোধ গভীর হওয়া সত্ত্বেও প্রয়োগে বিভিন্ন বিঘ্ন ঘটতে পারে, সাধারণত ঘ'টে থাকে।

প্রথাগতভাবে বাক্যের দুটি অংশ নির্দেশ করা হয়;—একটি উদ্দেশ্য, অন্যটি বিধেয়। গ্রিক দার্শনিকেরা এ-বিভাগ করেছিলেন; পরে গ্রিকলাতিন ব্যাকরণ থেকে ইংরেজি ব্যাকরণে, ও ইংরেজি ব্যাকরণ থেকে প্রবেশ করে বাঙলা ব্যাকরণে। সংস্কৃত

ব্যাকরণবিদেরা এমন ভাগ করেন নি। তাঁরা ঢুকেছিলেন আরো গভীরে;—তাঁরা দেখেছিলেন প্রতিটি বাক্যে থাকে একটি ক্রিয়া, ও এক বা একাধিক বিশেষ্যপদ, যেগুলো ক্রিয়ার সাথে জড়িত থাকে নানা সম্পর্কে। ওই সম্পর্কের নাম দিয়েছিলেন তাঁরা 'কারক'। কারক একটি গভীর বিমূর্ত ধারণা; তবে পরে সংস্কৃত ব্যাকরণের কারক ধারণাটি স্থূল হয়ে ওঠে; কারক হয়ে ওঠে বিভক্তি প্রয়োগের ব্যাপার। গ্রিকলাতিন ব্যাকরণেও এমন স্থূল কারকধারণা রয়েছে। গ্রিকলাতিন ব্যাকরণবিদেরাই সংগঠন অনুসারে বাক্যকে সরল, মিশ্র, যৌগিক তিনভাগে ভাগ করেছিলেন; এবং অর্থানুসারে ভাগ করেছিলেন বিবৃতিমূলক, প্রশ্নবোধক, নিষেধাত্মক, আজ্ঞাসূচক, বিস্ময়সূচক প্রভৃতি ভাগে। সংগঠন অনুসারে বাক্যকে সরল, মিশ্র, যৌগিক শ্রেণীতে ভাগ করা যায় বস্তুগতভাবে; কিন্তু অর্থানুসারে ভাগের কোনো সীমা নেই। অর্থানুসারে কোনো বাক্যকে বলতে পারি 'কামনাসূচক বাক্য', কোনোটিকে 'বিদ্রোহসূচক বাক্য', কোনোটিকে 'আনুগত্যসূচক বাক্য', কোনোটিকে 'পরাবাস্তব বাক্য', কোনোটিকে 'জাতীয়তাবাদী বাক্য', কোনোটিকে 'রাজাকারি বাক্য'...। এমন শ্রেণীর কোনো শেষ নেই, তাই তা নিরর্থক।

চমস্কির প্রস্তাবিত রূপান্তর ব্যাকরণ বাক্য বর্ণনা করে না, সৃষ্টি করে। রূপান্তর ব্যাকরণকে মনে করা যেতে পারে এক ধরনের বিমূর্ত যন্ত্ররূপে, যার কাজ ভাষার সমস্ত, ও কেবল শুদ্ধ বাক্য সৃষ্টি করা। এ-ব্যাকরণ রচনা করে বাক্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ সূত্র; প্রথাগত ব্যাকরণের মতো তা বাক্যের কিছুটা ব্যাখ্যা ক'রে বাকিটা ব্যবহারকারীর বোধির ওপর ছেড়ে দেয় না। পুরোনো কাল থেকে চমস্কির আবির্ভাবের কাল পর্যন্ত ভাষীরা বুঝে এসেছে যে ভাষার বিভিন্ন বাক্যের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে, ওই সম্পর্ক তারা মনে মনে বোধ করেছে; কিন্তু সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়ায় তা কেউ দেখাতে পারে নি। রূপান্তর ব্যাকরণ সম্পন্ন করে ওই কাজটি। চমস্কি প্রস্তাব করেন যে প্রতিটি বাক্যের রয়েছে দুটি ক'রে সংগঠন বা তল : একটির নাম দেন তিনি 'ডিপ স্ট্রাকচার' বা 'গভীর সংগঠন/তল'; অন্যটির নাম দেন 'সারফেস স্ট্রাকচার' বা 'বহিঃসংগঠন/তল'। রূপান্তর ব্যাকরণের একগুচ্ছ সূত্রকে বলা হয় 'পদসাংগঠনিক সূত্র';—ওই সূত্রগুলো নির্দেশ করে প্রতিটি বাক্যের গভীর সংগঠন; আর রূপান্তর ব্যাকরণে রয়েছে একগুচ্ছ রূপান্তর সূত্র, যার নাম অনুসারে হয়েছে এ-ব্যাকরণের নাম,—ওই সূত্রগুলো নানাভাবে বাক্যের গভীর সংগঠনকে রূপান্তরিত ক'রে সৃষ্টি করে বাক্যের বহিঃসংগঠন। বাক্যের বহিঃসংগঠনের ওপর রূপধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র প্রয়োগ ক'রে নির্দেশ করা হয় বাক্যের ধ্বনিরূপ। বাক্যের অর্থ নির্ণীত হয় গভীর সংগঠনে। 'আমি জানি যে আমাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই', 'আমি জানি আমাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই, 'আমাদের যে কোনো ভবিষ্যৎ নেই, তা আমি জানি' বাক্য তিনটির মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে, তা আমরা বুঝতে পারি; কিন্তু তা সুস্পষ্টভাবে দেখাতে পারে শুধু রূপান্তর ব্যাকরণ। প্রথম বাক্যটিকে মনে করতে পারি বাক্য তিনটির মূল বাক্য; এটির গভীর সংগঠন থেকে নানা রূপান্তর সূত্র প্রয়োগ ক'রে আহরণ করতে পারি অন্য বাক্য দুটি। চমস্কির 'ডিপ স্ট্রাকচার', 'সারফেস স্ট্রাকচার' সাধারণের মধ্যেও সাড়া জাগিয়েছিলো। তারা একথা ভেবে আলোড়িত হয়ে উঠেছিলো

যে ভাষার শুধু বাইরের রূপই নেই, আছে তার অদৃশ্য রূপও—অনেকের কাছে এটা ছিলো সুখকর স্বপ্নের মতো।

প্রতিটি ভাষা অসংখ্য বাক্যের সমষ্টি, তবে বাক্যের সংগঠন বা সূত্র অসংখ্য নয়। সংগঠন অনুসারে প্রতিটি ভাষায় রয়েছে তিন শ্রেণীর বাক্য। প্রথমে সরল বাক্য। যে-বাক্যে ক্রিয়া রয়েছে একটি, আর নেই কোনো যৌগিক বা জটিল বিশেষ্যপদ, তাকে বলা হয় সরল বাক্য। 'একটি মেয়ে আসছে' সরল বাক্য। প্রতিটি ভাষায় রয়েছে যৌগিক বাক্যসৃষ্টির শক্তি। যৌগিক বাক্যে যুক্ত হ'তে পারে একাধিক বাক্য, বা একাধিক বিশেষ্য বা অন্য শ্রেণীর পদ। বলতে পারি 'একটি মেয়ে আসছে ও একটি ছেলে যাচ্ছে', বা 'একটি মেয়ে ও একটি ছেলে আসছে', বা 'একটি মেয়ে আসছে ও হাসছে'; এবং গঠন করতে পারি যৌগিক বাক্য। যৌগিকতা এক পৌনঃপুনিক প্রক্রিয়া; অর্থাৎ কোনো বাক্যকে যৌগিক প্রক্রিয়ায় অনন্ত কাল ধ'রে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করা সম্ভব। যৌগিকতার রয়েছে বিচিত্র রূপ; সব ভাষায় যে সবগুলো রূপ রয়েছে, তা নয়; তবে বহু রূপ রয়েছে বহু ভাষায়। যেমন, বাঙলায় আমরা বলি, 'আমি সকালে উঠে মুখ ধুয়ে কাপড় প'রে খাবার খেয়ে অফিসে যাবো।' এটি ক্রমিক সংগঠন;—এখানে একটির পর একটি ক্রিয়া এসেছে, অসমাপিকা রূপ ধরেছে, ও শেষ ক্রিয়াটি হয়েছে সমাপিকা ক্রিয়া। এ-ধরনের সংগঠন জাপানিতে ও আফ্রিকার কোনো কোনো ভাষায় রয়েছে। এ-সংগঠনটির বিস্তৃত রূপ হচ্ছে 'আমি সকালে উঠবো এবং আমি মুখ ধুবো এবং আমি কাপড় পরবো এবং আমি খাবার খাবো এবং আমি অফিসে যাবো।' ইংরেজিতে কথাটি অনেকটা এমনভাবেই বলতে হবে। তবে এতোটা বিস্তৃত বাক্য আমরা বাস্তবে বলি না, এটিকে রূপান্তরিত ক'রে ওপরের ক্রমিক সংগঠনটিই সাধারণত ব্যবহার করি। আরেক ধরনের বাক্যকে বলা হয় মিশ্র বাক্য। বাক্য নানাভাবে মিশ্র হ'তে পারে। তবে সব ধরনের মিশ্র বাক্যেই মূল বাক্যের শরীরে গ্রথিত করা হয় উপবাক্য। ওই উপবাক্যের গায়ে গাঁথা যায় আরেকটি উপবাক্য, তার গায়ে গাঁথা যায় আরেকটি উপবাক্য; এবং বাক্যকে ডানে বা বাঁয়ে অনন্তকাল ধ'রে বাড়ানো যেতে পারে। বাড়ানো যেতে পারে, কিন্তু সাধারণত বাড়াই না; কেননা তাতে বাক্য দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। 'যে-মেয়েটি নাচছে, তার গ্রীবায় একটা লাল তিল রয়েছে' একটি সম্বন্ধাত্মক মিশ্র বাক্য; আর 'বাঙালিরা জানে যে তাদের ভবিষ্যৎ নেই' একটি সম্পূরক মিশ্র বাক্য। যৌগিক বাক্যের প্রতিটি উপবাক্য হ'তে পারে মিশ্র, আবার যুক্ত করা যায় বিচিত্র ধরনের মিশ্র বাক্য। বাক্য সসীম হয়ে থাকে, তবে প্রতিটি বাক্য মূলত অসীম; অর্থাৎ প্রতিটি বাক্যকেই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করা যায়। তাই প্রতিটি ভাষা অসংখ্য বাক্যের সমষ্টি।

আর্থস্তর

চমস্কি যদিও বাক্যস্তরকে ও সাধারণেরা যদিও ধ্বনিস্তরকে ভাষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব'লে মনে করেন, তবু আর্থস্তরটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এটি সবচেয়ে বিমূর্তও। 'অর্থ' সম্পর্কে বিতর্ক চলছে জেসাসের জন্মেরও আগে থেকে, উদঘাটিত হয়েছে অর্থের অনেক দিক, তবুও এখনো এটিই ভাষার সবচেয়ে বিব্রতকর এলাকা। অন্যান্য স্তর

বর্ণনার বা সৃষ্টির বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বপ্রণালিপদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে, কিন্তু আর্থস্তরটি এখনো অস্বস্তিতে রেখেছে ভাষাবিজ্ঞানীদের। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা খুবই হতাশ ছিলেন অর্থ সম্পর্কে; তাঁদের এক প্রধান পুরুষ ব্লুমফিল্ড মনে করেছিলেন যে সমগ্র মহাজগত পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মতরূপে বর্ণনার আগে বিজ্ঞানসম্মতভাবে অর্থ ব্যাখ্যা সম্ভব হবে না। ভাষার আর্থস্তরটিকে তিনি সমর্পণ করেছিলেন মহাকালের হাতে। তবে মানুষ ভাষা ব্যবহার করে, শব্দের অর্থ বোঝে, এবং বাক্যের সাহায্যে অর্থ প্রকাশ করে, ও অন্যের সংজ্ঞাপিত অর্থ বোঝে। তাই অর্থকে মহাকালের হাত থেকে ফিরিয়ে আনা যায় নিজেদের হাতে; উদ্যোগ নেয়া যায় আর্থস্তরটি ব্যাখ্যার। দু-হাজারেরও বেশি বছর ধ'রে মানুষ এ-চেষ্টা ক'রে আসছে, এবং সুশৃঙ্খল তত্ত্ব দাঁড় করাতে না পারলেও শব্দ-বাক্য ও অর্থের নানা সম্পর্ক উদঘাটন করেছে। একটি প্রশ্ন তাদের ভাবিয়েছে, এবং বিপদে ফেলেছে যে 'অর্থ' কাকে বলে? অনেকে অবশ্য মনে করেন 'অর্থ কাকে বলে' বা 'অর্থ কী' —এমন প্রশ্ন না ক'রে প্রশ্ন করা উচিত 'অর্থের অর্থ কী?' দেখা গেছে 'অর্থে'র রয়েছে অনেক অর্থ;—'অর্থ' বলতে নির্দিষ্ট কোনো একটি ব্যাপার বোঝানো হয় না; অনেক ব্যাপার নির্দেশ করা হয় মাত্র একটি শব্দে—শব্দটি 'অর্থ'। সরলভাবে দেখলে ধরা পড়ে যে 'শব্দ' ও 'বাক্য' অর্থ প্রকাশ, জ্ঞাপন, বা নির্দেশ করে। কিন্তু একভাবে করে না। 'গাধা' শব্দটি যেভাবে একটি প্রাণী নির্দেশ করে, 'প্রেম' শব্দটি সেভাবে কোনো প্রাণী, বস্তু, সামগ্রী নির্দেশ করে না। কোনো কিছু দেখিয়ে বলা যায় না এটি হচ্ছে 'প্রেম'। শব্দটি বোঝায় একটি বিমূর্ত আবেগ, বোধ বা ধরণা। বিভিন্ন শব্দের সাথে অর্থের সম্পর্কের রীতি বিভিন্ন। শব্দ ও অর্থের মূল সম্পর্কটি অবশ্য আকস্মিক বা স্বেচ্ছাচারী;—চারটি ধ্বনিতে গঠিত 'গাধা' ও চতুষ্পদ 'গাধা'র মধ্যে কোনো সহজাত সম্পর্ক নেই। তবে অনেকে, যেমন কবি কালিদাস, মনে করেন যে শব্দ ও অর্থের সম্পর্ক শাশ্বত। এ-সম্পর্ক শাশ্বত নয়, বিবাহের মতোই তা আকস্মিক; যে-কোনো সময় তা নষ্ট হ'তে পারে। আবার একটি শব্দ যে একটি অর্থই প্রকাশ করে, তা নয়; প্রকাশ করে একাধিক অর্থও, এবং একাধিক শব্দও প্রকাশ করে এক অর্থ। শব্দের থেকে বড়ো সংগঠন হচ্ছে বাক্য; এবং বাক্য অর্থ প্রকাশ করে। বুঝতে পারি বাক্যের পদগুলোর অর্থের সমষ্টি হচ্ছে বাক্যের অর্থ। বাক্য কতো ধরণের অর্থ প্রকাশ করে? বিভিন্নজন বিভিন্ন মত পোষণ করেন এ-বিষয়ে। অর্থবিজ্ঞানী জিওফ্রে লিস সাত ধরনের অর্থের কথা বলেছেন : ধারণাগত অর্থ, স্বভাবগত অর্থ, শৈলীগত অর্থ, আনুভূতিক অর্থ, প্রতিফলিত অর্থ, সন্নিবেশিত অর্থ, বিষয়বিন্যাসগত অর্থ। যুক্তিশাস্ত্রানুসারে অর্থকে বিন্যাস করা সম্ভব নানা শ্রেণীতে। রূপান্তমূলক সৃষ্টিশীল অর্থবিজ্ঞানে প্রতিটি শব্দের অর্থকে বিবেচনা করা হয় একগুচ্ছ বাক্যিক ও আর্থবৈশিষ্ট্যের সমাহাররূপে। ধরা যাক 'তরুণী' শব্দ। এটিকে মনে করতে পারি 'মানুষ, নারী, আঠারো থেকে ত্রিশ বছর বয়স্ক' এ-তিনটি বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি ব'লে। পুরোনো ভারতে, গ্রিসে, পারস্যে অর্থের একটি দিক নিয়ে বেশ তর্কবিতর্ক হয়েছিলো; ওই বিতর্কটি আবার দেখা গেছে ষাট-সত্তরের দশকে। বাক্যের অর্থকে কি হ'তেই হবে সঙ্গতিপূর্ণ? কোনো বিসঙ্গত, অসম্ভব, চিরঅসম্ভব কথা কি বলা যাবে না? চমস্কির একটি বিশ্ববিখ্যাত বাক্য—'কালারলেস

গ্রিন আইডিয়াস স্লিপ ফিউরিয়াসলি'—নতুন ক'রে সূচনা করে সঙ্গতিবিতর্কটি। একটি সমাধানও বেরিয়ে আসে। যদি বলি, 'আমি গতকাল আসবো', 'আগামী বছর আমি বিলেতে গিয়েছিলাম', 'প্রত্যেক তরুণীর দশটি জিভ ও পাঁচ শো ওষ্ঠ রয়েছে', 'আমার টাউজারটি দুটি কৃষ্ণগহ্বর শেলাই ক'রে তৈরি করা হয়েছে', 'কেতকী একটি পাঠ্যপুস্তক, তবে পুরোপুরি অপাঠ্য', তাহলে কি বাক্য গ্রহণযোগ্য হবে না? ওপরের বাক্যগুলোতে কোনো বাক্যিক ত্রুটি নেই, রয়েছে আর্থ বিসঙ্গতি। সবাই এখন একমত যে এ-ধরনের বিসঙ্গত বাক্য অবশ্যই সৃষ্টি হবে, বিসঙ্গতির মাত্রাও পরিমাপ করা হবে। এ-ধরনের বাক্য যারা অবিরাম সৃষ্টি করে, তাদের ভাষাবিজ্ঞানীদের কাছে পাঠাতে হবে না, পাঠাতে হবে প্রকাশকের কাছে, বা মনোচিকিৎসা নিকেতনে।

ভাষা ও চিন্তা

ভাষা ও চিন্তার মধ্যে রয়েছে গভীর সম্পর্ক; তবে কার ভূমিকা প্রধান? অধিকাংশ মানুষই মনে করে চিন্তাই প্রধান; চিন্তা প্রকাশের মাধ্যম হচ্ছে ভাষা। স্যামুয়েল জনসনের মতে, 'ভাষা হচ্ছে চিন্তার পোশাক।' অর্থাৎ ভাষার ভূমিকা সমান্য, তা শোভামাত্র। আরেকটি মত অনুসারে ভাষাই প্রধান। শেলি লিখেছেন, 'তিনি মানুষকে দিয়েছেন ভাষা, আর ভাষা সৃষ্টি করেছে চিন্তা।' চিন্তা কী, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে;—কারো মতে চিন্তা হচ্ছে বিমূর্ত মানসক্রিয়া, আর মনোবিজ্ঞানী ওয়াটসনের মতে চিন্তাও এক ধরনের আলাপ, তবে গোপন পেশির আলাপ। যখন চিন্তা করি বা ভাবি, তখন মনে হয় আমরা মনে মনে আলাপ করছি; এমনকি ওই আলাপের ধ্বনিও শুনছি ব'লে মনে হয়। ভাষা ছাড়া চিন্তা করা যায় না, তা নয়; তবে ওই চিন্তা হয়ে ওঠে খণ্ড খণ্ড চিত্রের মতো এলোমেলো হয়ে ওঠে কিছুক্ষণের মধ্যেই; যুক্তিসঙ্গত, বক্তব্যধর্মী চিন্তা করার জন্যে ভাষা অপরিহার্য। চিন্তা ভাষা নয়, ভাষাও চিন্তা নয়; তবে চিন্তার কোনো মূর্ত রূপ নেই, তা প্রকাশ পায় ভাষামাধ্যমেই। অনেকে মনে করেন চিন্তায় ভাষার ভূমিকা খুবই প্রবল; এতো প্রবল যে ভাষা নিয়ন্ত্রণ করে ভাষীদের বিশ্বদৃষ্টিও। এ-মতানুসারে বিভিন্ন ভাষী বিশ্বপ্রপঞ্চরাশিকে অবিকল একভাবে দেখে না, দেখে তাদের ভাষার কাঠামোর ভেতর দিয়ে। বিভিন্ন ভাষার সংগঠন যেহেতু বিভিন্ন, এমনকি অনন্য, তাই বিভিন্ন ভাষাভাষীদের বিশ্বদৃষ্টিও অনন্য ও বিভিন্ন। এ-মত পরিচিত 'স্যাপির-হোর্ফ প্রকল্প' নামে। এ-প্রকল্প দুটি সিদ্ধান্তের সমষ্টি : একটিকে বলা হয় 'ভাষিক নিয়তিবাদ বা নিয়ন্ত্রণবাদ', অন্যটিকে বলা হয় 'ভাষিক আপেক্ষিকতাবাদ'। ভাষিক নিয়তিবাদের মূল কথা হচ্ছে ভাষা নিয়ন্ত্রণ বা স্থির করে চিন্তাকে; আর ভাষিক আপেক্ষিকতাবাদের মূলকথা হচ্ছে প্রতিটি ভাষার সংগঠন অনন্য। চরমরূপে এ-দুটির কোনোটিই গ্রহণযোগ্য নয়, তবে নরমরূপে বেশ গ্রহণযোগ্য। যদি ধ'রে নিই যে প্রতিটি ভাষার সংগঠন অনন্য, তাই ওই ভাষাভাষীদের বিশ্বদৃষ্টিও অনন্য; তবে এক ভাষীর পক্ষে অন্য ভাষা আয়ত্ত অসম্ভব হয়ে পড়ে; কেননা তাতে তার বিশ্বদৃষ্টিই বদলে যায়। বাস্তবে এমন ঘটে না। বাঙলা থেকে দু-একটি উদাহরণ দেখা যাক। 'মদ' শব্দটি বাঙলায় অ্যালকোহলমিশ্রিত সব ধরনের পানীয় বোঝায়; সাধারণ

বাঙালির কাছে হুইস্কি, বিয়ার, ব্রান্ডি, ওয়াইন সবই মদ; কিন্তু ইউরোপিদের এমন একটি শব্দ নেই, যা জাতিবাচকভাবে সব সুরা বোঝাতে পারে। বাঙালির চোখে সবই মদ, কিন্তু ইউরোপিদের চোখে এগুলো বিভিন্ন। 'চাবি দরজাটি খুললো' বাক্যটি বাঙলায় স্বাভাবিক নয়, স্বাভাবিকভাবে বাক্যটি হবে 'চাবি দিয়ে দরোজাটি খোলো হলো'। বাঙালির বোধে চাবি দরজা খুলতে পারে না, পেছনে সক্রিয় কারো থাকা দরকার; কিন্তু ইংরেজিতে 'দি কি ওপেন্ড দি ডোর' খুবই স্বাভাবিক।

ভাষা, মানভাষা, উপভাষা ও ভাষিক বৈচিত্র্য

কোনো একটি ভাষাকে যখন 'ভাষা' বলা হয়, তখন আসলে কী বোঝানো হয়? এ নিয়ে তর্কের শেষ নেই। এক সময় কোনো সম্ভ্রান্ত ভাষাকেই অভিধা দেয়া হতো 'ভাষা' (বাঙলায় 'ভাষা' শব্দটি অবশ্য মূলত সম্ভ্রান্ত নয়)। যখন বলি 'বাঙলা ভাষা' তখন কী বুঝি আমরা? উনিশশতকের মাঝভাগে থেকে বিশশতকের মাঝভাগ পর্যন্ত অনেকের কাছে 'সাধুরীতি'টিই ছিলো বাঙলা ভাষা, এখন অনেকের কাছে 'চলতি রীতি'টিই বাঙলা ভাষা। তবে সাধু বা চলতি বাঙলা ভাষার দুটি রূপ বা রীতি। বাঙলা ভাষা বলতে বুঝবো বাঙলা ভাষার সমস্ত ভাষিক বৈচিত্র্য—বাঙলা ভাষার সব রূপই অন্তর্ভুক্ত বাঙলা ভাষায়। ভাষা শব্দটি ব্যাপকতা নির্দেশ করে। ভাষার কিছু রূপকে বলা হয় উপভাষা। উপভাষা বলতে প্রধানত আঞ্চলিক রূপগুলোকেই বোঝানো হয়; তবে অনেক সময় ভাষা ও উপভাষার পার্থক্য নির্দেশ করা হয় রাজনীতিকভাবেও। যেমন, নরওয়েয়ীয়, সুইডেনি, ডেনীয় প্রভৃতিকে ভাষা বলা হয় রাজনীতিক কারণে, ওগুলো একেকটি স্বাধীন দেশের ভাষা ব'লে; নইলে উপভাষা বলেই গণ্য হ'তে পারে। আবার চীনের পরস্পরঅবোধ্য বিভিন্ন উপভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এক চীনাভাষায়, কারণ সেগুলো একই বর্ণমালায় লেখা হয়, ও চীনের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীরা বুঝতে পারে। ভাষার একটি রূপকে বলা হয় 'মানভাষা', যার সাথে উপভাষাগুলোর সম্পর্ক ও সংঘর্ষ এক স্বাভাবিক ঘটনা। মানভাষাও একটি উপভাষা বা রীতি, যা বিশেষভাবে বিকশিত হয়েছে বা যাকে সচেতনভাবে বিকশিত করা হয়েছে। উপভাষাকে বলা হয় অবিকশিত ভাষা। সাধারণত রাজধানির বা কোনো শক্তিশালী শ্রেণীর ভাষা মানভাষারূপে বিকশিত হয়। বাঙলায় দুটি মানভাষাই বিকশিত হয়েছিলো কলকাতায়; উনিশশতকে বাঙালির সচেতন প্রয়াসে বিকশিত হয় সাধুরীতিটি, আর বিশশতকে সচেতন প্রয়াসে বিকশিত হয় চলতি রীতিটি। চলতি রীতিটি এখন অনেকের কাছে বাঙলা ভাষা; তবে এটিও একটি উপভাষা, যা বিকশিত হয়েছে। প্রতিটি ভাষায়ই মানভাষা, উপভাষা ছাড়াও নানা রীতি থাকে। সেগুলোকে বলা হয় সামাজিক উপভাষা। ভাষার বিশেষ একটি রূপকে বলা হয় পেশাভাষা। সামাজিক ভাষা কোনো বিশেষ এলাকার ভাষা নয়, তা আঞ্চলিক উপভাষা নয়; বিশেষ সামাজিক শ্রেণী গ'ড়ে তোলে ভাষার ওই রূপটি। পেশাভাষায়, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় *রেজিস্টার*, প্রবলভাবে দেখা দেয় পেশাগত শব্দাবলি—যেমন, কেরানির বা উকিলের বা চিকিৎসকের বিশেষ ধরনের ভাষা। সামাজিক ভাষা নির্দেশ করে বক্তার সামাজিক শ্রেণী; পেশাভাষা নির্দেশ করে তার পেশা।

মানুষ ভাষা ব্যবহার করে; এবং মানুষ সামাজিক প্রাণী। ভাষায় খচিত হয় তার সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতির সব কিছু। মানুষের ভাষায় যেমন ছাপ পড়ে ব্যক্তির, তার কামনাবাসনাস্বপ্নের, তারই মতো, এবং তার চেয়ে অনেক বেশি ছাপ পড়ে সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতির। প্রতিটি সমাজ বহু মানুষের, বহু শ্রেণীর, ও অনন্ত বৈচিত্র্যের সমষ্টি; আর ওই সমাজের ভাষায় খচিত হয় তার সমস্ত বৈচিত্র্য; সমাজের সমগ্র জীবন। সমাজের বিশ্বাসঅবিশ্বাস, তার শ্রেণীসাম্য ও বৈষম্য, তার রাজনীতিক প্রবণতা, তার পাপপুণ্য, সাফল্যব্যর্থতা সমস্ত কিছুই ভাষার শরীরে (ও আত্মায়, যদি ভাষার আত্মা কল্পনা করতে পারি) সুস্পষ্ট ছাপ ফেলে। কোনো ভাষাসমাজই সুষম ভাষাসমাজ নয়; এমনকি ঘনিষ্ঠতম দুজন, প্রেমিকপ্রেমিকা বা স্বামীস্ত্রীও, একশো ভাগ অভিন্ন ভাষা সমাজের অধিবাসী নয়। সমাজের ছাপ লক্ষ্য করা যায় ভাষার ধ্বনি-উচ্চারণে ও ধ্বনি শৃঙ্খলায়, ভাষার শব্দসম্ভারে, বাক্যসংগঠনে, ও অর্থে। উচ্চারণের কথাই ধরা যায়। বাঙলাদেশের চলতি মান উচ্চারণ খুব কম সংখ্যক বাঙালিরই আয়ত্তে রয়েছে; চলতি উচ্চারণে বিভিন্ন আঞ্চলিক টান নিয়মিত শোনা যায়। বরিশাল, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও সিলেটের টান খুবই প্রসিদ্ধ;—এগুলো আঞ্চলিক রূপে ঠিকই আছে, কিন্তু চলতিতেও যখন শোনা যায়, তখন ভাষীর শ্রেণী পরিচয় ধরা পড়ে। বাঙলাদেশে এখনো ভাষিক উচ্চশ্রেণী বিকশিত হয় নি;—বাঙলাদেশে আর্থ উচ্চশ্রেণীটি এখনো গ্রাম্য, যা তাদের উচ্চারণে ধরা পড়ে। শব্দ প্রয়োগেও বিচিত্র শ্রেণীরূপ দেখা যায়। মুজিবের ঐতিহাসিক 'দাবায়ে রাখতে পারবা না' উচ্চারণে ও রূপতত্ত্বে তাঁর বিশেষ শ্রেণী ও ব্যক্তিসত্তা নির্দেশ করে। 'যাই নি, খাই নি'র বদলে 'যাই নাই', 'খাই নাই'-এ বক্তার শ্রেণী পরিচয় ধরা পড়ে। বাঙলা সর্বনামে ধরা পড়ে বাঙলার তিনটি সামাজিক শ্রেণী। 'আপনি', 'তুমি', 'তুই' সম্বোধন যেভাবে ব্যবহৃত হয়, তাতে 'ক্ষমতা ও সংহতি'র সম্পর্ক ধরা পড়ে চমৎকারভাবে। পারস্পরিকভাবে যারা 'আপনি' ব্যবহার করে, বোঝা যায় তারা ওপরে আছে, উভয়েই সমান, তাদের মধ্যে সংহতি ঘটে নি। পারস্পরিক 'আপনি-তুমি' সম্বোধন যারা করে, বোঝা যায় দ্বিতীয়জন ক্ষমতাসম্পন্ন আর প্রথমজন তার অধীন; যারা 'তুমি-তুমি' সম্বোধন করে, তারা খুবই সংহত। 'তুই-তুই' সম্বোধনে ক্ষমতার চিহ্নমাত্র থাকে না, সংহতি দৃঢ়তম। বাল্যকাল থেকে গ'ড়ে উঠেছে এ-সংহতি। সম্বোধনের এ-স্তরক্রমে ওপর থেকে নিচের দিকে নামা স্বাভাবিক, নিচ থেকে ওপরের দিকে ওঠা অস্বাভাবিক। 'আপনি-আপনি' একসময় 'তুমি-তুমি' হয়ে উঠতে পারে; তবে 'তুমি-তুমি' সাধারণত 'আপনি-আপনি' হয়ে ওঠে না, উঠলে বুঝতে হবে দুর্ঘটনা ঘটেছে বড়ো রকমের। 'তুই-তুই' থেকে 'তুমি-তুমি'তে ওঠার ঘটনা বিরল নয়। 'তুই-তুই' 'তুমি-তুমি' হয়ে ওঠে বিচ্ছিন্নতা ও ঘনিষ্ঠতাবশত : দুই বাল্যবন্ধু দীর্ঘ সময় বিচ্ছিন্ন থাকলে 'তুমি-তুমি'তে যায়, আর 'তুই-তুই' সম্পর্কের বালকবালিকারা যখন প্রেমিকপ্রেমিকা হয়ে ওঠে তখন হয় তারা 'তুমি-তুমি'। নারীবাদ এখন একটি প্রবল বিশ্বজনীন আবেদনজাগানো ব্যাপার। দ্রোহী নারীবাদীরা দেখিয়েছে যে

পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাই প্রচণ্ড লিঙ্গবাদী; প্রতিটি ভাষা নারীদের শোষণ ও সম্ভোগের পাপ বহন করে। তারা 'চেয়ারম্যান', 'ম্যানকাইন্ড' প্রভৃতি তো বটেই, এমনকি 'হিস্ট্রি', 'ম্যানহোলে' ও লিঙ্গবাদের পরিচয় পেয়েছে। প্রতিটি ভাষা ঘেঁটে দেখানো যায় নারীরা ভাষায় কতো উপেক্ষিত ও অপমানিত। বাঙলায় 'যুবতী', 'স্ত্রীলোক', 'মেয়েমানুষ', 'রমণী', 'কামিনী' অপমানসূচক ও কামনাঘন; 'লেখিকা', 'মহিলা কবি' আপত্তিকর; 'অভিনেত্রী পতিতার মতো শোনায় ব'লে 'শিল্পী' ব্যবহৃত হচ্ছে এর বদলে। বাঙলায় লিঙ্গচেতনা খুব তীব্র। বলতে হয় 'ছাত্র/ছাত্রী—'ছাত্র' বললেই চলে, আমি ব'লেও থাকি, কিন্তু তাতে ছাত্রীরাও সাড়া দেয় না। 'অভিনেত্রী', 'গায়িকা', 'বালিকা' প্রভৃতির বদলে দু-লিঙ্গের প্রাণীদেরই যদি 'অভিনেতা', 'গায়ক', 'বালক' বলা হয়, তাহলে কি চলবে না? 'সুচিত্রা আমার প্রিয় অভিনেতা', 'সন্ধ্যা আমার প্রিয় গায়ক', 'ওই মেয়েটি এক আকর্ষণীয় বালক' বললে কি অস্বাভাবিক বা স্ববিরোধী মনে হবে? একটি রাজনীতিক দল বিপদে প'ড়ে তৈরি করেছিলো 'যুব মহিলা দল'—তাদের প্রথম মনে হয়েছিলো বিশেষ একশ্রেণীর মহিলা, উভলিঙ্গ, যাদের প্রজনন ঘটেছিলো রাজনীতিক প্রয়োজনে। সমাজ দুশ্চরিত্র হ'লে শব্দসম্ভারে তার ছাপ পড়ে। বাঙলাদেশের সমাজ দুশ্চরিত্র ব'লে অধিকাংশ সদর্থক শব্দ কদর্থক হয়ে উঠছে। 'রাজনীতিবিদ'—এর অর্থ হয়ে উঠেছে 'প্রতারক, ভণ্ড'; 'পীর' এর অর্থ হচ্ছে 'ভণ্ড, প্রতারক'; 'সৎ'—এর অর্থ হচ্ছে 'দুর্বল'; 'শক্তিমান'—এর অর্থ হচ্ছে 'স্বেচ্ছাচারী'; 'ভদ্রলোক'—এর অর্থ হচ্ছে 'কপট, বিনয়ী, সুবিধাবাদী' ইত্যাদি। বাঙলা ভাষার অধিকাংশ সদর্থক শব্দের অভিধান নতুনভাবে প্রণয়নের সময় এসে গেছে। সামরিক শাসন দশকের পর দশক ধ'রে থাকলে ভাষায় তার ছাপ পড়বেই। 'সৈনিক' শব্দটি এখন প্রায় লুপ্ত, কোনো অর্থও প্রকাশ করে না; তার স্থান নিয়েছে 'মিলিটারি'। 'মহামান্য', 'মাননীয়', 'মহাপরিচালক' প্রভৃতি শব্দের প্রাচুর্য ঘটছে আজকাল, 'মহা'র প্রতি মোহ বেড়েছে; এতেই বোঝা যায় একদল জিহোভার মতো স্বৈরাচারী, আরেকদল দাস। আজকাল পশ্চিমে ভাষা ও সমাজের সম্পর্ক উদঘাটিত হচ্ছে ব্যাপকভাবে। বাঙলা ভাষা সমাজভাষাবিজ্ঞানের জন্যে এক আকর্ষণীয় এলাকা।

শুদ্ধতা, শুচিতা ও ভাষার অসুখ

ভাষার শুদ্ধতা, অশুদ্ধতা, শুচিতা সম্পর্কে বিতর্ক দু-সহস্রকেরও বেশি পুরোনো। ভারতে ও গ্রিসে ব্যাকরণের উদ্ভবই ঘটেছিলো ভাষার শুদ্ধতা, এমনকি শুচিতা রক্ষার আবেগ থেকে। কিন্তু শুদ্ধতা ও শুচিতা কাকে বলে? যা একজনের কাছে অশুদ্ধ ও অশুচি, তা আরেকজনের কাছে শুদ্ধ ও শুচিতাপূর্ণ। অনেকে আবার ভাষার বিশেষ একটি রূপকেই শুধু অশুদ্ধ মনে করে না, পুরো ভাষাটিকেই হয়তো অশ্রদ্ধা করে। এর চরম প্রকাশ দেখা যায় জর্মনির পঞ্চম চার্লসের উক্তিতে। সে নাকি বলেছিলো, 'আমি পুরুষদের সাথে ফরাশিতে, নারীদের সাথে ইতালীয়তে, ঈশ্বরের সাথে স্পেনীয়তে, আর অশ্বের সাথে জর্মন ভাষায় কথা বলি।' এককালে ধ্রুপদী ভাষাগুলো—বৈদিক বা সংস্কৃত, গ্রিক, লাতিন—ছিলো শুদ্ধতার উদাহরণ। কারণ এগুলো ছিলো স্থির, সুস্থিত,

সুশৃঙ্খল, ও মানবদ্ধ। পরিবর্তন যদিও ভাষার স্বভাব, তবুও অনেকের কাছে পরিবর্তনকেই মনে হয়েছে ভাষার বিকার ব'লে। অনেকে ভাষায় দেখতে চেয়েছেন যৌক্তিক শৃঙ্খলা, আর শৃঙ্খলার অভাবকেই মনে করেছেন অশুদ্ধতা ব'লে। ভাষার শৃঙ্খলা, শুদ্ধতা, শুচিতা রক্ষার জন্যে দিকে দিকে গ'ড়ে উঠেছে একাডেমি; তার মাঝে ইতালির আকাদেমিয়া দেল্লা ক্রুস্কা (১৫৮২), ও ফরাশি একাডেমি (১৬৩৫) বিশ্ববিখ্যাত। বাঙলা ভাষার শুদ্ধতাশৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে প্রথম একাডেমির প্রস্তাব করেছিলেন জন বিম্‌স্ (১৮৭২), এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ (১৮৯৩)। আঠারোশতকে ইংরেজি ভাষার শুদ্ধতা প্রতিষ্ঠার জন্যে একাডেমি স্থাপনের প্রস্তাব করেছিলেন সুইফট; এবং জনসন ইংরেজি ভাষার অভিধান রচনা ক'রে পরিতৃপ্ত করেছিলেন ইংরেজের কামনা ও অহমিকা। অনেক ভাষাসম্প্রদায় শুধু শুদ্ধতায় নয়, শুচিতায়ও বিশ্বাস করে। তাদের বিশ্বাস মিশ্রণ ভাষাকে দূষিত বা অশুচি করে। ফরাশিরা ও জর্মনরা এ-বিষয়ে চির উদ্বিগ্ন;—যাতে বিদেশি শব্দ তাদের ভাষায় ঢুকে না পড়ে, সেজন্যে তারা থাকে প্রায় বিনিদ্র। ১৯৭৭-এ ফরাশিদেশে একটি আইন প্রণীত হয়, সরকারি রচনায় ও দোকানপাটের নামে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়, দণ্ডেরও ব্যবস্থা করা হয়। এতোটা কঠোরতা বাড়াবাড়ি মনে হ'লেও কোনো ভাষায় বিদেশি শব্দের আগ্রাসন ঘটলে ভাষাটির ক্ষতি হয়, জাতির চিন্তাশক্তিও ব্যাহত হয়। *ভাষাসাম্রাজ্যবাদ* নামী একটি ধারণা এখন বিকশিত হচ্ছে। এ-ধারণার সাহায্যে দেখানো যায় যে রাজনীতিক সাম্রাজ্যবাদের সাথী হচ্ছে ভাষাসাম্রাজ্যবাদ; তা আগ্রাসিত জাতি ও তার ভাষাকে পর্যুদস্ত করে। বাঙলা ভাষায় বিদেশি শব্দ ভাষাসাম্রাজ্যবাদী প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করেছে। শুদ্ধতার ধারণাটি নিয়ে বিতর্ক থাকলেও, শুদ্ধতাঅশুদ্ধতা যে পুরোপুরি অবাস্তব, তা নয়। নানাভাবে একটি ভাষাশৃঙ্খলা ব্যাহত হ'তে পারে—ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, বাক্যিক, আর্থ সমস্ত এলাকায়ই বিনষ্ট হ'তে পারে শৃঙ্খলা। চলতি বাঙলা ভাষায় শৃঙ্খলা এখন নানাভারেই ব্যাহত।

ভাষার কি অসুখ হ'তে পারে? অনেকেই বলেন, হ'তে পারে। আগে যা ছিলো শুদ্ধতাঅশুদ্ধতার ব্যাপার, এখন তা দেখা দিয়েছে আরো গভীর ব্যাধিরূপে। ভাষার এ-ব্যাধি নিয়ে উদ্বিগ্ন বহুজন, তাঁদের প্রধান জর্জ অরওয়েল। তিনি বার বার ইংরেজি ভাষার ব্যাধি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন; ইংরেজিকে ব্যাধিমুক্ত রাখার জন্যে জানিয়েছেন আবেদন। তিনি দেখিয়েছেন আধুনিক কালে 'জারগ্যন'-এর ব্যবহার এতো বেরেছে যে ভাষা দুর্বোধ্য হ'তে হ'তে নিরর্থক হয়ে উঠেছে। এখন ভাষার সাহায্যে পারস্পরিক সংজ্ঞাপনই অনেকটা অসম্ভব। একনায়কত্ব ভাষাকে কতোটা বিমানবিক, নিরর্থক ও প্রতারক ক'রে তুলতে পারে, তা দেখানোর জন্যে তিনি *উনিশশো চুরাশি* উপন্যাসে 'নিউস্পিক' নামক এক ভয়াবহ ভাষার রূপতাত্ত্বিক ব্যাকরণই লিখেছিলেন। ওই ভাষা বিমানবিক ও মিথ্যার ভাষা। জারগ্যনকে তিনি দেখিয়েছেন ভাষার মারাত্মক অসুখরূপে। পশ্চিমে সমাজ-রাষ্ট্র-অর্থ-মনো ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা মানবিক মূর্ত শব্দসম্ভার ছেড়ে আশ্রয় নিয়ে থাকেন জারগ্যনের, যা নিরর্থক মনে হয় অন্যদের কাছে। জারগ্যনের ব্যবহারে জীবনের মানবিক সত্য কতোটা অমূর্ত ও বিমানবিক হ'তে পারে

অরওয়েল বাইবেলের একটি বাক্যকে জারগ্যনকবলিত ইংরেজিতে অনুবাদ ক'রে দেখিয়েছেন। ব্যাপারটি মনকে আলোকিত করে ব'লে এখানে অরওয়েলের উদাহরণ আমি বাঙলায় অনুবাদের চেষ্টা করছি। বাইবেলে আছে :

> আমি ফিরে এলাম এবং সূর্যের নিচে দেখলাম, এমন নয় যে দ্রুতগামী জয়ী হয় দৌড় প্রতিযোগিতায়, বা শক্তিশালী বিজয়ী হয় যুদ্ধে, বা জ্ঞানী লাভ করে খাদ্য, বা মেধাবী লাভ করে ঐশ্বর্য, বা দক্ষরা লাভ করে অনুগ্রহ; কিন্তু সময় ও সুযোগেই এসব ঘটে।

অরওয়েল এ-বাক্যটি অনুবাদ করেছিলেন যে-জারগ্যনগ্রস্ত ইংরেজিতে, তার বাঙলারূপ :

> সাম্প্রতিক প্রপঞ্চের তন্ময় বিবেচনা সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে যে প্রতিযোগিতামূলক কর্মকাণ্ডে সাফল্য ও ব্যর্থতা এমন কোনো প্রবণতা নির্দেশ করে না যে তা সহজাত যোগ্যতার সাথে সমপরিমাণিক হবে, কিন্তু যে অভাবিতের প্রচুর পরিমাণ উপাদানকে প্রতিনিয়তই বিবেচনার মধ্যে গ্রহণ করতে হবে।

বাইবেল থেকে জারগ্যন হচ্ছে মূর্ত ও মানবিকতা থেকে অমূর্ত ও বিমানবিকতায় পতন। বাঙলা অবশ্য এখনো জারগ্যনগ্রস্ত হয় নি; হয় নি যে এটাও এক সমস্যা। এমন ভাষাকে অসুস্থ ভাষাই বলা যায়। স্টেইনার *ভাষা ও নীরবতায়* দেখিছেন জারগ্যন ভাষাকে এমন করে তুলেছে যে মানুষ ও কবিরা এক সময় ভাষার সাহায্যে সংজ্ঞাপন করা থেকেই বিরত হবে। হিটলারের কালে জর্মন ভাষা কতোটা ব্যাধিগ্রস্ত ও বন্ধ্যা হয়ে উঠেছিলো, তার ভীতিকর বিবরণ দিয়েছেন তিনি। তাই ভাষাও অসুস্থ হয়; ভাষার শরীরে ও আত্মায় ওই অসুখ সংক্রামিত করে মানুষেরাই।

AMARBOI.COM

মান বাঙলা উচ্চারণ ও উচ্চারণ অভিধান

কোনো ভাষা তার সমগ্র এলাকা জুড়ে একরূপ হয় না;—তার থেকে নানা আঞ্চলিক বৈচিত্র্য ও বিভিন্ন শ্রেণিক চারিত্র্য, তবে ওই সমস্ত বৈচিত্র্য পেরিয়ে থাকে তার এমন একটি রূপ, যা সর্বাঞ্চলিক। ওই রূপকে বলা হয় *মান* বা *প্রমিত ভাষা*। মানভাষা ব্যবহৃত হয় শোভন পরিবেশে, সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চায়, রাষ্ট্রপরিচালনায়; অর্থাৎ সে-সব কাজে, যা সর্বাঞ্চলিক। উনিশশতকের আগে বাঙলা ভাষার কোনো মানরূপ ছিলো না। উনিশশতকে বাঙালির দরকার পড়ে একটি মানরূপের; এবং আধশতকের সাধনায় বাঙালি বিধিবদ্ধ করে বাঙলা ভাষার একটি মানরূপ, যার নাম সাধুভাষা বা সাধুরীতি। সাধুরীতিটি বেশ দক্ষ ছিলো, কিন্তু তার ছিলো একটি বড়ো ত্রুটি;—সাধুরীতিটি সাক্ষর ছিলো, কিন্তু সবাক ছিলো না। সাধুরীতিটি ছিলো লেখ্যরীতি, তা কথ্য ছিলো না; তাই তার পক্ষে অসম্ভব ছিলো জীবনের সমস্ত দায়িত্ব পালন করা। তাই উনিশশতকেই বাঙালির দরকার হয়েছিলো এমন একটি ভাষারীতি, যা সম্পন্ন করতে পারে জীবনের সমস্ত কাজ। উনিশশতকের মাঝামাঝি সময়ে ওই রীতিটি দেখা দেয় চলতি রীতির রূপ ধরে; তবে সাধারীতিটিকে হটাতে তার বেশ সময় লাগে। কোনো নতুনকেই মানুষ প্রথম সাদর অভ্যর্থনা জানায় না; কিন্তু সে যদি হয় শক্তিশালী, তবে তাকে একসময় বরণ ক'রে নেয়। চলতি রীতিকেও বরণ ক'রে নিতে হয়েছে, কারণ তার রয়েছে জীবনের সব দায়িত্ব সম্পন্ন করার শক্তি। চলতি রীতি সাক্ষর ও সবাক;—তা লিপিবদ্ধ হ'তে পারে, এবং উচ্চারিত হ'তে পারে কণ্ঠ থেকে। তাই ভাষিক যোগাযোগের মাধ্যমরূপে চলতি রীতি অনেক দক্ষ সাধুরীতির থেকে। আজ বাঙলা ভাষা বলতে চলতি রীতিকেই বুঝি আমরা, যদিও কখনো ভুলি না যে বাঙলা ভাষার রয়েছে বিচিত্র আঞ্চলিক শোভা। বাঙলা ভাষার মানরূপ হচ্ছে চলতি বাঙলা ভাষা।

প্রতিটি ভাষার মানরূপকে বিধিবদ্ধ হ'তে হয় সুষ্ঠুভাবে, এবং তাকে অর্জন করতে হয় নমনীয় সুস্থিতি, যাতে সম্ভব হয় তার বিচিত্র বিকাশ। একশো বছরেরও বেশি সময়ের মৌখিক ও লিখিত চর্চার ফলে চলতি বাঙলা ভাষার অবয়ব-পরিকল্পনার কাজটি যেমন সম্পন্ন হয়েছে, তেমনি নির্ধারিত হয়েছে তার অবস্থান। এ-রীতি আমাদের সবাক জীবনকে যেমন অধিকার করেছে, তেমনি দখল করেছে আমাদের লিপিবদ্ধ জীবনকে। শিক্ষিত শ্রেণী ভাষিক যোগাযোগের জন্যে ব্যবহার করে চলতি রীতিটি, বইপত্র ও সাহিত্য রচিত হয় চলতি রীতিতে; এবং দুটি শক্তিশালী সম্প্রচারমাধ্যম আশ্রয় করে চলতি রীতিকেই। আমাদের জীবনের কিছু পুরোনো ও প্রথাগত এলাকাই শুধু এখন সাধুরীতির অধিকারে। চলতি বাঙলা ভাষা এখন মোটামুটি সুষ্ঠুভাবে বিধিবদ্ধ, ও নমনীয়ভাবে সুস্থিত;—কিছুটা অস্থিরতা থাকা সত্ত্বেও তার বানানরীতি বেশ সুস্থিত, বিভিন্ন শব্দের রূপেও এসেছে মোটামুটি সুস্থিতি। কিন্তু একটি

এলাকায় মান বাঙলা বা চলতি বাঙলা বেশ অস্থির অস্থিত। সেটি তার উচ্চারণের এলাকা। প্রায় দু-শো বছর ধ'রে রচিত হচ্ছে বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ-অভিধান; কিন্তু কেউ তার উচ্চারণ বিধিবদ্ধকরণের উদ্যোগ নেয় নি। তবে সাধুরীতির উচ্চারণ নিয়ে খুব জটিল সমস্যা ছিলো না, কারণ ওই উচ্চারণ ছিলো বানাননির্ভর; কিন্তু জীবনের তীব্র চাপে কম্পিত চলতি রীতির উচ্চারণ বেশ বিব্রতকর। এ-রীতিতে উচ্চারণ প্রায়ই বানানকে বিচলিত ক'রে দেয়, এবং উচ্চারণকারীকে করে বিপর্যস্ত। এর উচ্চারণের এলাকায় যদি সুস্থিতি আসে, তবে মান বাঙলা ভাষা আধুনিক পৃথিবীর প্রধান মানভাষাগুলোর পংক্তিতে বিন্যস্ত হওয়ার অধিকারী হবে।

মানভাষা ও মান-উচ্চারণ মূলত হয়ে থাকে আঞ্চলিক, সামাজিক বা শ্রেণিক। বিশেষ একটি অঞ্চলের উপভাষা নানা করণে প্রাধান্য লাভ ক'রে হয়ে ওঠে মানভাষা, এবং ওই অঞ্চলের উচ্চারণ মর্যাদা পায় মান-উচ্চারণের। তবে ওই অঞ্চলের সবাই মানভাষা ও মান-উচ্চারণ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা নেয় না; নেয় একটি বিশেষ সামাজিক শ্রেণী, যার সদস্যরা সামাজিক সাংস্কৃতিকভাবে প্রভাবশালী। ওই প্রভাবশালী শ্রেণীটির উচ্চারণকে অন্যরা মেনে নেয় সুষ্ঠু ও সুন্দর ব'লে; এবং এক সময় তা সর্বাঞ্চলিক মান-উচ্চারণরূপে গৃহীত হয়। মান-উচ্চারণ কোনো রাষ্ট্রীয় বিধানের ফল নয়; তা সামাজিক বিবেচনা ও ভাষিক সৌন্দর্যবোধেরই ফল। তাই মান-উচ্চারণকে বলা হয় 'গৃহীত উচ্চারণ'। দেখা গেছে সাধারণত রাজধানির উপভাষাই হয়ে ওঠে মানভাষা, এবং তার উচ্চারণই গণ্য হয় মান বা গৃহীত উচ্চারণ রূপে। গ্রিক, ফরাশি, ইংরেজি প্রভৃতি মানভাষা ও মান-উচ্চারণ রাজধানির উপভাষা ও উচ্চারণ ভিত্তি ক'রেই গ'ড়ে ওঠে। চলতি বাঙলা ভাষার উন্মেষ, বিকাশ, সুস্থিতি লাভ ঘটে কলকাতাকে কেন্দ্র ক'রে। চলতি বাঙলা ভাষা ঠিক কোন অঞ্চলের উপভাষাভিত্তিক, তা আজো ভাষাবিজ্ঞানসম্মতভাবে নির্ণীত হয় নি। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসী ছিলেন রাজধ্বনিতত্ত্বে;—রাজধানির উপভাষাই সারা দেশের ভাষা হয়ে ওঠে ব'লে তিনি মনে করতেন। 'বাংলা উচ্চারণ' (১২৯৮) প্রবন্ধে তিনি বলেন, 'কলিকাতা-অঞ্চলের উচ্চারণকেই আদর্শ ধরিয়া লইতে হইবে। কারণ, কলিকাতা রাজধানী। কলিকাতা সমস্ত বঙ্গভূমির সংক্ষিপ্তসার।' 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' (১৩০৮) প্রবন্ধে তিনি বলেন, 'বর্তমানকালে কলিকাতা ছাড়া বাংলাদেশের অপরাপর বিভাগের উচ্চারণকে প্রাদেশিক বলিয়া গণ্য করাই সংগত।' তাঁর থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী (১৩০৮) : 'শৈশব হইতে শুনিয়া আসিতেছি, নবদ্বীপ ও তৎসন্নিহিত স্থানের প্রচলিত ভাষাই বিশুদ্ধ বাঙলা ভাষা। কলিকাতা রাজধানী হইলেও এখানে কোনো নির্দিষ্ট ভাষা নাই।' প্রমথ চৌধুরী 'বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাংলা ওরফে সাধুভাষা' (১৩১৯) প্রবন্ধে বলেন, 'ঢাকাই কথা এবং খাস-কলকাত্তাই কথা, অর্থাৎ সুতানুটির গ্রাম্যভাষা, দুয়েরই উচ্চারণ অনেকটা বিকৃত; সুতরাং ঢাকাই কিংবা খাস-কলকাত্তাই কথা পূর্বেও সাহিত্যে নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করতে পারে নি এবং ভবিষ্যতেও পারবে না।' তিনি মান কথ্য বাঙলার ভিত্তি হিশেবে নির্দেশ করেন যে-উপভাষাটিকে, তার নাম দিয়েছেন তিনি 'দক্ষিণদেশি'। 'নদিয়া শান্তিপুর প্রভৃতি স্থান, ভাগীরথীর উভয় কূল এবং

বর্তমান বর্ধমান ও বীরভূম জেলার পূর্ব ও দক্ষিণাংশ'কে তিনি নির্দেশ করেন 'দক্ষিনদে-" রূপে। রবীন্দ্রনাথ (১৯৩৮) পরিণত বয়সে বলেন, 'বিশেষ কারণে টস্‌কানি প্রদেশের উপভাষা সমস্ত ইটালির এক ভাষা ব'লে গণ্য হয়েছে। তেমনি কলকাতা শহরের নিকটবর্তী চারদিকের ভাষা স্বভাবতই বাংলাদেশের সকল দেশী ভাষা ব'লে গণ্য হয়েছে।' তিনি আরো স্পষ্ট ক'রে বলেছেন, 'যে দক্ষিণী বাংলা লোকমুখে এবং সাহিত্যে চ'লে যাচ্ছে তাকেই আমরা বাংলা ভাষা বলে গণ্য করব।' প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ 'চ'ল্‌তি ভাষার বানান'-এ (১৩৩২) 'কলিকাতা ও কলিকাতার কাছাকাছি নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানের শিক্ষিত লোকদের উচ্চারণকেই আধুনিক বাঙলার প্রামাণিক উচ্চারণ' ব'লে গণ্য করেছেন। প্রমথ চৌধুরী (১৩১৯) 'কলিকাতার ভদ্রসমাজের মুখের ভাষা'কেই মেনে নেন চলতি রীতির ভিত্তিরূপে। অর্থাৎ দক্ষিণদেশি—প্রমথ চৌধুরীকথিত নদিয়া, শান্তিপুর, ভাগীরথীর দু-কূল এবং বর্ধমান ও বীরভূম জেলার অংশবিশেষের—উপভাষা কলকাতা নগরে এসে শিক্ষিত মানুষের সমাজিক সাহিত্যিক যোগাযোগ ও প্রকাশের মাধ্যম হিশেবে নেয় মান চলতি রূপ। ওই অঞ্চলের উচ্চারণ কলকাতায় এসে শিক্ষিত সামাজিক শ্রেণীর উচ্চারণ হিশেবে গৃহীত হয় মান-উচ্চারণ ব'লে। তাই চলতি বাঙলার উচ্চারণ মূলত আঞ্চলিক হ'লেও ক্রমশ তা পরিণত হয় সামাজিক-শ্রেণিক উচ্চারণে; এবং গৃহীত হয় মান বাঙলা ভাষার মান-উচ্চারণ রূপে। এ-উচ্চারণ এখন আর আঞ্চলিক নয়; তা অঞ্চলনিরপেক্ষ, সর্বাঞ্চলিক বা সর্ববঙ্গীয়।

বাঙালি মুসলমান মান বাঙলা উচ্চারণে বিশেষ স্বস্তি বোধ করে নি; এবং আজো সে-অস্বস্তি পুরোপুরি কাটে নি। যে-অর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক শ্রেণীভুক্ত হ'লে মান-উচ্চারণে স্বস্তি পাওয়া সম্ভব, সাতচল্লিশের আগে বাঙালি মুসলমান সে-শ্রেণীতে বিশেষ অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে নি। সামাজিক অবস্থানবশত তারা ছিলো মান-উচ্চারণের প্রতি বিরূপ, রাজনীতিক কারণে ছিলো মান-উচ্চারণ বিরোধী, আর উপভাষাগত কারণে ছিলো মান-উচ্চারণ আয়ত্তে অসমর্থ। পাকিস্তানপর্বে একগোত্র ভালোভাবেই বিরোধিতা করেছে মান-উচ্চারণের। 'পাক-বাংলার কালচার' পন্থীরা চেয়েছিলো চলতি ভাষাকেই ত্যাগ করতে; এবং মান-উচ্চারণের স্থানে বসাতে চেয়েছিলো নিজেদের অপরিশীলিত ঔপভাষিক উচ্চারণকে। তারা চেয়েছিলো মান-উচ্চারণের পাকিস্তানীকরণ। তবে চলতি বাঙলা, অবয়বে ও উচ্চারণে, ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত হয় বাঙলাদেশে। এটা ছিলো অবধারিত; কারণ পাকিস্তানি উৎসাহ সত্ত্বেও হঠাৎ আরেকটি মান ভাষা ও মান-উচ্চারণ বিধিবদ্ধ করা ছিলো অসম্ভব। মান-উচ্চারণ সহজে গৃহীত হয় নি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এক দশক পর মুহম্মদ আবদুল হাই 'আমাদের বাংলা উচ্চারণ' (১৩৬৫) প্রবন্ধে বলেন 'চলতি উচ্চারণকে যাঁরা কলকাতা, শান্তিনিকেতন তথা পশ্চিম বাংলা ভিত্তিক বলে বর্জন করতে চান, আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। এ উচ্চারণ পশ্চিমবাংলা ভিত্তিক হলেও প্রাক-আজাদী যুগের বহু জিনিসের মত আমরা এর উত্তরাধিকারী। এই উচ্চারণই হবে আমাদের ভবিষ্যৎ আদর্শ উচ্চারণ গড়ে তোলার ভিত্তি।' মুহম্মদ আবদুল হাই পাকিস্তানি

AMARBOI.COM

পরিবেশে মান-উচ্চারণকে ভিত্তি ক'রে এক ভবিষ্যৎ আদর্শ উচ্চারণ গ'ড়ে তোলার কথা ভাবতে বাধ্য হয়েছিলেন; কিন্তু ওই আদর্শ উচ্চারণ দেখা দেয় নি। বরং চলতি বাঙলা ভাষার মান-উচ্চারণই গৃহীত হয় বাঙলাদেশে, যদিও কয়েক দশকে পশ্চিম বাঙলা ও বাঙলাদেশের মান-উচ্চারণে নানারকম ভিন্নতা হয়তো ঘটেছে। তার কারণ মান-উচ্চারণ নিয়ে অসুবিধা অনেক। প্রধান অসুবিধা হচ্ছে মান-উচ্চারণ আজো বিধিবদ্ধ হয় নি। কোথায় পাওয়া যাবে মান-উচ্চারণের আদর্শ রূপ? ব্যাকরণে, অভিধানে, বাঙলা ধ্বনিতাত্ত্বিক রচনাবলিতে? না, তা বিশেষ পাওয়া যায় না। বাঙলা অভিধানরাশির একটি দায়িত্ব ছিলো প্রতিটি শব্দের উচ্চারণ নির্দেশ করা; কিন্তু অভিধানপ্রণেতারা সে-দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থেকেছেন। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৬৬) জানিয়েছেন, *বঙ্গীয় শব্দকোষ*—এ উচ্চারণ নির্দেশের ইচ্ছে তাঁর ছিলো, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরাও বিভিন্ন শব্দের উচ্চারণ সম্বন্ধে এতো ভিন্ন মত পোষণ করেন যে উচ্চারণ নির্দেশের সাহস তাঁর হয় নি।

বাঙলাদেশে মান-উচ্চারণ আয়ত্ত করার রয়েছে নানা সমস্যা। প্রথম সমস্যাটি সামাজিক-শ্রেণিক। মান বাঙলা উচ্চারণ হচ্ছে শিক্ষিত, সুরুচিসম্পন্ন, সংস্কৃতিপরায়ণ বুর্জোয়া শ্রেণীর উচ্চারণ। বাঙলাদেশে এ-শ্রেণীটির বিশেষ বিকাশ ঘটে নি। যারা আমাদের সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে, তারা এক রুচিহীন, সংস্কৃতিহীন, নীতিহীন, আধুনিক বর্বর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাদের ভাষিক, এবং কোনো রুচিই উন্নত নয় ব'লে তারা এখনো চলতি রীতিতে ও মান-উচ্চারণে অস্বস্তি বোধ করে। অর্থাৎ সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপরতলায় মান-উচ্চারণ গৃহীত হয় নি। আর সারাদেশ জুড়ে রয়েছে যে-বিশাল নিরক্ষর দরিদ্র মানবমণ্ডলি, চলতি উচ্চারণ তাদের জীবনে হাস্যকর। পৃথিবী জুড়ে আজকাল তরুণ সমাজ সাধারণত মান-উচ্চারণবিরোধী; তারা মান-উচ্চারণকে মনে করে শাসকশোষক শ্রেণীর শাসনশোষণের আরেকটি অস্ত্র হিশেবে। বাঙলাদেশেও তরুণসমাজ মান-উচ্চারণের সাথে সচেতন-অসচেতন সংঘর্ষে লিপ্ত। যে-যুবক বছরের পর বছর বেকার, শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও মান-উচ্চারণ তার জীবনে থাকতে পারে না। বরং সে সমাজরাষ্ট্রকে আঘাত করতে পারে ঔপভাষিক ও অপভাষিক উচ্চারণ দিয়ে। ভাষিক কারণেও বাঙলাদেশে মান-উচ্চারণ কিছুটা বাধাগ্রস্ত। মান-উচ্চারণের প্রধান প্রবণতা ও বাঙলাদেশি উচ্চারণের প্রধান প্রবণতা পরস্পরের বিপরীত। বাঙলা উচ্চারণে চারটি স্বরধ্বনি প্রবল ভূমিকা নিয়ে থাকে; ধ্বনি চারটি হচ্ছে [অ, ও, এ, অ্যা]। এ-ধ্বনি চারটিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারলে উচ্চারণ চমৎকার হয়ে ওঠে। মান-উচ্চারণে [ও], এবং [এ] ব্যাপকভাবে উপস্থিত থাকে, আর বাঙলাদেশে সেখানে উপস্থিত থাকে [অ], এবং [অ্যা]। বাঙলা বানানে যেহেতু এ-স্বরধ্বনিগুলো উচ্চারণ অনুসারে নির্দেশিত হয় না, তাই উৎসাহীর পক্ষেও মান-উচ্চারণ আয়ত্ত কঠিন হয় ওঠে। সংযুক্ত ব্যঞ্জন উচ্চারণেও আমরা বিপন্ন: সংযুক্ত ব্যঞ্জন এখানে বিযুক্ত হয়ে যায়। [রোবিন্দ্রো] হয় [রবিন্‌র], [বিস্‌রাম' হয় 'বিস্‌রাম], [শর্‌বোশ্‌শান্‌তো' হয় [শর্‌বশান্‌ত]। তবে মান-উচ্চারণ আয়ত্তের প্রধান অসুবিধা হচ্ছে যে শব্দে বিভিন্ন ধ্বনির মান-উচ্চারণ বিধিবদ্ধ হয় নি।

মান-উচ্চারণ বিধিবদ্ধ করার, শব্দে বিভিন্ন স্বরধ্বনির উচ্চারণের আনুশাসনিক সূত্র রচনার প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলেন বাঙলা ভাষার শ্রেষ্ঠ বর্ণনামূলক ব্যাকরণবিদ রবীন্দ্রনাথ। 'বাংলা উচ্চারণ' (১২৯৮) প্রবন্ধে শব্দ-শুরুর {অ} বর্ণের উচ্চারণের কিছু সূত্র তিনি বিধিবদ্ধ করেন, এবং *বাংলাভাষা পরিচয়* (১৯৩৮) গ্রন্থে নির্দেশ করেন আরো কিছু বর্ণের উচ্চারণ। তাঁর পর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৭২), মুহম্মদ আবদুল হাই (১৩৬৫), ও আরো অনেকে রবীন্দ্রনাথের সূত্রগুলো ব্যবহার করেন, ও কিছুটা সম্প্রসারিত করেন। অভিধানপ্রণেতাদের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস (১৩২৩) শব্দের স্বরধ্বনির উচ্চারণ নির্দেশের জন্যে ব্যবহার করেন তাঁর 'স্বতউচ্চার্য্য' প্রণালি; কিন্তু তা ব্যবহারকারীর খুব বেশি উপকারে আসে না। কিছু শব্দের উচ্চারণ নির্দেশ ক'রে দুটি ছোটো অভিধানও বেরোয় পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে : প্রথমটি ধীরানন্দ ঠাকুরের *বাংলা উচ্চারণ-কোষ* (১৩৬১), দ্বিতীয়টি মুহম্মদ ওসমান গণি ও অন্যান্যের *বাংলা উচ্চারণ অভিধান* (?১৩৭৫)। ধীরানন্দের কোষটির ত্রুটি হচ্ছে এটি না বর্ণনামূলক না আনুশাসনিক। এটি যদি বর্ণনামূলক হতো, তাহলে পেতাম গৃহীত শব্দগুলোর বিচিত্র উচ্চারণ; আর একটি যদি হতো আনুশাসনিক তাহলে পেতাম মান-উচ্চারণ। কিন্তু এটি বর্ণনামূলক ও আনুশাসনিক রীতির মিশ্রণ হয়ে কোনো উপকারে আসতে ব্যর্থ হয়েছে। মুহম্মদ ওসমান গণি ও অন্যান্যের অভিধানটি থেকে যায় প্রায়-অপ্রচারিত; এবং এটির কোনো উচ্চাভিলাষ ছিলো না। সম্প্রতি বেরিয়েছে বাঙলা মান-উচ্চারণ নির্দেশের সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী উদ্যোগ *ব্যাবহারিক বাংলা উচ্চারণ অভিধান* (১৩৯৪ : ১৯৮৮, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট : ঢাকা)। অভিধানটির 'সম্পাদনা পর্ষৎ'-এ রয়েছেন আনিসুজ্জামান, ওয়াহিদুল হক, জামিল চৌধুরী, ও নরেন বিশ্বাস। ষোলো হাজারের মতো শব্দ সংকলিত হয়েছে অভিধানটিতে। অভিধানটির মূল লক্ষ্য যদিও উচ্চারণ নির্দেশ, তবুও ব্যবহারকারীদের উপকারের জন্যে প্রতিটি শব্দের অর্থও দেয়া হয়েছে। এটি একটি 'ব্যাবহারিক' ও 'আনুশাসনিক' অভিধান। আনুশাসনিকতাই অভিধানটির মূল চারিত্র; প্রণেতারা বিধিবদ্ধ করতে চেয়েছেন প্রতিটি শব্দের মান-উচ্চারণ। রবীন্দ্রনাথ ও অন্যরা উচ্চারণের যে-সব সূত্র রচনা করেছিলেন, এ-অভিধানে দেখি সে-সব সূত্রেরই বাস্তবায়ন। অভিধানে সব সময়ই প্রতিফলিত হয় প্রণেতাদের মানসিকতা, তাঁদের ব্যক্তিগত প্রবণতা বিধিবদ্ধ হয়ে ধরে মানরূপ। প্রণেতারা যদি রক্ষণশীল হন, তাহলে এমন অভিধানে মান-উচ্চারণের মুখোশ প'রে উপস্থিত হ'তে পারে পুরোনো উচ্চারণ; যদি তাঁরা প্রগতিশীল হন, তাহলে এমন সব উচ্চারণ গৃহীত হ'তে পারে, যা বাধাতে পারে হৈচৈ; এবং যদি হন মধ্যপন্থী, তাহলেও সংকট দেখা দিতে পারে। এ-অভিধানের সম্পাদকেরা রক্ষণশীল, না প্রগতিশীল, না মধ্যপন্থী? শুরুতেই 'সম্পাদনা পর্ষৎ' কথাটির 'পর্ষৎ' শব্দটি দেখে মনে হয় সম্পাদকমণ্ডলি রক্ষণশীল। অধিকতর ব্যবহারিক 'পরিষদ' ও 'পর্ষৎ' শব্দ দুটিকে তাঁরা সম্ভবত শুদ্ধ বা শ্রদ্ধেয় মনে করেন না, বরং অব্যবহারিক ও পণ্ডিতি 'পর্ষৎ'কে গণ্য করেন গ্রহণযোগ্য ব'লে, যদিও তাঁরা রচনা করেছেন 'ব্যাবহারিক' অভিধান। 'পর্ষৎ' ব্যবহারিক অভিধানে 'পর্ষৎ'-এর পর দ্বিতীয় ভুক্তি হিশেবে থাকে, এবং এ-অভিধানের সম্পাদকমণ্ডলি

দ্বিতীয় ভুক্তির দিকেই আকৃষ্ট। 'ব্যাবহারিক' শব্দের বানানে আকারের উপস্থিতিও নির্দেশ করে তাঁদের রক্ষণশীলতা। তাই মনে হয় তাঁরা কিছুটা রক্ষণশীল, এবং বিগত উচ্চারণকেই তাঁরা মানবেন মান বা শুদ্ধ ব'লে। তাঁরা কি মূল্য দেবেন সমকালীন উচ্চারণ প্রবণতাগুলোকে? মনে হয় দেবেন না। একটু অতীতপ্রবণ হয়েও অভিধানটিতে সংকলকেরা বাঙলা ভাষার প্রায়-ষোলো হাজার শব্দের উচ্চারণ চমৎকারভাবেই নির্দেশ করেছেন। এটি আমাদের অস্থির উচ্চারণকে সুস্থিত করতে সাহায্য করবে।

অভিধানটির শুরুতে একটি ছোটো ভূমিকায় অভিধানটির উদ্দেশ্য, উচ্চারণ নির্দেশের জন্য ব্যবহৃত প্রতীক, বর্ণানুক্রম, উচ্চারণসূত্র, ও অনুসৃত বানানরীতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'অভিধানটিতে বেতার, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও অন্যান্য গণমাধ্যমে নিয়োজিত কর্মীদের ব্যবহারের সুবিধার দিক বিবেচনা করে মোটা দাগে উচ্চারণ নির্দেশ করা হয়েছে।' এটাই ঠিক হয়েছে; ধ্বনিবর্ণমালার জটিলতায় জড়ানো ঠিক হতো না। অভিধানটির আরো একটি ভালো দিক হচ্ছে এতে উচ্চারণ 'যতদূর সম্ভব সমকালীন বাংলা বর্ণমালায় ব্যবহৃত চিহ্ন দিয়ে' নির্দেশ করা হয়েছে। অন্য কোনো বর্ণমালায় উচ্চারণ নির্দেশ ব্যর্থতা ব'লে গণ্য হতো। তবে বিস্ময়করভাবে কিছু ধ্বনির উচ্চারণ নির্দেশ করা হয়েছে রোমীয় বর্ণমালায়। [হ্ব, হ্ব, হ্ল, হ্ণ, হ্ণ, হ্ম] প্রভৃতি ধ্বনির উচ্চারণ নির্দেশ করা হয়েছে <rhaw, rhi, lha, vha, nhi, mho> বর্ণের সাহায্যে; এবং এটাকে বেশ কৌতুককর ব'লে মনে হয়। যেমন, হ্দ, হ্দয়, আহ্লাদ, আহ্বান, ব্রহ্ম, আহ্নিক প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ নির্দেশ হয়েছে [rhawদ্, rhiদয়্, আলlhaদ্, আওvhaন্, ব্রোম্mho, আন্nhiক্] রূপে। বাঙলা ও রোমীয় বর্ণের মিশ্রণকে অভিধানের মতো গম্ভীর গ্রন্থে শিশুসুলভ কাজ ব'লে মনে হয়। বলা হয়েছে, বাঙলা বর্ণমালার এগারোটি স্বরবর্ণের মধ্যে [অ, ই, উ, ঋ] হ্রস্বস্বর; এবং [আ, ঈ, ঊ, ও] দীর্ঘস্বর। এ-বর্ণনা ঠিক নয়। বাঙলা স্বরধ্বনির হ্রস্বদীর্ঘতার কোনো বৈশিষ্ট্য বা ভিন্নতা নেই, যদিও প্রথাগতভাবে এমনই বলা হয়। আর [ঋ]কে কি এখনো স্বরধ্বনি বলা উচিত, যেখানে পুরোনো ভারতেই একে নিয়ে বহু বির্তক হয়ে গেছে? বলা হয়েছে 'শিষ্ট বাংলা উচ্চারণে সব সময় হ্রস্বস্বরের উচ্চারণ হ্রস্ব-এবং দীর্ঘস্বরের উচ্চারণ দীর্ঘ হয় না।' কোনো কোনো সময় যা হ্রস্ব বা দীর্ঘ হয়, তাকে কি হ্রস্ব বা দীর্ঘ বলা উচিত? কিছু শব্দের উদাহরণ দিয়ে দেখানো হয়েছে কোথায় [অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ও] প্রভৃতি স্বরধ্বনি হ্রস্ব বা দীর্ঘ হয়। এ-উদাহরণ ও বর্ণনা মূল্যহীন, ও অনেকটা বিভ্রান্তিকর; কেননা এসব শব্দে স্বরের হ্রস্বদীর্ঘত্বের কোনো ধ্বনিতাত্ত্বিক গুরুত্ব নেই। এসব উদাহরণে উল্লিখিত ধ্বনিগুলো যে সব সময় বিধিমতো হ্রস্ব বা দীর্ঘ হবেই, এমন নয়।

এ-অভিধানে উচ্চারণ নির্দেশের জন্যে যে-সব বর্ণ ব্যবহৃত হয়েছে, তার অধিকাংশই ঠিক হয়েছে; তবে কয়েকটি ধ্বনির জন্যে ব্যবহৃত বর্ণ সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে। যেমন, রবীন্দ্রনাথকথিত হ্রস্ব-ও, মুহম্মদ আবদুল হাইকথিত অভিশ্রুত-ও' ধ্বনিটি, এ-অভিধানে যার নামকরণ করা হয়েছে সংবৃত-অ। এ-ধ্বনিটি নির্দেশিত হয়েছে 'ও', এবং ওকার (ো) দিয়ে। ‹ও›, বা ‹ও›কার দিয়ে এ-ধ্বনিটি শব্দের মধ্যে বা শেষে

ভালোভাবেই নির্দেশ করা যায়, কিন্তু শব্দের শুরুতে যেখানে স্বায়ত্তশাসিতভাবে, অর্থাৎ কোনো ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে যুক্ত না হয়ে যখন ধ্বনিটি বসে, তখন ধ্বনিটিকে 'ও' দিয়ে নির্দেশ করলে ঠিক উচ্চারণ মনে হয় মেলে না। 'অতি, অতিথি, অতীত' প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ [ওতি, ওতিথি, ওতিত] লেখা হ'লে ঠিক উচ্চারণটি পাওয়া যায় না। এর জন্যে উর্ধ্বকমাযুক্ত ও (ও'), বা কিছুটা অভিনব ওকারযুক্ত অ (অো) ব্যবহার করলে হয়তো ঠিক উচ্চারণটি মিলতো। [অোতি, অোতিত, অোতিথি] লেখা হ'লে কিছুটা অন্যরকম দেখাতো, তবে হয়তো পাওয়া যেতো ঠিক উচ্চারণ।

তিনটি বর্ণ ও ধ্বনিকে এ-অভিধানে খুব মর্যাদা দেয়া হয়েছে, যদিও বাঙলা ভাষায় ওগুলোর একটি ধ্বনিও নেই, তবে বর্ণগুলো রয়েছে। সম্মানিত এ-বর্ণ ও ধ্বনি তিনটি হচ্ছে 'ঋ (এবং ঋকার), মূর্ধন্য-ণ, ও মূর্ধন্য-ষ'। সুনীতিকুমার (১৯৭২) বলেছেন, 'খাঁটি বাঙ্গালাতে 'ঋ'-স্বরধ্বনি নাই, সুতরাং বাঙ্গালা শব্দের বানানে 'ঋ' না লেখাই উচিত।' রবীন্দ্রনাথ (১৯৩৮) বলেছেন, 'স্বরবর্ণের কোঠায় আমরা ঋ'কে ঋণস্বরূপ নিয়েছি বর্ণমালায়, কিন্তু উচ্চারণ করি ব্যঞ্জনবর্ণের রি। সেইজন্যে অনেক বাঙালি 'মাতৃভূমি'কে বলেন 'মাত্রিভূমি'।' এ-অভিধানে [ঋ]র উচ্চারণ লেখা হয়েছে 'রি', কিন্তু ঋকারের উচ্চারণ দেখানো হয়েছে ঋকার দিয়েই। ঋকারের উচ্চারণ ঋকার (ৃ)র বদলে র-ফলা ও ইকার দিয়ে নির্দেশ করলেই ঠিক হতো; উচ্চারণটিকে মনে হতো বাঙলা। 'কৃমি, কৃশ, কৃষি, কৃষ্ণ' প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ যদি [ক্রিমি, ক্রিশো, ক্রিশি, ক্রিশ্নো] লেখা হতো, তাহলেই ভালো হতো। মূর্ধন্য-ণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'মূধন্য ণ মূর্ধা থেকে উচ্চারিত ট-বর্গের নাসিক্যধ্বনি।' একটু পরেই বলা হয়েছে 'স্বতন্ত্র অবস্থানে মূর্ধন্য ণ এবং দন্ত্য ন-এর ধ্বনি অভিন্ন।' মন্তব্য দুটি পরস্পরবিরোধী। বাঙলা বর্ণমালায় মূর্ধন্য-ণ রয়েছে, তবে ধ্বনিতে নেই। রবীন্দ্রনাথ (১৯৩৮) বলেছেন, 'মূর্ধন্য ণ' এর আসল উচ্চারণ বাঙালির জানা নেই। 'ড়'এ চন্দ্রবিন্দুর মতো ওর উচ্চারণ।' সুনীতিকুমার (১৯৭২) বলেছেন, 'বিশুদ্ধ মূর্ধন্য 'ণ'-এর ধ্বনি কতকটা 'ড়'-এর মতো শুনায়।' তাই বাঙলায় এ-ধ্বনি নেই, আছে শুধু বানানে। এটির উচ্চারণ দন্ত্য ন-এর উচ্চারণ। এ-অভিধানে উচ্চারণ নির্দেশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে মূর্ধন্য-ণ। এটা ঠিক হয় নি। এর পক্ষে যুক্তি দেয়া হয়েছে, 'ট-বর্গের পূর্বে যুক্ত মূর্ধন্য ণ এবং দন্ত্য ন-এর উচ্চারণভেদ সচেতনভাবে (?) শ্রুত না হলেও ট-বর্গের পূর্বে যুক্ত মূর্ধন্য ণ সর্বদা মূর্ধা থেকে উচ্চারিত হবার কারণে উল্লিখিত যুক্তবর্ণের নাসিক্যধ্বনি মূর্ধন্য ণ দিয়ে নির্দেশ করা হয়েছে।' এটা এক বিভ্রান্তি। বাঙলা বানানে সংস্কৃত রীতি মেনে যুক্তবর্ণে সমবর্গীয় নাসিক্যধ্বনি ব্যবহার করা হয়; কিন্তু উচ্চারণে এর কোনো প্রভাব নেই। কারণ যুক্তবর্ণে ধ্বনি দুটি যুক্ত থাকে না, নাসিক্যধ্বনিটি পূর্ববর্তী অক্ষরে উচ্চারিত হয়, এবং পরের অক্ষরে উচ্চারিত হয় যুক্তবর্ণের দ্বিতীয় ধ্বনিটি। যেমন, 'বন্টন, কণ্ঠ' শব্দ উচ্চারিত হয় [বন্-টোন্, কন্-ঠো]। আর যদি পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে নাসিক্যধ্বনির উচ্চারণ স্থান বদলেও যায়, তাহলেও তা দন্ত্য-ন-এর সাহায্যে নির্দেশ করলেও বাকপ্রত্যঙ্গের অবধারিত আচরণবশত তা পরবর্তী ধ্বনির চরিত্র অর্জন করবে। এ-অভিধানে 'কণ্ঠ, বন্টন, দণ্ড' প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ নির্দেশ করা হয়েছে [কণ্ঠো,

বণ্টোন, দণ্ডো]। দেখেই ভয় লাগে; কি ক'রে উচ্চারণ করবো? কারণ, মূর্ধন্য-ণ-এর বাঙলা উচ্চারণই নেই। শুধু এসব ক্ষেত্রেই নয়, মূর্ধন্য-ষ-এর সাথে বানানে যেখানে যুক্ত হয়েছে মূর্ধন্য-ণ, সেখানেও উচ্চারণ নির্দেশ করা হয়েছে মূর্ধন্য-ণ দিয়ে। 'বিষ্ণু, তৃষ্ণা, কৃষ্ণ' প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ নির্দেশ করা হয়েছে [তৃষ্ণা, বিষ্ণু, কৃষ্ণো]। কী ক'রে উচ্চারণ করা যাবে এসব শব্দ? এগুলো নিয়ে তো দ্বিগুণ বিপদ, কারণ উচ্চারণে মূর্ধন্য-ষও ব্যবহৃত হয়েছে, যার কোনো বাঙলা উচ্চারণ নেই। মূর্ধন্য-ষ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে এটি মূর্ধা থেকে উচ্চারিত হয়। রবীন্দ্রনাথ (১৯৩৮) মূর্ধন্য-ষ-কে পুরোপুরি বাদ দিয়েছেন; এবং সুনীতিকুমার (১৯৭২) বলেছেন, 'শ, ষ, স-এই তিনটি বর্ণের উচ্চারণ এখন বাঙ্গালায় এক—ইংরেজির S-এর মতো।' এ-অভিধানে মূর্ধন্য বর্ণের আগে যুক্ত মূর্ধন্য-ষ-কে ষ-বর্ণটি দিয়ে নির্দেশ করা হয়েছে। 'কষ্ট, নষ্ট, কষ্টি'র উচ্চারণ নির্দেশ করা হয়েছে [কষ্‌টো, নষ্‌টো, কোষ্‌টি]। এসব উচ্চারণ 'শ' দিয়েই নির্দেশিত হওয়া উচিত ছিলো। আমার মনে হয় এ-অভিধানটির প্রধান ত্রুটি উচ্চারণে ‹ঋকার, ণ›, ও ‹ষ› ব্যবহার। যে-যুক্তিতে এতে ‹ণ›, বা ‹ষ› ব্যবহার করা হয়েছে, সে-যুক্তিতে চ-বর্গীয় ধ্বনির আগে ব্যবহার করা উচিত ছিলো ‹ঞ›। কিন্তু তা করা হয় নি; এবং অভিধানটি আরেকটি স্খলন থেকে বেঁচে গেছে।

বলা হয়েছে, 'চন্দ্রবিন্দুর নিজস্ব কোনো ধ্বনি বা স্বর নেই।' এটা কি যথাযথ বিবৃতি? চন্দ্রবিন্দু তো অনুনাসিকতা জ্ঞাপন করে। বলা হয়েছে, 'ট-বর্গের উচ্চারণ স্থান মূর্ধা।' 'মূর্ধা' শব্দের মূল অর্থ 'মস্তক'; এবং মস্তক থেকে কোনো ধ্বনি উচ্চারিত হয় না। প্রতিবেষ্টিত এ-ধ্বনিগুলোর নামকরণে ভুল হয়েছিলো পুরোনোকালেই; সংশোধনের চেষ্টাও হয়েছে। মূর্ধা বলতে যদি মুখগহ্বরের ওপরের অংশকেও বুঝি, তবুও দেখি ট-বর্গের ধ্বনিগুলোর উচ্চারণ স্থান ঠিক ওই এলাকা নয়। মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯৬৪) এ-ধ্বনিগুলোকে 'দন্তমূলীয়' নাম দিয়েছিলেন। দন্তমূলীয় নামটি যথাযথ কিনা জানি না, তবে এগুলোকে এখন আর মূর্ধন্যধ্বনি বলা ঠিক নয়। বলা হয়েছে, 'বাংলায় খণ্ড ত (ৎ) এবং হসন্ত ত অথবা ব্যঞ্জনান্ত ত (ত্)-এর উচ্চারণ খুব কাছাকাছি কিন্তু সমতুল নয়।' কিন্তু আমি 'আঘাত' ও 'জগৎ' শব্দের ত্-ধ্বনির উচ্চারণের পার্থক্য বোধ করতে পারি না। অভিধানপ্রণেতারা এখানে কি বানান দিয়ে বিভ্রান্ত হয়েছেন? 'আঘাত, উচিত, ছাত'কে যদি 'আঘাৎ, উচিৎ, ছাৎ' লিখি, তাহলে কি উচ্চারণ বদলে যায়? বদলায় না। বলা হয়েছে, 'পদের মধ্যে বিসর্গস্থলে খণ্ড হ্ ধ্বনি শ্রুত হয়'; এবং এ-ধ্বনিটিকে নির্দেশ করা হয়েছে 'ছোট পয়েন্টের হসন্ত হ (হ্) দিয়ে'। তাই 'অন্তঃপুর, অন্তঃসত্ত্বা' প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ নির্দেশ করা হয়েছে [অন্‌তোহ্‌পুর, অন্‌তোহ্‌শত্তা]; কিন্তু 'অন্তঃস্থ' শব্দের উচ্চারণ নির্দেশ করা হয়েছে 'অন্‌তস্‌থো'। আধুনিক বাঙলায় কি বিসর্গের ওই 'খণ্ড হ্' ধ্বনি শোনা যায়? আর শোনালে উচ্চারণকে একটু প্রত্ন-উচ্চারণ ব'লে মনে হয় না? খণ্ড হ্-টিকে ছেড়ে দেয়াই ভালো।

অভিধানটির আনুশাসনিকতা স্পষ্ট ধরা পড়ে উচ্চারণ সূত্রগুলোতে, এবং প্রতিটি শব্দের জন্যে মাত্র একটি উচ্চারণ নির্দেশ। একটি শব্দের একটি উচ্চারণই মান-উচ্চারণ

প্রতিষ্ঠার সহায়ক; তবে মনে হয় কিছু শব্দের বিকল্প উচ্চারণ দেয়া উচিত ছিলো। উচ্চারণ সূত্রগুলোর অধিকাংশই প্রধানত রবীন্দ্রনাথ ও অন্যদের রচিত, তবে দু-একটি সূত্র এ-অভিধানেই প্রথম বিধিবদ্ধ হয়েছে। প্রথম সূত্রটি ‹অ›-বর্ণের উচ্চারণ বিষয়ক। বলা হয়েছে, অ-এর পরে ই, উ, ঋ বা ঋকারযুক্ত বর্ণ, ক্ষ, জ্ঞ, বা য-ফলা যুক্ত বর্ণ থাকলে অ স্বর সংবৃত হয়। অভিধানটি কি এ-সূত্র পুরোপুরি মেনে চলতে পেরেছে? ধরা যাক 'খনিত্র' শব্দটি। সূত্রানুসারে এর উচ্চারণ হবে 'খোনিত্‌ত্রো'; কিন্তু দেখছি এর উচ্চারণ দেয়া হয়েছে 'খনিত্‌ত্রো'; কিন্তু 'খনি' শব্দের উচ্চারণ নিয়মানুসারে 'খোনি'ই দেয়া হয়েছে। এমন উদাহরণ আরো পাওয়া যাবে অভিধানে। বলা হয়েছে, কোনো শব্দের শুরুতে যদি না-বাচক 'অ' থাকে, তবে শর্ত পূরণ করা সত্ত্বেও তা সংবৃত উচ্চারিত হয় না। যেমন, 'অসীম, অকূল, অকৃত, অকুণ্ঠ' প্রভৃতি শব্দের শুরুর [অ] সংবৃত হবে না। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, ধ্বনিসূত্র কি অর্থ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়? যদি অর্থ বিবেচনা ক'রে 'অখ্যাত, অন্যায়, অব্যবহিত' প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করি, তাহলে এগুলোর উচ্চারণ হবে [অ-খ্যাতো, অ-ন্যায়, অ-ব্যবোহিতো]; কিন্তু অর্থ অবহেলা ক'রে এ-শব্দগুলো আমরা উচ্চারণ করি [অক্‌খ্যাতো, অন্‌ন্যায়্‌, অব্‌বোবোহিতো]। অর্থ বিবেচনা ক'রে এখানে ধ্বনির দ্বিত্ব না হওয়ার কথা বলা যেতো; তাহলে না-সূচক ‹অ› কেনো ধ্বনির অমোঘ সূত্রে হ্রস্ব-ও বা সংবৃত-অ হবে না? সুনীতিকুমার (১৯৭২) অবশ্য একটি শর্তে না-বাচক 'অ'-সম্বলিত শব্দের 'অ'র সংবৃত উচ্চারণের বিধান দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, এমন শব্দ যদি কারো নাম হয়, তবে ‹অ›র সংবৃত উচ্চারণ হয়। এ-বিধিটি এখানে থাকতে পারতো। রবীন্দ্রনাথ (১২৯৮) বলেছিলেন যে ব-ফলা যুক্ত বর্ণের পূর্ববর্তী 'অ' হ্রস্ব-ও-রূপে, অর্থাৎ সংবৃত-অ রূপে উচ্চারিত হয়। তিনি 'অন্বেষণ, ধন্বন্তরী, মন্বন্তর' শব্দের শুরুর 'অ' হ্রস্ব-ও রূপে উচ্চারণের বিধান দিয়েছিলেন। এ-অভিধানে তা মানা হয় নি। এখানে উচ্চারণ পাই [অন্‌নেশ্‌ন, ধন্‌নোন্‌তোরি, মন্‌নন্‌তর্‌]। কোন উচ্চারণ মানবো আমরা? রবীন্দ্রনাথ 'নখ' শব্দের উচ্চারণ নির্দেশ করেছিলেন 'নোখ্‌', কিন্তু এখানে উচ্চারণ 'নখ্‌'। বলা হয়েছে, অ আ এ ও-কারের পরবর্তী স্বর সংবৃত হয়। কিন্তু 'পরম' ও 'পরমোৎসব' শব্দ দুটিতে দেখি এ-সূত্রের বিপর্যয়। 'পরম'-এর উচ্চারণ ঠিকই দেয়া হয়েছে পরোম্‌]; কিন্তু 'পরমোৎসব'-এর উচ্চারণ দেয়া হয়েছে [পরমোৎশব্‌]। নিয়মানুসারে তো হওয়া উচিত ছিলো [পরোমোৎশব্‌]। বলা হয়েছে, 'মূর্ধন্য ণ অথবা দন্ত্য ন-এর পূর্ববর্তী অ স্বরের উচ্চারণ সাধারণত সংবৃত হয়। কিন্তু মূর্ধন্য ণ অথবা দন্ত্য ন বর্ণের পূর্বে অ স্বর থাকলে এবং অ স্বরের পূর্ববর্তী বর্ণে ই কিংবা উ স্বর থাকলে অ স্বর সংবৃত হয় না।' এ-সূত্রানুসারে 'সেবন' ও 'সেচন' শব্দ দুটির উচ্চারণ হবে [শেবোন্‌] ও 'শেচোন্‌]। কিন্তু অভিধানে দেখি 'সেবন'-এর উচ্চারণ [শেবন্‌], আর 'সেচন'-এর উচ্চারণ [শেচোন্‌]। কী কারণে এ-ভিন্নতা ঘটলো? সূত্র কি বিশেষ কাজে আসে না? অভিধানটিতে সমস্ত স্বরান্ত শব্দের ওকারান্ত উচ্চারণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এটা কি ঠিক হয়েছে? কয়েক দশক আগে জ্ঞানেন্দ্রমোহন (১৩২৩) 'প্রান্ত, স্তব্ধ,আনন্দ, সত্য, কর্তব্য, শশাঙ্ক' প্রভৃতি শব্দের অকারান্ত উচ্চারণ নির্দেশ করেছিলেন। তিনি কি সাধুরীতির উচ্চারণ নির্দেশ

করেছিলেন, নাকি কয়েক দশকে বাঙলা শব্দান্ত থেকে অ-ধ্বনি বিদায় নিয়েছে? এটা ঠিক, সংবৃত অ বাঙলা মান-উচ্চারণের এক পিচ্ছিল ও প্রতারক এলাকা, এ-অভিধানে তার পরিচয় রয়েছে।

এ-অভিধানে ঋকার খুব মূল্য পেয়েছে; কিন্তু এতে ঋকারের যে-উচ্চারণ বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, তা সমকালীন বাঙলা উচ্চারণ প্রবণতাবিরোধী। বলা হয়েছে, 'র-ফলা উচ্চারণে ব্যঞ্জনের যে ধ্বনিদ্বিত্ব শ্রুত হয় ঋ-কারের শিষ্ট উচ্চারণে তা অনুপস্থিত। 'শিষ্ট উচ্চারণ'-এর নামে এখানে মৃদু তিরস্কার করা হয়েছে সমকালীন প্রবণতাকে, পরিচয় দেয়া হয়েছে রক্ষণশীলতার। এ-বিধি অনুসারে 'অমৃত, আবৃত্তি, প্রকৃত, প্রাকৃত' প্রভৃতির উচ্চারণে ঋকারযুক্ত বর্ণের ধ্বনিদ্বিত্ব ঘটবে না, ঘটলে তা অশিষ্ট হবে। আমার তা মনে হয় না; বরং এটা আমাদের একটি প্রধান প্রবণতা, এবং এটি অভিধানে স্বীকৃতি পাওয়ার শুধু যোগ্যই নয়, যে-অভিধান তা স্বীকৃতি দেয় না, সে-অভিধান ভুল। এসব শব্দ উচ্চারিত হয় [অম্‌মিতো, আব্‌ব্রিত্তি, প্রোক্‌ক্রিতো, প্রাক্‌ক্রিতো] রূপে, এবং এতে কোনো অশিষ্টতা নেই। বরং দ্বিত্ব না হওয়া প্রত্নচারিতা। মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯৬৪) 'অমৃত, আবৃত্তি, আবৃত, প্রকৃত, আদৃত, বিধৃত' প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ নির্দেশ করেছেন [অম্‌মিতো, আব্‌ব্রিত্তি, আব্‌ব্রিতো, প্রোক্‌ক্রিতো, আদ্‌দ্রিতো, বিদ্‌ধ্রিতো]। তিনি এও বলেছেন যে 'উচ্চারণ ও শ্রুতির দিক থেকে ৃ-কার ও ্র-ফলার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।' এ-অভিধানে অবশ্য 'অনুগৃহীত, উপকৃত, মসৃণ' প্রভৃতি কিছু শব্দের উচ্চারণে দ্বিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। তবে কিছু সম্পর্কিত শব্দে দু-রকম উচ্চারণ দেখানো হয়েছে। যেমন, 'সমৃদ্ধ' ও 'সমৃদ্ধিশালী'। 'সমৃদ্ধ'-এর উচ্চারণ নির্দেশিত হয়েছে [শমৃদ্‌ধো], আর 'সমৃদ্ধিশালী'র উচ্চারণ নির্দেশিত হয়েছে [শম্‌মৃদ্‌ধিশালি]। একটিতে দ্বিত্ব ঘটলো, আরেকটিতে ঘটলো না, এর কোনো ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্র নেই, রয়েছে শুদ্ধতা সম্বন্ধে ভুল ধারণা।

ঋকারের দ্বিত্ব স্বীকৃতি না পেলেও এ-অভিধানে এমন একটি ধ্বনির দ্বিত্ব স্বীকৃত হয়েছে, যা অভাবিত। বলা হয়েছে, 'রেফযুক্ত বর্ণের শিষ্ট উচ্চারণে র-ধ্বনির খণ্ডন এবং পরবর্তী ব্যঞ্জনের ধ্বনিদ্বিত্ব লক্ষ করা যায়।' এ-সূত্রানুসারে ল, শ, ষ, স, হ এবং বিদেশি শব্দে রেফযুক্ত বর্ণ ছাড়া সব বর্ণের ধ্বনিদ্বিত্ব বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। ফলে 'অর্জন, গর্জন, ধর্ম, বর্ণ' প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ নির্দেশিত হয়েছে [অর্‌জ্‌জোন্‌, গর্‌জ্‌জোন, ধর্‌ম্‌মো, বর্‌ন্‌নো]। এ-উচ্চারণ শুনতে যে খারাপ লাগে, তা নয়; তবে বাঙলায় রেফযুক্ত ধ্বনির দ্বিত্ব হয় না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'বাংলা বানানের নিয়ম'-এ (১৯৩৭) 'রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হইবে না' ব'লে বানানের নিয়ম বিধিবদ্ধ করেছিলো। বানান থেকেই যা উঠে গেছে, তাকে কি ফিরিয়ে আনবো উচ্চারণে? 'বাংলা বানানের নিয়ম'-এ এ-সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছিলো : 'কেহ কেহ বলেন, বাংলা উচ্চারণে রেফাক্রান্ত বর্ণে অতিরিক্ত জোর পড়ে, সেজন্য দ্বিত্ব আবশ্যক; 'সর্ব্ব' = 'সর্‌+ব' নয়, 'সর্‌+ব্ব'। এই যুক্তি নিতান্ত অসার, কারণ অন্যান্য যুক্তাক্ষরে যে জোর পড়ে, রেফাক্রান্ত বর্ণে তাহার অধিক পড়ে না।' অভিনব এ-বিধিটিকে

AMARBOI.COM

মান–উচ্চারণ থেকে বর্জন করতেই হবে। তবে সব বাঙলা শব্দের উচ্চারণেই যে বিধিটি মানা হয়েছে, এমন নয়। 'ভর্তি' কি বাঙলা নয়? বিধি অনুসারে এর উচ্চারণ হওয়া উচিত [ভোর্‌ত্‌তি]; কিন্তু এর উচ্চারণ দেখানো হয়েছে [ভোর্‌তি]।

ম–ফলার উচ্চারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'পদের মধ্যে বা শেষে ব্যঞ্জনের সঙ্গে ম–ফলা যুক্ত হলে সাধারণত সেই ব্যঞ্জনের ধ্বনিদ্বিত্ব হয় এবং সঙ্গে কিঞ্চিৎ নাসিক্য স্বর যুক্ত হয়'; এবং পদের আরম্ভের কোন ব্যঞ্জনের সঙ্গে ম–ফলা যুক্ত হলে সেই ব্যঞ্জনের সঙ্গে কেবল কিঞ্চিৎ নাসিক্যস্বর যুক্ত হয় কিন্তু ধ্বনিদ্বিত্ব হয় না। গ ঙ ট ণ ন এবং ল বর্ণের সঙ্গে ম–ফলা যুক্ত হলে ম–এর নিজস্ব ধ্বনি লুপ্ত হয় না।'. এ–সূত্রানুসারে দুটি শব্দের উচ্চারণ লক্ষ্য করা যাক। শব্দ দুটি 'উষ্ম' ও 'স্মিত'। শব্দ দুটি যদি সাধারণ সূত্রে পড়ে তবে এদের উচ্চারণ হবে [*উশ্‌শোঁ] ও [*শিঁতো]; কিন্তু এদের উচ্চারণ দেয়া হয়েছে [উশ্‌মো] ও [স্মিতো]। সূত্র দুটি কিছুটা সম্প্রসারিত করা হ'লেই এ–উচ্চারণ আর ব্যতিক্রমী থাকতো না।

য–ফলার উচ্চারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'পদের মধ্যে বা শেষে অবস্থিত ব্যঞ্জনের সঙ্গের য–ফলা যুক্ত করলে সাধারণত উচ্চারণে সে ব্যঞ্জনের ধ্বনিদ্বিত্ব হয়।' হ ছাড়া অন্য যে–কোনো ব্যঞ্জনের সাথে য–ফলা যুক্ত হ'লে ধ্বনিদ্বিত্ব হবেই। এ–অভিধানে তাই করা হয়েছে। উদ্যান, গদ্য, সদ্য, সাম্য প্রভৃতি শব্দে দেখি ধ্বনিদ্বিত্ব। কিন্তু একটি শব্দের দেখানো হয়েছে ভিন্ন, ও তথাকথিতভাবে 'শুদ্ধ', উচ্চারণ। শব্দটি 'উদ্যোগ'। এর উচ্চারণ নির্দেশ করা হয়েছে [*উদ্‌জোগ্‌]। এ–শব্দটির এ–ভুল উচ্চারণ এখন বেশ জনপ্রিয়; কিন্তু এর উচ্চারণ [উদ্‌জোগ্‌] হ'তেই পারে না। 'উৎ' এবং 'যোগ' বাঙলায় যুক্ত করলে ধ্বনির পারস্পরিক বিষমীভবনের ফলে হয় 'উদ্যোগ', যার উচ্চারণ [উদ্‌দোগ]। যদি 'উদ্যোগ' লিখি তাহলে [উদ্‌দোগ্‌]ই উচ্চারণ করতে হবে। তবে 'উৎ' এবং 'যোগ' যুক্ত করলে পারস্পরিক বিষমীভবন না ঘ'টে 'ৎ'–এর ঘোষীভবন ঘটতে পারে; এবং শব্দটির রূপ হয় [উদ্‌যোগ্‌]। শব্দটির বানান যদি 'উদ্‌যোগ' হয়, তাহলেই শুধু এর উচ্চারণ হবে [উদ্‌জোগ্‌]। শব্দটি আরো ধ্বনিপরিবর্তনের ফলে [উজ্জোগ]ও হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু 'উদ্যোগ' লিখে একে [*উদ্‌জোগ্‌] উচ্চারণ করা ঠিক নয়। এ–অভিধানেই আরেকটি শব্দ রয়েছে এ–ধরনের। শব্দটি 'উদ্যোক্তা'। এর উচ্চারণ দেখানো হয়েছে [উদ্‌দোক্‌তা]। এটির উচ্চারণ তো [উদ্‌জোক্‌তা] দেখানো হয় নি; এবং 'উদ্যোগ'–এরও [*উদ্‌জোগ্‌] উচ্চারণ অসমীচীন, কিছুটা ভুল সংস্কৃতজ্ঞানের পরিচায়ক। য–ফলা সম্পর্কে একটি বিশেষ সূত্রে বলা হয়েছে, 'নাসিক্য বা উষ্ম বর্ণের সঙ্গে যুক্ত বর্ণে য–ফলা থাকলে সেই বর্ণের ধ্বনিদ্বিত্ব হয় না'; এবং র–ফলা সম্পর্কে একটি বিশেষ সূত্রে বলা হয়েছে, 'কিন্তু ন–এর সঙ্গে যুক্ত বর্ণে এবং স–এর সঙ্গে যুক্ত বর্ণে র–ফলা থাকলে সে বর্ণের ধ্বনিদ্বিত্ব হয় না।' এতে মনে হয় নাসিক্য ও উষ্ম বর্ণ ছাড়া অন্য বর্ণের সাথে যুক্ত বর্ণে য–ফলা যুক্ত হ'লে ধ্বনিদ্বিত্ব হয়; এবং 'ন' ও 'স' ছাড়া অন্য বর্ণের সাথে যুক্ত বর্ণে র–ফলা যুক্ত হ'লে ধ্বনিদ্বিত্ব হয়। আমি অবশ্য এমন বর্ণ সম্বলিত শব্দ খুঁজে পাই নি। তবে এ–সূত্র দুটি পরখ করার জন্যে কয়েকটি শব্দ তৈরি

ক'রে নিতে পারি। আমার বানানো শব্দ গুলো হচ্ছে '*পক্ক্য, *খক্ত্য, *চক্ক্য', এবং '*পক্ক, *খক্ত, *চক্ক'। এগুলো নিরর্থক বানানো শব্দ। সূত্র দুটি অনুসারে শব্দগুলো উচ্চারণ করতে গেলে ফলা-বর্ণগুলোর ধ্বনিদ্বিত্ব হবে; কিন্তু আসলে তা হয় না। তাই এ-বিশেষ সূত্র দুটির বিশেষ মূল্য নেই, বরং এরা বিভ্রান্তিকর।

অন্তঃস্থ য় সম্পর্কে আলোচনার শুরুতে বলা হয়েছে এ-বর্ণটির 'উচ্চারণ অন্তস্থ অ'। তবে 'অন্তঃস্থ অ' বর্ণটির উচ্চারণ নয়, নাম। এ-পর্যায়ে 'ছায়া, মায়া, কায়া' প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ নির্দেশিত হয়েছে [ছায়া, মায়া, কায়া]। এতে এ-শব্দগুলো উচ্চারিত হ'তে পারে [ছাআ, মাআ, কাআ]। কিন্তু এ-শব্দগুলোতে 'য়া'র আগে একটি ব্যঞ্জনান্ত [য়্] উচ্চারিত হয়। তাই উচ্চারণ দেখানো উচিত ছিলো [ছায়্আ, মায়্আ, কায়্আ]। মূর্ধন্য ষ সম্পর্কে আরেকটি মন্তব্য এখানে করতে পারি। মূর্ধন্য-ষ ভাগে এ-অভিধানে শব্দের শুরুতে 'ষ' ও তারপর মূর্ধন্যধ্বনি সম্বলিত প্রতিটি শব্দের মূর্ধন্য-ষ দিয়ে উচ্চারণ নির্দেশ করা হয়েছে। মূর্ধন্য-ষ-এর যেহেতু বাঙলা উচ্চারণই নেই, তাই এর আগে-পরে যে-বর্ণই আসুক না-কেনো, তা তালব্য-শ দিয়ে নির্দেশ করা উচিত ছিলো। তালব্য-শ এর সাথে ন-ফলা যুক্ত হ'লে শ-এর দন্ত উচ্চারণ হয়। কিন্তু দুটি শব্দে এখন আর ওই উচ্চারণ নেই : শব্দ দুটি 'শিশ্ন' ও 'প্রশ্ন'। প্রথম শব্দটি 'অব্যাবহারিক' ব'লে এ-অভিধানে নেই; কিন্তু দ্বিতীয় শব্দটির প্রথাগত উচ্চারণ দেয়া হয়েছে 'প্রোস্‌নো'। 'প্রোশ্‌নো' উচ্চারণ কিছুটা অগ্রসর, এমনকি ফ্যাশনপ্রবণ; তবু এটিকেই এখন মান-উচ্চারণ গণ্য করা উচিত। 'প্রোস্‌নো' উচ্চারণকে এখন খুব 'ম্যাদা' মনে হয়। বলা হয়েছে, 'বাংলায় দুটি মহাপ্রাণ বর্ণ পরস্পর যুক্ত হয় না।' এটা ঠিক; এবং উচ্চারণেও মহাপ্রাণ ধ্বনির দ্বিত্ব হয় না। তবে একটি শব্দে মহাপ্রাণ ধ্বনির দ্বিত্ব দেখানো হয়েছে, যদিও বানানে যুক্ত হয়েছে অল্প ও মহাপ্রাণ ধ্বনি। শব্দটি 'তদ্ধিত'। এর উচ্চারণ দেখানো হয়েছে [তোধ্‌ধিত্]। এটা কি মুদ্রণত্রুটি?

এবার বিছিন্নভাবে কিছু শব্দের উচ্চারণ বিবেচনা করতে চাই। প্রথমে নিচ্ছি 'গর্দভ' শব্দটি। শব্দটি কি আমরা বানান অনুসারে উচ্চারণ করি, এবং করলে কি স্বস্তি পাই? এখানে এর উচ্চারণ দেখানো হয়েছে [গর্‌দ্‌দোভ]। 'দ'-এর দ্বিত্ব ছেড়ে দিলেও যা থাকে, সেই [গর্‌দোভ] উচ্চারণ কি আমরা করি বা করতে পারি? রবীন্দ্রনাথ (১২৯৮) বলেছিলেন, 'আমরা লিখি গর্দভ, পড়ি—গর্ধোব।' আসলে আমরা [গর্ধোব্]ই বলি; এবং একেই কি মান-উচ্চারণ ব'লে মান্য করা যায় না? 'বিজ্ঞান' ও 'বিজ্ঞানী' শব্দ দুটি ধরা যাক। 'বিজ্ঞান'-এর উচ্চারণ দেয়া হয়েছে [বিগ্‌গ্যান্], আর 'বিজ্ঞানী'র উচ্চারণ দেয়া হয়েছে [বিগ্‌গ্যানি]। 'বিজ্ঞান'-এর উচ্চারণে 'গ্যা' হওয়া কি খুবই দরকার? সোজা 'গা' হ'লে কি শিষ্টতা ক্ষুণ্ন হবে? 'কাগজি' শব্দটিকে 'কাগোজি'ই উচ্চারণ ক'রে থাকি আমরা, একে কেনো 'কাগ্‌জি' করা হলো? 'বাঙ্গলা, বাঙ্গালা, বাঙ্গালী' প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ দেখানো হয়েছে 'বাঙ্‌লা, বাঙ্‌লা, বাঙালি'। এটা ঠিক হয় নি। কারণ রূপ তিনটি পুরোনো, তার উচ্চারণও পুরোনোই হওয়া উচিত। তাছাড়া 'ঙ্গ' লিখলে অবধারিতভাবেই [ঙ্গ] উচ্চারণ করা দরকার। নইলে আমরা 'বঙ্গ, বঙ্গজ, বঙ্গবন্ধু,

বঙ্গভবন, বঙ্গীয়' প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ করবো [বঙো, বঙোজো, বঙোবোন্‌ধু, বঙোভবোন্‌, বোঙিও]। কিন্তু আমরা তা করি না; এবং এ-অভিধানেও শব্দগুলোর উচ্চারণ নির্দেশিত হয়েছে [বঙ্‌গো, বঙ্‌গোজো, বঙ্‌গোবোন্‌ধু, বঙ্‌গোভবোন্‌, বোঙ্‌গিও]। তাই যে-সমস্ত শব্দ 'ঙ্গ' দিয়ে লেখা হয়, তাদের উচ্চারণও তেমনি হবে। 'দিগ্‌গুল' শব্দটি ধরা যাক। যা লেখা আছে, তাতে এর উচ্চারণ [দিঙ্‌মন্‌ডোল্‌]; কিন্তু দেখানো হয়েছে[দিগ্‌মণ্‌ডোল্‌]। এখানে [গ] এলো কী ক'রে? এলে তো সন্ধির সময়েই এসে যেতো।

'শ্মশ্রু' ও 'শ্মশুল' শব্দ দুটির উচ্চারণ দেখা যাক। 'শ্মশ্রু'র উচ্চারণ নির্দেশিত হয়েছে [শৌস্‌স্রু]; কিন্তু 'শ্মশুল'র উচ্চারণ দেখানো হয়েছে 'শোঁস্‌শুলো'। দ্বিতীয় শব্দটিতে কেনো [শু] এলো, যেখানে বলা হয়েছে 'শ এবং স-এর সঙ্গে ঋ-কার, ন-ফলা, র-ফলা অথবা ল-ফলা যুক্ত হলে শ এবং স-এর উচ্চারণ ইংরেজি S-এর মত হয়'? 'সংস্কার, সংস্কারক, সংস্কৃত, সংস্কৃতি' প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ দেয়া হয়েছে [শঙ্‌শ্‌কার, শঙ্‌শ্‌কারোক্‌, শঙ্‌শ্‌কৃতো, শঙ্‌শ্‌কৃতি]। এগুলোর দ্বিতীয় উষ্মধ্বনিটি কি 'স'-এর মতো উচ্চারিত হবে না? নাকি দু-রকমেই উচ্চারিত হতে পারে? 'ষড়ুযন্ত্র, ষড়ুরস, ষড়ুঋতু' প্রভৃতিতে 'ষড়্‌' শব্দটিকে হসন্তযুক্ত রূপে পাই; এবং শব্দগুলোর উচ্চারণ দেয়া হয়েছে [ষড়ুজন্‌ত্রো, ষড়ুরশ্‌, ষড়ুরিতু]। শব্দগুলোর চলতি রূপ কি হসন্ত ছাড়া লেখা যেতো না? এগুলোর উচ্চারণ কি করা যায় না [শড়োজন্‌ত্রো, শড়োরস্‌, শড়োরিতু]?

সমাসবদ্ধ শব্দের প্রথম শব্দটিকে স্বরান্ত উচ্চারণ করার প্রবণতা একটু বেশিই চোখে পড়ে অভিধানটিতে। বাঙলা ভাষার সমকালীন প্রবণতা এর বিপরীত। 'বিষবৃক্ষ, বিষপ্রয়োগ, জলবায়ু, রসহীন' প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ নির্দেশিত হয়েছে [বিশোবৃক্‌খো, বিশোপ্‌প্রোয়োগ্‌, জলোবায়ু, রশোহিন্‌]। এগুলো একটু পুরোনো ধরনের উচ্চারণ। এখন তো [বিশ্‌ব্রিক্‌খো, বিশ্‌প্রোয়োগ, জল্‌বায়ু, রশ্‌হিন্‌] উচ্চারণই স্বাভাবিক মনে হয়। [বিশোব্রিক্‌খো] বললে [মেঘোনাদোবধো]ও বলতে হবে। মান-উচ্চারণের নামে আমরা উনিশশতককে কণ্ঠে পুর্নবাসিত করবো?

বাঙলা সংখ্যাশব্দের কয়েকটির উচ্চারণ বেশ বিশৃঙ্খল। যেমন, [বিআল্‌লিশ্‌] বলবো, না [বেয়াল্‌লিশ্‌]? দুটি ভুক্তিই রয়েছে এ-অভিধানে। তবে মানরূপ বিধিবদ্ধকরণের জন্যে একটি—[বেয়াল্‌লিশ্‌]—থাকলেই ভালো হতো। ৫২-কে কি এ-অভিধানের নির্দেশ-মতো [বাহান্‌নো] বলতে হবে? [বায়ান্‌নো] বলাই তো সমকালীন ও স্বস্তিকর। বিশেষ বিপজ্জনক হচ্ছে 'উন্‌' বা 'উনো' যুক্ত সংখ্যাশব্দগুলো। এ-শব্দগুলোর বানান এ-অভিধানে লেখা হয়েছে দীর্ঘ-ঊ দিয়ে। শব্দগুলো হ্রস্ব-উ দিয়েই লেখাই ভালো; তাতে শব্দগুলোকে বাঙলা ব'লে মনে হয়। কিছু শব্দে 'উনো'র উচ্চারণও 'উন্‌' হ'তে পারে। ২৯, ৩৯, ৪৯, ৫৯—কে [উন্‌ত্রিশ্‌, উন্‌চোল্লিশ্‌, উন্‌পন্‌চাশ্‌, উন্‌শাট্‌] বলা যায় না? এ-উচ্চারণ শুনতে কি খুব অশিষ্ট মনে হয়? অভিধানটিতে সমস্ত শেষ বর্ণের স্বরান্ত উচ্চারণ নির্দেশিত হয়েছে সংবৃত-অ দিয়ে। 'বিংশ, দ্বাবিংশ, দ্বাত্রিংশ,

দ্বাচত্বারিংশ'র মতো অচলতি শব্দের উচ্চারণও কি হবে সংবৃত-অ-অন্ত? এগুলোর অ-অন্ত উচ্চারণই তো স্বাভাবিক মনে হয়।

অভিধানটির শুরুতেই দেয়া উচিত ছিলো ধ্বনিপ্রতীকগুলোর একটি সারণী; তাতে পাঠকের পক্ষে সহজে ঠিক উচ্চারণটি আয়ত্ত করা সম্ভব হতো। একটি পরিশিষ্টও থাকতে পারতো, এবং তাতে স্থান পেতে পারতো বিচিত্র ধরনের ক্রিয়ারূপ ও উচ্চারণ। বাঙলাদেশে ক্রিয়ারূপের উচ্চারণেই গোলমাল হয় বেশি। ভূমিকার সূত্রগুলোর সাথে উদাহরণ দেয়া হ'লে উপকার হতো।

এ-দীর্ঘ আলোচনা এজন্যে যে অভিধানটি অভিনিবেশ দাবি করে। মান-উচ্চারণ বিধিবদ্ধকরণে এটি পরিচয় দিয়েছে চমৎকার দক্ষতার। বাঙালির মান-উচ্চারণ সুস্থিতিতে এটি পালন করবে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা। আশা করতে পারি যে অচিরেই প্রকাশ পাবে এর দ্বিতীয় সংশোধিত সংস্করণ; এবং এটি শিক্ষিত বাঙালির একটি প্রাত্যহিক গ্রন্থে পরিণত হবে। আরো দু-একটি কথা বলা দরকার। বাঙলা ভাষা এখনো একটি অচেনা মহাদেশের মতো; এর খুব সামান্য এলাকাই আমাদের জানা। কিন্তু বাঙলা ভাষার ধ্বনি-রূপ-বাক্য অর্থের অসংখ্য সূত্র উদঘাটিত হওয়া দরকার। শুধু বাঙলা ভাষা কেনো, বাঙালাদেশে আরো বহু ভাষা রয়েছে, সেগুলোও ব্যাপকভাবে বর্ণিত-বিশ্লেষিত হওয়া দরকার। ব্যক্তিগত উদ্যোগে এটা সম্ভব নয়; এর জন্যে দরকার শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। আমাদের বর্তমানের কোনো প্রতিষ্ঠান দিয়ে তা হবে না; কারণ আমাদের সব প্রতিষ্ঠানই দু-এক দশকে ক্লান্ত গর্দভে পরিণত হয়েছে। আমাদের দরকার একটি 'জাতীয় ভাষা একাডেমি', যার কাজ হবে বাঙলাদেশের সব ভাষা বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করা। ওই একাডেমি যদি থাকতো, তাহলে *ব্যাবহারিক বাংলা উচ্চারণ অভিধান* তার উদ্যোগেই প্রণীত হ'তে পারতো। কারণ এমন আনুশাসনিক কাজ সে-প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই করা সম্ভব, যার প্রতি জাতির আনুগত্য রয়েছে, বিশ্বাস রয়েছে। ওই প্রতিষ্ঠানের অভাবে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট এ-অভিধানটি প্রকাশ ক'রে শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠলো। *ব্যাবহারিক বাংলা উচ্চারণ অভিধান* আমাদের আশির দশকের ভাষাবিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর একটি ব'লে গণ্য হবে।

রচনাপঞ্জি

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৩৭ 'বাংলা বানানের নিয়ম'। তৃতীয় সংস্করণ। সংকলিত হুমায়ুন আজাদ (১৯৮৪)।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

১৩৩২ *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান*। প্রথম ভাগ। পুনর্মুদ্রণ ১৯৭৯। সাহিত্য সংসদ : কলকাতা।

ধীরানন্দ ঠাকুর

১৩৬১ *বাংলা উচ্চারণ-কোষ*। বুকল্যান্ড লিমিটেড : কলকাতা।

প্রমথ চৌধুরী

১৩১৯ 'বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাংলা ওরফে সাধুভাষা'। *ভারতী*, পৌষ। সংকলিত হুমায়ুন আজাদ (১৯৮৫)।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

১৩৩২ 'চ'লতি ভাষার বানান'। *প্রবাসী*, ২৫:২:২। সংকলিত হুমায়ুন আজাদ (১৯৮৪)।

মুহম্মদ আবদুল হাই

১৩৬৫ 'আমাদের বাংলা উচ্চারণ'। *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ২:১। সংকলিত হুমায়ুন আজাদ (১৯৮৪)।

১৯৬৪ *ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব*। বাংলা একাডেমী : ঢাকা।

মুহম্মদ ওসমান গনি ও অন্যান্য

?১৩৭৫ *বাংলা উচ্চারণ অভিধান*। টিচার্স ট্রেনিং কলেজ : ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২৯৮ 'বাংলা উচ্চারণ'। *রবীন্দ্ররচনাবলী* : ১২শ খণ্ড। সংকলিত হুমায়ুন আজাদ (১৯৮৪)।

১৩০৮ 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত'। *রবীন্দ্ররচনাবলী* : ১২শ খণ্ড। সংকলিত হুমায়ুন আজাদ (১৯৮৪)।

১৯৩৮ *বাংলাভাষা-পরিচয়*। পুনর্মুদ্রণ ১৯৬৯। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় : কলকাতা।

শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী

১৩০৮ 'ব্যাকরণ ও বাঙালা ভাষা'। *ভারতী*, ফাল্গুন।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৯৭২ *সরল ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*। নবীন সংস্করণ। বেঙ্গল পাবলিশার্স : কলকাতা।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৬৬ *বঙ্গীয় শব্দকোষ*। পুনর্মুদ্রণ ১৯৭৮। সাহিত্য অকাদেমি : নিউ দিল্লী।

হুমায়ুন আজাদ

১৯৮৪ *বাঙলা ভাষা*। প্রথম খণ্ড। প্রধান সম্পাদক। বাংলা একাডেমী : ঢাকা।

১৯৮৫ *বাঙলা ভাষা*। দ্বিতীয় খণ্ড। প্রধান সম্পাদক। বাংলা একাডেমী : ঢাকা।

AMARBOI.COM

বাংলা একাডেমীর বই :
নকল, ভুল, ও বিকৃত অনুবাদের উৎসব

বাংলা একাডেমী ভাষা-আন্দোলনের সন্তান। যে-স্বপ্ন বাঙালিকে তার প্রথম মহৎ বিদ্রোহে অনুপ্রাণিত করেছিলো, সে-স্বপ্নেরই এক বাস্তব রূপ বাংলা একাডেমী ('বাংলা একাডেমী' বানানে এখানে বাংলা একাডেমীর বানানই অনুসরণ করা হলো, যদিও আমি 'বাঙলা একাডেমি' বানানের পক্ষপাতী)। ভাষা-আন্দোলনে বাঙালি ঘোষণা করেছিলো তার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকার; ওই বিদ্রোহে বিজয়ের পর বাঙালি চেয়েছিলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যাকে মনে হবে তার স্বপ্নের বাস্তবায়ন, অস্তিত্বের সম্প্রসারণ। পৃথিবীর নানা দেশে এ-ধরনের একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তবে সেগুলো কোনো রাজনীতিক আন্দোলনের পরিণতি নয়। ১৫৮২তে ইতালিতে স্থাপিত হয় আকাদেমিয়া দেল্লা ক্রুস্কা, ১৬৩৫-এ স্থাপিত হয় ফরাশি একাডেমি, ১৭৮৬তে সুইডেনি একাডেমি, ১৮৩০-এ হাঙ্গেরীয় একাডেমি, ১৯৫৩তে হিব্রু একাডেমি। আঠারোশতকে ইংরেজি একাডেমি স্থাপনের নানা প্রস্তাব হয়েছিলো; তবে কোনো ইংরেজি একাডেমি স্থাপিত হয় নি। একাডেমি স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য ভাষার শুদ্ধ বা মানরূপ বিধিবদ্ধ করা; এবং সাহিত্য, সংস্কৃতি, জ্ঞানচর্চার পথ তৈরি করা। বাঙালিও চেয়েছিলো এমন একটি একাডেমি, যা বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিকাশে সক্রিয় থাকবে, নিয়োজিত থাকবে জ্ঞানচর্চায়। এমন বাসনা থেকেই ১৯৫৫ সালে স্থাপিত হয় 'বাংলা একাডেমী'। বাংলা একাডেমী একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান;—এর মূল দায়িত্ব ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিবিষয়ক বিভিন্ন গবেষণা পরিচালনা করা, ও প্রকাশ করা। একটু সরল ক'রে বলতে পারি বাংলা একাডেমীর কাজ হচ্ছে দেশের লেখকদের সৃষ্টিশীল ও মননশীল গ্রন্থ রচনায় উদ্বুদ্ধ করা, ও সে-সব রচনা প্রকাশ করা। বাংলা একাডেমী সৃষ্টিশীলতার এলাকাটিকে উপেক্ষা করেছে; বেছে নিয়েছে মননশীলতার এলাকাটি;—মননশীল, ছদ্মমননশীল, পাঠ্য, অনুবাদমূলক প্রভৃতি ধরনের বই প্রকাশ ক'রে আসছে ১৯৫৭ থেকে; এবং এ পর্যন্ত দেড় হাজারের মতো বই প্রকাশ করেছে। বাংলা একাডেমীর প্রকাশিত বইয়ের সঠিক সংখ্যা জানা যায় নি; তবে বশীর আল হেলালের *বাংলা একাডেমীর ইতিহাস* বইতে ১৯৫৭-১৯৮৫ সময়ের মধ্যে প্রকাশিত ১৩৫৫টি বইয়ের নাম পাওয়া যায় [তালিকাটি নির্ভুল নয়; আমার *বাক্যতত্ত্ব* (ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪) বইটির নাম তালিকায় নেই]। বাংলা একাডেমী অভিধান, পরিভাষা, বাঙলা ভাষা ও ভাষাবিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতিবিষয়ক কিছু বই প্রকাশ করেছে, প্রকাশ করেছে রচনাবলি, মধ্যযুগের কিছু বই, শিশুসাহিত্য ও নাটক, কিছু অনুবাদ, প্রকাশ করেছে লোকসাহিত্যের কিছু সংকলন ও গবেষণামূলক বই, এবং আইন, গণিত, পরিসংখ্যান, প্রদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, ভূগোল, চিকিৎসাবিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান ও বিভিন্ন বিদ্যার কয়েক শো পাঠ্যবই। পাঠ্যবই প্রকাশ বাংলা একাডেমীর একটি বড় দায়িত্ব; কেননা বাঙলায় উচ্চ

AMARBOI.COM

শিক্ষা দেয়ার যে-সিদ্ধান্ত আমরা বার বার নিচ্ছি, ও ব্যর্থ হচ্ছি, তা বাস্তবায়নের জন্যে পাঠ্যবই অত্যন্ত জরুরি। পাঠ্যবই, রবীন্দ্রনাথের কথায়, আগাছা নয় যে নিজের আবেগে নিজেই পুলকিত হয়ে দেখা দেবে, আর গোলাপও নয় যে কেউ শখ ক'রে চাষ করবে. পাঠ্যবই লেখা হয় প্রয়োজন দেখা দিলে, বা প্রয়োজনে সুপরিকল্পিতভাবে লিখিত হয় পাঠ্যবই।

বাংলা একাডেমী কি বই লেখার জন্যে লেখক বা জ্ঞানীদের উৎসাহিত করে? বলা যায় করে না; অধিকাংশ লেখকই বই লেখেন নিজের উৎসাহে, জমা দেন একাডেমীতে; দীর্ঘ সময় পর নানা প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে গিয়ে ওই বই কখনো গৃহীত হয়, কখনো হয় না; কখনো প্রকাশিত হয়, কখনো প্রকাশের অপেক্ষায় প'ড়ে থাকে। সুসম্পর্ক দরকার পড়ে; যদি থাকে, তবে বই বেরোয় তাড়াতাড়ি, না থাকলে দেরি হয়। বাংলা একাডেমী অনেক সময় শক্তিমান ও সম্পর্কিতদের দিয়েই বই লিখিয়ে নেয়; যাঁরা লেখক ছিলেন না তাঁদের লেখক ক'রে তোলে। বই প্রকাশের জন্য গৃহীত হবে কি হবে না, তার জন্যে পর্যালোচনার ব্যবস্থা রয়েছে একাডেমীতে। পর্যালোচনা ব্যাপারটি বড়ো সন্দেহজনক। পর্যালোচনার জন্যে অনেক সময় বই পাঠানো হয় লেখকের প্রিয়জনের কাছে, যাতে বইটি না প'ড়েই গৃহীত হয়; আবার পাঠানো হয় লেখকের বিরোধীদের কাছে, যাতে বইটি আটকে যায়। এমনও দেখা গেছে পর্যালোচক যে-বই প্রকাশের জন্যে মত দেন নি, তাও প্রকাশিত হয়েছে। পর্যালোচনার একটি সমস্যা রয়েছে;—সমস্যাটি হচ্ছে কার বই কে পর্যালোচনা করবেন? অনেক বই রয়েছে, যা পর্যালোচনার যোগ্যই কেউ নেই বাঙলাদেশে; তবু ওই বই পর্যালোকের কাছে পাঠানো হয়, এমন একজনের কাছে পাঠানো হয় যিনি ওই বিষয়ে কিছু জানেন না। তিনি কিছু জানেন না, তবু তাঁর মতই চূড়ান্ত। বাংলা একাডেমী একটি সত্যে পৌঁচেছে যে যাঁরা লেখক, তাঁরা বই লিখবেন, আর যাঁরা কখনো লেখেন না, বা এক-আধবার লিখেছেন, তাঁরা পর্যালোচনা করবেন। পর্যালোচকেরা লেখকের ওপরে। দেশে অনেকে আছেন, যাঁরা নিজেদের বিষয়ে শ্রেষ্ঠ; তাঁদের বইও পাঠানো হয় নিকৃষ্টদের কাছে। বই গৃহীত হয়েও প'ড়ে থাকে অনেক সময় অনেক বছর। আমার নিজেরই একটি বই—*প্রবন্ধাবলি*—পাঁচ বছর ধ'রে গৃহীত হয়ে প'ড়ে আছে, কিন্তু এ-বই গৃহীত হওয়ার পর লিখিত হয়েছে যে-বই, তাও বেরিয়ে গেছে তিন বছর আগে। অনেকের মতে বাংলা একাডেমীর কর্মকর্তাদের ও তাঁদের প্রিয়জনদের বই একাডেমী থেকে দ্রুত বেরোয়, ছাপাও হয় বেশি সংখ্যক। কেউ কেউ পরিণত হয়েছেন বাংলা একাডেমীর ঘুণপোকায়;—তাঁরা কাঠামো ও অবকাঠামো জুড়ে আছেন বাংলা একাডেমীর।

বাংলা একাডেমীর বইগুলোর চরিত্র কী, মান কেমন? একটি কথা ব'লে নিতে চাই;—বাংলা একাডেমীর বইগুলো সম্বন্ধে আমি কিছু সত্য কথা বলতে চাই, এতে কোনো বিদ্বেষ নেই, বলছি সত্যেরই অনুরোধে, জাতির সত্য জানা দরকার। উদাহরণ হিশেবে আমি কোনো কোনো বইয়ের নাম উল্লেখ করবো, সে-বই হয়তো আমারই কোনো প্রিয়জনের লেখা; হয়তো ওই বইয়ের থেকেও খারাপ বই বেরিয়েছে একাডেমী

থেকে, তবে আমার চোখে পড়ে নি ব'লে উল্লেখ করতে পারি নি। আমরা কি আশা করবো যে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত বইগুলো হবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বইগুলোর পর্যায়ের? আমাদের লেখকেরা, মননশীল লেখকেরা কি ওই পর্যায়ে পৌঁচেছেন? গবেষণায় কি তাঁরা সব সময়ই প্রস্তাব করবেন নতুন তত্ত্ব, তথ্য ব্যাখ্যা করবেন অভিনব রীতিতে, প্রবন্ধে তাঁরা ব্যক্ত করবেন মৌলিক চিন্তা ও সিদ্ধান্ত? পাঠ্যপুস্তকের কথাই ধরা যাক;—বাঙলাদেশের কোনো এলাকায় কি রয়েছেন কেউ, যিনি তাঁর এলাকায় মৌলিক স্রষ্টা, এবং রচনা করতে পারেন একটি মৌলিক পাঠ্যপুস্তক? পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত, অর্থনীতি, আইন, ভূগোল, চিকিৎসা, সাহিত্য কোনো এলাকায়ই কি কেউ আছেন, যাঁর বই হবে ইংরেজি, ফরাশি, রুশ, জাপানি বা জর্মন মানের? এখানকার জ্ঞানীরা সবাই পরনির্ভর, তাঁদের পক্ষে সম্ভব শুধু বিদেশি পুস্তক অবলম্বন ক'রে বাঙলা ভাষায় একটি উপকারী পাঠ্যপুস্তক রচনা করা। এটাও উপকারী কাজ, খুবই উপকারী; কেননা কোনো বিষয়ে সব কিছু আয়ত্ত ক'রে মৌলিক বই লিখতে চাইলে তা কখনো লেখা হয়ে উঠবে না। সব কিছু আয়ত্তের সুযোগই নেই বাঙলাদেশে। বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত যে-কোনো পাঠ্যবই একথার সাক্ষ্য দেবে। মোহাম্মদ আবদুল জব্বারের *প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা* (১৯৭৬) বইটির কথাই ধরা যাক। বইটির কয়েক পাতা পড়লেই বোঝা যায় এটা মৌলিক বই নয়, লেখক বিভিন্ন বই অবলম্বন ক'রে, তিরস্কার করতে চাইলে বলতে পারি নকল ক'রে, বইটি লিখেছেন। ৭৫০ পাতার এ-বইটিতে কোনো উৎসনির্দেশ নেই, যদিও লেখক আলোচনা করেছেন মিসর, বেবিলনিয়া, গ্রিস, আরব, ভারতীয় ও চীনের পুরোনো জ্যোতির্বিদ্যা। বইয়ের শেষে তিনি গ্রন্থপঞ্জিতে কয়েকটি বইয়ের নাম করেছেন। বুঝতে পারি ওই বইগুলো আশ্রয় ক'রে তিনি বইটি লিখেছেন, মূল তথ্য তিনি ঘাঁটেন নি, ঘাঁটলে বইটি লেখা হতো না। তিনি শুধু বিদেশি ভাষা থেকে নেন নি, নিয়েছেন বাঙলা ভাষায় লেখা বই থেকেও, যদিও বইয়ের ভেতরে কোথাও স্বীকার করেন নি। এম আকবর আলির *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান* (১৯৪৩) বইটির সাথে মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায় আবদুল জব্বার প্রচুর নিয়েছেন আকবর আলির থেকে। আকবর আলি লিখেছেন, 'আল মনসুরের বিদ্বান সভায় ৭৬৭ খৃঃ অব্দে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক কঙ্কের সঙ্গে ইয়াকুব এবনে তারিকের সাক্ষাৎ লাভ ঘটে। খুব সম্ভব তাঁরই অনুপ্রেরণায় তারিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের দিকে মন দেন' (পৃ ৩৬)। আবদুল জব্বার লিখেছেন, '৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে খলিফার দরবারে ভারতীয় পণ্ডিত কঙ্কের সঙ্গে এঁর (অর্থাৎ ইয়াকুব এবনে তারিক) পরিচয় ঘটে, এবং কঙ্কের অনুপ্রেরণাতেই তিনি জ্যোতির্বিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হন' (পৃ ২০৯)। মুসলিম জ্যোতির্বিদ্যা আলোচনায় আবদুল জব্বার নানা স্থানে নকল করেছেন আকবর আলির। এছাড়া ডেয়ার, বেরি, ক্যানিকোয়েক, নিডহ্যাম প্রমুখের বই থেকে স্বীকার না ক'রে নিয়েছেন বই জুড়ে। এ-বইটিকে কী চোখে দেখবো? নকল ব'লে ধিক্কার দেবো, নাকি বলবো এটি বাঙলায় লেখা একটি উপকারী বই, যদিও মৌলিক বই নয়? বাংলা একাডেমীর প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকের কোনোটিই মৌলিক নয়, বিদেশি বই আশ্রয় ক'রেই রচিত এগুলো; আর মানও উন্নত নয়। একই বিষয়ে একটি মার্কিন, বা ফরাশি, বা জর্মন ও

AMARBOI.COM

বাংলা একাডেমীর পাঠ্যবই তুলনা করলেই তা ধরা পড়ে।

বাংলা একাডেমী অনেক বই ছেপেছে, যা ছাপারও অযোগ্য। *চেতনার অনুষঙ্গ* (১৯৮২) নামে একটি বড়ো প্রবন্ধের বই ছেপেছে একাডেমী;—এটির অনেক প্রবন্ধ দৈনিকেও প্রকাশের যোগ্য নয়, কিন্তু ছেপেছে একাডেমী। 'রচনাবলি'গুলোর কথাই ধরা যাক। *নজরুল রচনাবলি*কে বাংলা একাডেমীর একটি বড়ো কাজ মনে করা হয়—বেশ ভালো কাজ এটি; কিন্তু বইয়ের শেষে যে-তথ্য আছে, তা খুবই অসম্পূর্ণ। *রোকেয়া রচনাবলি*তে দেখা যায় *অবরোধবাসিনী*র ভূমিকায় পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িকতাবশত 'ভারতের অবরোধবাসিনীদের' করা হয়েছে 'পাক-ভারতের অবরোধবাসিনীদের'; এবং এমন একটি অপরাধ এখনো চলছে। বাঙলা কবিতার একটি ফরাশি অনুবাদ গ্রন্থ (১৯৮৬) ছেপেছে একাডেমী; বইটিতে ভালো কবিরা বাদ পড়েছেন, কিন্তু একাডেমীর মহাপরিচালকেরা স্থান পেয়েছেন, যদিও কবি হিশেবে তাঁরা গৌণ। *অভিধান* (১৯৮৯) নামে একটি বই ছেপেছে একাডেমী;—কয়েকটি বাঙলা বই নির্ভর ক'রে লেখা এ-লঘু বইটি ছাপার কী দরকার ছিলো? একাডেমীর দুটি মোটা ও বিখ্যাত বইয়ের কথা ধরা যাক। *বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান* (১৯৬৫, ১৯৭৩) খ্যাতিমান, কিন্তু এটি আঞ্চলিক শব্দ সংগ্রহের বেশি কিছু হয়ে ওঠে নি। বইটির ভূমিকার সব কিছুই নেয়া হয়েছে জর্জ গ্রিয়ারসন থেকে। উপভাষাবিজ্ঞানের যে-বিবর্তন ঘটেছে, তার বিন্দুমাত্র ছাপ নেই বইটিতে, এমন কি সংকলিত শব্দগুলোর অঞ্চলও ঠিক মতো দেখানো হয় নি। প্রথম পাতার দুটি শব্দ নিচ্ছি—'অঅগা' ও 'অঅদ'। শব্দ দুটিকে দেখানো হয়েছে বাকেরগঞ্জের ব'লে, হয়তো সেখানে আছে শব্দ দুটি, তবে শব্দ দুটি প্রচলিত বিক্রমপুরেও। উপভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে বইটির মূল্য সামান্য। *বাংলাদেশের ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (১৯৮৪) বিরাট বই, তবে ব্যবহারিক নয়। অভিধানটি তৈরি হয়েছে কয়েকটি প্রচলিত অভিধান নকল ক'রে। বাংলা একাডেমীর কি প্রকাশ করার কথা এমন নকল অভিধান? ইতালীয়, ফরাশি প্রভৃতি একাডেমির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ওই ভাষার অভিধান সংকলন, বলা যায় যে অভিধানই একাডেমি; কিন্তু বাংলা একাডেমী প্রকাশ করেছে একটি নকল অভিধান। অভিধানটির সম্পাদক বলেছেন, 'নানা আনাড়ী লোকের হাতে ঘুরিয়া অভিধানটি যেই অবস্থায় আমার হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহার বিশেষ উন্নতি সাধন আমার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।' সম্পাদকের কথানুসারে এটাকে বলা যায় 'আনাড়ির অভিধান', যা প্রকাশ করেছে একটি একাডেমী। সম্পাদক নিজেও কম যান নি। ভূমিকায় তিনি 'অনিকেত'কে আহসান হাবীবের শব্দ, আর 'আধার'কে বোরহানুদ্দীনের শব্দ (পৃ-দুই) বলেছেন, অর্থাৎ এ-লেখকেরাই এ-শব্দ দুটি প্রথম ব্যবহার করেন। সুধীন্দ্রনাথ এ-শব্দ দুটি সেই কবে প্রয়োগ করেছেন, এখন আমাদের নতুন ক'রে জানতে হলো যে এগুলো অন্য কারো। এই হচ্ছে অভিধানের ভেতরের পাণ্ডিত্য। শব্দের ক্রমে, শব্দ নির্দেশে, সংজ্ঞা রচনায় কতো ভুল রয়েছে, কোন অভিধান থেকে নকল করা হয়েছে, স্থানাভাবে এখানে তাতে যাচ্ছি না। ধরতে পারি *ছোটদের অভিধানটি*কেও (১৯৮৩), যা সংকলিত হয়েছে একগুচ্ছ 'আনাড়ি সম্পাদক' দ্বারা। এটিতে শব্দ নির্দেশে ও অর্থ নির্দেশে ভুলের কোনো শেষ নেই। 'ভাল'

(পৃ ২১৫) শব্দের অর্থ যেমন দেখানো হয়েছে 'উত্তম', তেমনি 'কপাল'। এখানে রয়েছে দুটি শব্দ, উচ্চারণও ভিন্ন শব্দ দুটির; কিন্তু এ-অভিধানে হয়েছে একটি শব্দ, যাতে কিশোররা শুরু থেকেই ভুল শেখে। 'স্বাধীনতা' (পৃ ৩০১) শব্দের অর্থ দেয়া হয়েছে 'আজাদি', যেনো শিশুদের বাঙলা বোঝার জন্যে ফারসি শিখতে হবে আগে; 'স্বেচ্ছাচার' (পৃ ৩০২) শব্দের অর্থ দেয়া হয়েছে 'স্বাধীনতার অপব্যবহার', আর 'যিশু'র (পৃ ১৪৪) পরিচয় দেয়া হয়েছে 'খ্রীষ্ট ধর্মের প্রবর্তক, ইহুদীরা যাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করে'। ইহুদীরা হত্যা করেছিলো যিশুকে, না রোমান শাসক (পন্তিয়ুস পাইলেত)? সম্পাদকেরা অভিধানটি ভ'রে ভুল অর্থ ও সংজ্ঞা দিয়েছেন, কিন্তু নিজেদের অমর ক'রে রেখেছেন। অভিধানটিতে মাঝে মাঝে শব্দের প্রয়োগের উদাহরণ দেয়া হয়েছে, তাতে দেখা যায় বাংলা একাডেমীর কর্মচারী ও সম্পাদকদের বাক্য উদাহরণ হিশেবে দেয়া হয়েছে। 'পলি' (পৃ ১০৬), 'পাহারা' (পৃ ১৬৭-৬৮), 'পুচ্ছ' (পৃ ১৬৯), 'ফুরফুর' (পৃ ১৮২), 'বনাত' (পৃ ১৮৬) প্রভৃতির প্রয়োগ শেখানোর জন্যে সম্পাদকেরা নিজেদের লেখা থেকে গবেষণা ক'রে উদাহরণ সংকলন করেছেন। এই হচ্ছে বাংলা একাডেমীর অভিধান প্রণয়নতত্ত্ব। অভিধানটিতে 'সৈয়দ মোতাহের হোসেন চৌধুরী' (পৃ ২০৩, ২২৩) নামক একজন লেখকের বাক্যও প্রয়োগের উদাহরণ হিশেবে দেয়া হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে সৈয়দ-চৌধুরীসম্পন্ন দ্বৈত উপাধিকারী কে এঁ লেখক? তিনি কি সংকলকদের কোনো আবিষ্কার? *বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ* (১৯৮৮) বইটি হাতে নিয়ে স্তম্ভিত হ'তে হয়; কিছুতেই বোঝা যায় না এ-তুচ্ছ বইটির জন্যে পাঁচজন প্রবীণ সম্পাদকের কেনো দরকার পড়লো, আর তাঁরাই বা কী করলেন? তাঁরা প্রবীণ, কিন্তু কেউ ভাষাবিজ্ঞানী নন; ভাষার প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ, শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা সম্পর্কে তাঁদের ধারণা এতো পুরোনো যে এখন অচল। বইটির সাম্প্রতিক অপপ্রয়োগের কোনো উদাহরণ পাওয়া যায় না, যে-সব উদাহরণ বিভিন্ন বইপুস্তকে পাওয়া যায়, তাই এখানে খণ্ডিতভাবে সংগৃহীত হয়েছে। বইটি শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা, প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ সম্পর্কে কোনো ধারণা দেয় না পাঠককে, যদিও অপধারণা দেয় অনেক। বইটির 'প্রসঙ্গ-কথা'য় মহাপরিচালক নিজেই অপপ্রয়োগ করেছেন দুটি শব্দ : একটি 'সচেতনতা', অন্যটি 'অনস্বীকার্য'। দুটিই ভুল শব্দ, তবে প্রথমটিকে মেনে নেয়া গেলেও দ্বিতীয়টিকে মানা যায় না। বইটিতে 'ফলশ্রুতি' (পৃ ৩৭) সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'আভিধানিক অর্থ পুণ্যকার্ম করলে যে ফল হয় তার বিবরণ বা তা শোনা।' আসলেই কি এর অর্থ এই? শব্দটি তো মূলত 'শ্রুতিফল', যার অর্থ 'বেদ প্রভৃতি পুণ্যগ্রন্থের পাঠ শোনার পুণ্য', অর্থাৎ 'শ্রুতির ফল'। 'শ্রুতিফল' বিপর্যয়গ্রস্ত হয়ে হয়েছে 'ফলশ্রুতি', এখন ফলাফল অর্থে, নিরর্থকভাবে, ব্যবহৃত হয়। বইটিতে 'অংক' (পৃ ৩৯) বানানকে অশুদ্ধ ব'লে নির্দেশ করা হয়েছে, তবে একাডেমীর *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*-এ 'অংক' বানানটিই আছে প্রথমে। 'অংক' বানানকে এখানে যাঁরা ভুল মনে করেন, তাঁরা খুবই ভুল জগতে আছেন। বইটিতে 'প্রচার-মাধ্যমে ভাষার অপপ্রয়োগ' অংশে কিছু অশুদ্ধ উদাহরণের শুদ্ধ রূপ দেখানো হয়েছে। কতো তারিখের কোন পত্রিকা থেকে এগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে, তা দেখানো হয় নি ব'লে উদাহরণগুলোকে মনে হয় বানানো। এগুলো বিশৃঙ্খল উদাহরণ

মাত্র; সাম্প্রতিক বাক্যিক অপপ্রয়োগের কোনো সূত্র উদঘাটনের চেষ্টা এতে নেই। অশুদ্ধ উদাহরণের যে-শুদ্ধ রূপ দেয়া হয়েছে বইটিতে, তার বেশ কিছু পরিচ্ছন্নরূপে অশুদ্ধ। একটি উদাহরণ দিই। 'বিশ্ব কাপ ক্রিকেটে, আজ সকালে রাওয়ালপিণ্ডিতে পাকিস্তান, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলবে' (পৃ ৮৭) বাক্যটিকে দেখানো হয়েছে অশুদ্ধ ব'লে; এবং এর শুদ্ধরূপ দেয়া হয়েছে—'রাওয়ালপিণ্ডিতে বিশ্বকাপ ক্রিকেটে পাকিস্তান আজ সকালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলবে।' এটা কি শুদ্ধ হলো, বাঙলা হলো? ইংরেজির প্রভাবে সম্পাদকেরা বুঝতে পারেন নি যে বাঙালিরা 'বিরুদ্ধে' খেলে না, 'সঙ্গে বা সাথে' খেলে; তাই শুদ্ধ বাঙলা হওয়া উচিত—'রাওয়ালপিণ্ডিতে বিশ্বকাপ ক্রিকেটে পাকিস্তান আজ সকালে ইংল্যান্ডের সঙ্গে/সাথে খেলবে।' পুরোনো শুদ্ধতাবাদী অনেকে আরো এগিয়ে যেতে পারেন, বলতে পারেন পাকিস্তান বা ইংল্যান্ড কেউ খেলতে পারে না, খেলতে পারে শুধু দু-দেশের ক্রিকেট দল; তাই বাক্যটির শুদ্ধরূপ হবে—'রাওয়ালপিণ্ডিতে বিশ্বকাপ ক্রিকেটে পাকিস্তান দল আজ সকালে ইংল্যান্ড দলের সঙ্গে/সাথে খেলবে।' তাই এ-বইয়ে দেখানো শুদ্ধরূপটি শুধু অশুদ্ধ নয়, তা বাঙলাই নয়; তা ইংরেজির নকল। বইটিতে সাম্প্রতিক অপপ্রয়োগগুলোর কোনো পরিচয় নেই; কারণ বইটি নকল ক'রে লেখা, সাম্প্রতিক ভাষাপ্রয়োগ পর্যবেক্ষণ ক'রে লেখা হয় নি। এখন 'বক্তব্য রাখছি', 'বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন', 'সাত দিন থেকে বৃষ্টি হচ্ছে', 'সহসা যাবো না', 'পরবর্তীতে', 'লাখলাখ জনতা' ধরনের বিচিত্র অপপ্রয়োগ দেখা যাচ্ছে, তার কোনো পরিচয় বইটিতে নেই। বইটি সুপ্রয়োগ না শিখিয়ে ব্যবহারকারীদের অপপ্রয়োগ শেখাবে অনেক। তাহলে পাঁচজন সম্পাদক কী করলেন?

বাংলা একাডেমীর কিছু বই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড়ো করা হয়েছে, সম্ভবত সম্মানীর জন্যে; ওই বইগুলো হ'তে পারতো প্রকাশিত আকারের অর্ধেক। আইনের কিছু বই চোখে পড়ে, যাতে অপ্রয়োজনীয় কথা পাতার পর পাতা বলা হয়েছে, উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে বড়ো বড়ো; একটি বইতে, শুনেছি, বাঙলাদেশের পুরো সংবিধানটিই ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। *সংগীতকোষ* (১৯৮৭), *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব* (১৯৮৫), *বাংলাদেশের ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (১৯৮৪) ও আরো অনেক বই রয়েছে বাংলা একাডেমীর, যেগুলোকে বলা যায় ফাঁপা বই। কিছু বই আছে, লেখক হিশেবে যাঁদের নাম ছাপা হয়েছে প্রচ্ছদে ও ভেতরে, তাঁরা লেখক নন, সংকলক মাত্র। *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত* (১৯৭৭), *উনিশশতকে বাংলাদেশের সংবাদসাময়িকপত্র* (১৯৮৫) প্রভৃতি সংকলিত গ্রন্থ; সংবাদপত্র থেকে নকল ক'রে, আজকাল প্রতিলিপিযন্ত্রের কল্যাণে যান্ত্রিকভাবে এমন বই উৎপাদন করা যায়। এমন বইয়ের প্রচ্ছদে ও ভেতরে সংকলক হিশেবে নাম থাকা উচিত সংকলনকারীদের, কিন্তু বাংলা একাডেমীর বইতে তাঁদের নাম আছে লেখক হিশেবে। সম্মানীর জন্যে এ-ব্যবস্থা করা হয়েছে হয়তো। এসব বইয়ের মূল্য শুধু তথ্যের জন্যে নয়, ভূমিকাও বিশেষ মূল্যবান; কিন্তু এ-বই দুটির ভূমিকা শোচনীয়। সম্পাদনা একটি আকর্ষণীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে একাডেমীর ভেতরের অনেকের কাছে; তাঁরা সম্পাদনা করছেন নানা কিছু—যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক। *ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্মারকগ্রন্থ* (১৯৮৭) নামক সংগ্রহটির জন্যে কি

এ-সম্পাদক উপযুক্ত; আর *শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা গ্রন্থ*-এর (১৯৬৭) পর এমন একটি সংকলন পুরোপুরি হাস্যকর।

বাংলা একাডেমীর খুব কম বইই মূল্যবান। অধিকাংশ বইই তুচ্ছাতিতুচ্ছ চিন্তার প্রকাশ, অসংখ্য বই ইংরেজি বইয়ের—এমনকি বাঙলা বইয়ের—নকল; কিন্তু লেখকেরা তা স্বীকার করেন নি। তাঁরা নকল করেছেন, বিশৃঙ্খলভাবে অনুবাদ করেছেন, অনেকে ইংরেজি না বুঝেই অনুবাদ করেছেন, এবং বই হয়ে উঠেছে ভয়াবহ। যদি পাঠ্যবইয়ে ভুল থাকে, তবে তা অবিলম্বে পরিত্যাজ্য; ভুল পাঠ্যবই এইডসের থেকেও ক্ষতিকর। অনুবাদ কতোটা ভুল, বিকৃত হ'তে পারে, তা একাডেমীর কিছু বই না দেখলে বিশ্বাস হয় না। বিস্ময়কর হচ্ছে যে ওই বই পর্যালোচকদের অনুমোদন পেয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে, ছাত্ররা পড়ছে;—লেখক জানেন না তিনি কী লিখেছেন, ছাত্ররা জানে না তারা কী রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। আমি কিছু নকল, ভুল ও বিকৃত অনুবাদভরা বইয়ের পরিচয় দেবো, যাতে পাঠকেরা বুঝতে পারেন কী ঘটছে একাডেমীর বইতে, ও আমাদের জ্ঞানের অন্ধকার এলাকায়। সব বইয়ের পরিচয় দেয়া সম্ভব নয়, সুযোগও নেই; যে-সব বই আকস্মিকভাবে আমি পড়েছি, তার কয়েকটির পরিচয়ই আমি দেবো। পাঠক দেখবেন বাংলা একাডেমীর বই হচ্ছে স্বীকার-না-করা নকল, ভুল ও বিকৃত অনুবাদের উৎসব।

নকল, ভুল ও বিকৃত অনুবাদের বিবরণ

একাডেমীর বইয়ের স্বীকার-না-করা নকল, ভুল ও বিকৃত অনুবাদ কতোটা শিহরণজাগানো শোচনীয় রূপ ধরেছে, এগারোটি বই থেকে তার পরিচয় দিচ্ছি, যদিও এগারো শো বই থেকেই এর পরিচয় দেয়া যেতো। বইগুলো হচ্ছে (১) আবুল কালাম মনজুর মোরশেদের *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব* (১৯৮৫; তবে তাঁর *বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনাম : গঠন ও প্রকৃতি* (১৯৮৫) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত *Relativization in Bengali* (১৯৮৬) বই দুটিও প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচিত হবে); (২) আমিনুল ইসলামের *প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাশ্চাত্য দর্শন* (১৯৭৮), (৩) *সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শন* (১৯৮২), (৪) *মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন* (১৯৮৫); (৫) মোহাম্মদ আবদুল হালিমের *গ্রীক দর্শন : প্রজ্ঞা ও প্রসার* (১৯৭৫, দ্বিস ১৯৮১); (৬) সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেনের *ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস* (১৯৮৪); (৭) কবীর চৌধুরীর *সাহিত্যকোষ* (১৯৮৪); (৮) সরদার ফজলুল করিমের *দর্শনকোষ* (১৯৭৩); (৯) সাইয়েদ আবদুল হাইয়ের *দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষাকোষ* (২য় খণ্ড, ১৯৮৬); (১০) নরেন বিশ্বাসের *প্রসঙ্গ : বাঙলা ভাষা* (১৯৮৫); ও (১১) শামসুজ্জামান খান, সেলিনা হোসেন সম্পাদিত *চরিতাভিধান* (১৯৮৫)। লেখকেরা, এক-আধজন ছাড়া, কেউ স্বীকার করেন নি যে বইগুলো তাঁরা লিখেছেন অন্য বই নকল বা নির্ভর করে, আর বইয়ের ভেতরে উৎসনির্দেশ প্রায় নেই। পাতার পর পাতা নকল করেছেন তাঁরা, কেউ কেউ না বুঝে করেছেন শোকাবহ বিকৃত অনুবাদ, আর বই ভুলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। শুধু ইংরেজি থেকেই নকল করেন নি, বাঙলা বই থেকেও নকল করেছেন কেউ, কেউ নকল করেছেন একাডেমীর বই থেকেই।

এবার উদঘাটন করা যাক নকল, ভুল ও বিকৃত অনুবাদের চরিত্র।

[১] *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব* : আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ

আধুনিক ভাষাতত্ত বইটি শুধু পুরোপুরি নকলই নয়, এর বিষয় ও ভাষা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভুল ও বিকৃতিতে পরিপূর্ণ। জনাব মোরশেদ মূল বই ভালোভাবে না প'ড়ে না বুঝে বইয়ের এখানসেখান থেকে থাবা দিয়ে দিয়ে নকল করেছেন, তিনি বোঝেন নি মূল লেখক কী লিখেছেন, আর তিনিই বা কী অনুবাদ করছেন। বইটি ভুল ও বিকৃত অনুবাদের এক শোচনীয় অতুলনীয় উদাহরণ। তিনি যা ব্যাখ্যা করেছেন, তা বোঝেন নি; তাই ধারাবাহিকভাবে ভুল করেছেন। বিষয়, ভাষা, ও অনুবাদের এতো অজস্র ভুল ও বিকৃতি রয়েছে যে বইটিকে গণ্য করা যায় ভুল-বিকৃতির ইতিহাসের চূড়ান্ত রেকর্ডরূপে, যা হয়তো কেউ কখনো ভাঙতে পারবে না। এলোমেলো, বিশৃঙ্খল, ভুল ও বিকৃত নকল করেছেন তিনি *Arlotto*র *Introduction to Historical Linguistics* (১৯৭২), Dinnen-এর *An Introduction to General Linguistics* (১৯৬৭), Gelb-এর *A Study of Writing* (১৯৫২), King-এর *Historical Linguistics and Generative Grammar* (১৯৬৯), Lehmann-এর *Historical Linguistics : An Introduction* (১৯৬৬), Lyons-এর *Semantics* (১৯৭৭) ও আরো কয়েকটি বই থেকে। উৎসনির্দেশ তিনি বিশেষ করেন নি, আবার এমন উৎসনির্দেশ করেছেন, তাঁর 'সহায়ক গ্রন্থ'-এর তালিকায় যার উল্লেখ নেই। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নকল করেছেন তিনি, বুঝে-না-বুঝে নকল করেছেন পাতার পার পাতা জুড়ে, ভুল নকল করেছেন, ও একটি শোচনীয় বই লিখেছেন। তাঁর বাঙলা ভাষা ও ভুলবিকৃতির উদাহরণস্থল; তাঁর বই প'ড়ে মনে হয় ভাষার শুদ্ধতা সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণাই নেই। তাঁর তিনটি মৌলিক দুর্বলতার জন্যে বইটি এমন ভুলবিকৃতিতে বোঝাই হয়ে উঠেছে : (এক) তিনি ইংরেজি ঠিক মতো বোঝেন না, (দুই) তিনি শুদ্ধ বাঙলা লিখতে পারেন না, ও (তিন) ভাষাবিজ্ঞান তিনি ঠিক মতো বোঝেন না। প্রথম আমি তাঁর ভুল-বিকৃত-কিম্ভুত বাঙলা ভাষা ও বিষয় ভুলভাবে উপস্থাপনের উদাহরণ দেবো, পরে দেবো ভুল নকলের নমুনা।

বইয়ের শুরুতেই তিনি 'ভাষা'র যে-সংজ্ঞা দিয়েছেন, সেটিই ভুল বাঙলার চমৎকার উদাহরণ। তিনি লিখেছেন, 'ভাষা হচ্ছে কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনির সাহায্যে অর্থবোধক ভাষাতাত্ত্বিক উপাদন দ্বারা গঠিত এবং বিশেষ সম্প্রদায় দ্বারা ব্যবহৃত' (পৃ ১)। বাক্যটিতে 'হচ্ছে' থাকার কথা নয়, আর থাকলে 'ব্যবহৃত'র পরে একটি বিশেষ্যপদ থাকার কথা। ইংরেজি থেকে অনুবাদ করতে গিয়ে এ-বিপত্তি ঘটেছে। তাঁর 'ভাষা'র দ্বিতীয় সংজ্ঞাটি গোলমালের আরেক দৃষ্টান্ত। তিনি লিখেছেন, 'ভাষা কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনি দ্বারা গঠিত ভাষাতাত্ত্বিক উপাদান' (পৃ ১)। 'ভাষা' হচ্ছে 'ভাষাতাত্ত্বিক উপাদান'! ভেবে দেখুন কেমন হাস্যকর কথা এটি! তিনি লিখেছেন, 'ভাষা হচ্ছে মানুষের স্বেচ্ছাক্রিয় আচরণ' (পৃ ২)। 'স্বেচ্ছাক্রিয়' কাকে বলে, এমন শব্দ আছে? তিনি হয়তো বলতে চান 'স্বেচ্ছাকৃত'। তিনি লিখেছেন, 'ভাষা হচ্ছে একটি রীতি, ঐতিহ্য, এবং সামাজিক বিধান এবং যারা একই ঐতিহ্য বিশ্বাসী তাদের মাধ্যমে ব্যবহৃত।' (পৃ ২)। সংজ্ঞাটি

নিরর্থক, ও এর ভাষা নানাভাবে বিকৃত। এখানেও 'হচ্ছে' আছে ইংরেজি থেকে অনুবাদের বিপত্তিবশত, আর লক্ষণীয় হচ্ছে 'তাদের মাধ্যমে ব্যবহৃত'। ভাষা কারো মাধ্যমে ব্যবহৃত হয়? বলতে কি পারি যে বাঙলা ভাষা বাঙালির মাধ্যমে ব্যবহৃত? শব্দ সম্পর্কে ধারণা না থাকায় এমন হয়েছে। ভুল, বিকৃত, হাস্যকর কথা জনাব মোরশেদ বলেন অবলীলায়। তিনি লিখেছেন, 'যেমন প ও ফ এর মধ্যে মহাপ্রাণগত পার্থক্য ইংরেজী ভাষাভাষীরা অনুধাবন করতে সক্ষম হলেও ভাষায় ব্যবহার করতে সক্ষম হয় না' (পৃ ৩)। কী হাস্যকর উক্তি! ইংরেজি ভাষীরা ওই ধ্বনির 'পার্থক্য অনুধাবন করতে সক্ষম', কিন্তু তাঁরা নাকি 'ভাষায় ব্যবহার করতে সক্ষম হন না।' এটা এক অভিনব আবিষ্কার। তিনি হয়তো বলতে চান যে ইংরেজি ভাষায় মহাপ্রাণতার বিশেষ গুরুত্ব নেই। তিনি লিখেছেন, 'ভাষা সহজাত নয়, বরং তা প্রশিক্ষণের সাহায্যে ব্যবহারযোগ্য। প্রত্যেক শিশুকেই তার মাতৃভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন' (পৃ ৩)। রূপান্তর ব্যাকরণে পিএইচডি করার পর কেউ বলতে পারে এমন কথা যে ভাষা সহজাত নয়, শিশুকেও মাতৃভাষা ব্যবহারের জন্যে 'প্রশিক্ষণ' প্রয়োজন? কোটি কোটি বাঙালি 'প্রশিক্ষণ' পেয়ে বাঙলা ভাষা বলছে, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা প্রশিক্ষণ পায়? শিশুদের মাতৃভাষা ব্যবহারের জন্যে প্রশিক্ষণের দরকার পড়ে না, তবে ভুয়ো ভাষাবিজ্ঞানীদের 'প্রশিক্ষণে'র ব্যবস্থা করা খুবই দরকার। স্ববিরোধী কথা বলেন তিনি স্তবকে স্তবকে, যেমন একটু পরেই লিখেছেন, 'প্রদত্ত একই পরিবেশে যে-কোন দেশের যে কোন জাতির শিশু স্বকীয় সম্প্রদায় থেকে সহজেই ভাষা শিক্ষা করে থাকে' (পৃ ৩)। বাক্যটিতে অনুবাদের গন্ধ লেগে আছে ('প্রদত্ত একই পরিবেশে'), তবে একটু আগে বলেছেন শিশুর 'প্রশিক্ষণ' দরকার, দু-পংক্তি পরেই বললেন, 'সহজেই ভাষা শিক্ষা করে থাকে'। তিনি লিখেছেন, 'ভাষা হচ্ছে একটি শৃঙ্খলিত পদ্ধতির সাহায্যে ভাষার বিভিন্নধারিক বৈশিষ্ট্যের আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ' (পৃ ৪)। প্রলাপ আর কাকে বলে! 'ভাষা'কে একবার তিনি বলেন 'ভাষাতাত্ত্বিক উপাদান', আবার এখন ভাষাকে বলছেন 'ভাষার–বিশ্লেষণ'। 'ভাষা হচ্ছে ভাষার–বিশ্লেষণ' এমন প্রলাপোক্তিও শুনতে হলো। তারপর রয়েছে 'শৃঙ্খলিত পদ্ধতি', কিন্তু জিনিশটি কী? 'পদ্ধতি' কি 'শৃঙ্খলিত' হয়? তিনি হয়তো বলতে চান 'সুশৃঙ্খল পদ্ধতি'—ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন, কিন্তু কী করছেন তা ভাবেন নি এ-ভাষাতাত্ত্বিক! কিছু পরেই আছে 'শৃঙ্খলিত আদর্শের' কথা (পৃ ৬)। যাঁর চিন্তাই বিশৃঙ্খল, তাঁকে কে শৃঙ্খলার কথা শোনাবে!

তিনি লিখেছেন, 'বাগর্থতত্ত্বের প্রয়োগিত 'উৎপাদক' অভিধা এদিক থেকে 'উৎপাদক ব্যাকরণের' লঘুকৃত স্তরে অন্তর্ভুক্ত' (পৃ ১৩)। উক্তিটি নিরর্থক, বোঝেন নি তিনি কী লিখছেন; আর রয়েছে 'প্রয়োগিত', 'লঘুকৃত স্তর' প্রভৃতি। 'প্রয়োগিত' কী জিনিশ? শব্দ সৃষ্টি করতে হ'লে নিয়ম জানতে হয়, বা হ'তে হয় সৃষ্টিশীল। ওই ব্যাকরণ 'উৎপাদক ব্যাকরণ' নয়, 'লঘুকৃত স্তর' ব'লেও কিছু নেই। তিনি লিখেছেন, 'ভাষাতত্ত্ব বিচারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়ে থাকে' (পৃ ১৬)। ভাষাতত্ত্বে বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ হয়, কিন্তু 'ভাষাতত্ত্ব বিচারের ক্ষেত্রে' হয় না। ভাষাতত্ত্বে বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগের এক অর্থ, আর 'ভাষাতত্ত্ব বিচারের ক্ষেত্রে' বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগের আরেক

অর্থ, যদি কোনো অর্থ হয়। তাঁর চিন্তা কতোটা বিকলনগ্রস্ত, তার একটি উদাহরণ দিই। তিনি লিখেছেন, 'ভাষা ও উপভাষার মধ্যে যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় অনেক সময় অন্য কারণেও ভাষাগত পরিবর্তন সাধিত হতে পারে' (পৃ ১৪৩)। বাক্যটির 'ভাষা ও উপভাষার মধ্যে যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়'-এর সাথে পরের অংশের কোনো সম্পর্ক নেই; কী বলতে গিয়ে মাঝপথে তিনি পথ হারিয়ে কোথায় চ'লে গেছেন, তা বুঝতে পারেন নি। বইটিতে বিষয় আলোচনায় ভুলের কোনো শেষ নেই; তত্ত্বপ্রণালিপদ্ধতি ও অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রেই ভুল আর ভুল। মনে হয় ভাষাবিজ্ঞানের কিছুই ভালোভাবে তাঁর পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়ে ওঠে নি। ওই সব তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত ভুলের আলোচনার সুযোগ এখানে নেই স্থানাভাববশত। দু-একটি উদাহরণ তবু দিচ্ছি। তিনি বলেছেন, ''মেয়ে' ও 'বই' রূপমূলের শেষ ধ্বনি স্বরধ্বনি এবং 'হরিণ' রূপমূলের শেষ ধ্বনি ব্যঞ্জনধ্বনি হলেও উভয় ক্ষেত্রেই গুলো সংযুক্ত হয়েছে, অর্থাৎ গুলো মুক্ত রূপমূলে সংযুক্তির ক্ষেত্রে কোন বিশেষ ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবেশ ক্রিয়াশীল নেই। —গুলো, গুলির মত -রা সহরূপের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য' (পৃ ৪৫০)। এর অর্থ হচ্ছে —রা স্বরান্ত বা ব্যঞ্জনান্ত যে-কোনো রূপমূলের সাথে বসতে পারে। কিন্তু আসলে 'রা' বহুবচনচিহ্নটি বসে স্বরান্ত রূপমূলের সাথে, আর 'এরা' বসে ব্যঞ্জনান্ত রূপমূলের সাথে। তাই পাই 'ছেলেরা', 'মেয়েরা'; আর 'ভদ্রলোকেরা', 'অধ্যাপকেরা'। তিনি 'গায়িকা' শব্দের গঠন দেখিয়েছেন 'গায়+ক+ইকা = গায়িকা' (পৃ ৪৫৬)। এ অদ্ভুত রূপতত্ত্বে শব্দটি হয়ে পড়ে '*গায়কিকা', যা জনাব মোরশেদের পক্ষেই গঠন করা সম্ভব। তাঁর 'বাক্যতত্ত্ব' পরিচ্ছেদটি বদহজমের ভয়ানক দৃষ্টান্ত, না বুঝে আবোলতাবোল অনেক কিছু লিখে, অনুবাদ ক'রে গেছেন তিনি। বিদ্যালয়ের ছাত্ররাও যে-ভুল করবে না, তা করেছেন এ-ভাষাতাত্ত্বিক। ৪৯৭ পাতায় তিনি কোন ধরনের বাক্য কী ভূমিকা পালন করে, তা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'বিবৃতিমূলক বাক্য বিবৃতি দান করে', 'আদেশমূলক বাক্য অনুরোধ প্রকাশ বা আদেশ দেয়', —বেশ ভালো কথা, তবে এর পরই তিনি জানিয়েছেন, 'আশ্চর্যবোধক বাক্য দৃঢ় চেতনা প্রকাশ করে' (পৃ ৪৯৭)!!!!! এর চেয়ে 'আশ্চর্যবোধক' কথা আর কী আছে যে 'আশ্চর্যবোধক বাক্য দৃঢ় চেতনা প্রকাশ করে'! এরপর আমাদের, এ-ভাষাতাত্ত্বিকের কথানুসারে, 'হায়! হায়!' কে দৃঢ় চেতনার প্রকাশ ব'লে মনে করতে হবে। 'মহিলা' শব্দটির অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করেছেন যে 'মহিলা' রূপমূলটি 'বস্তুবাচক মানবিক মহিলা' নির্দেশ করে' (পৃ ৫০৪)। যাক আমরা 'বস্তুবাচক মানবিক মহিলা' বলে একটি বস্তু পেলাম।

না বুঝে ইংরেজি বই পড়লে ও ইংরেজি ব্যাকরণের নকল করলে যা হ'তে পারে, তার সংখ্যাহীন উদাহরণ মেলে জনাব মোরশেদের *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব*-এ। তিনি লিখেছেন, 'বাংলায় সে/তিনি সর্বনাম (+পুরুষ) বা (-পুরুষ) হবে, তা ব্যাকরণগত বা আর্থীয় কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, বরং যে বিশেষ্য নির্দেশ করে তার ওপর নির্ভরশীল। যেমন, মনজুলা আসছে' ব্যবহারে সে'র বৈশিষ্ট্য হবে (-পুরুষ)' (পৃ ৫০৪)। 'ব্যাকরণগত বা আর্থীয় কাঠামো' আর 'যে বিশেষ্য নির্দেশ করে তার ওপর নির্ভরশীল' বলতে তিনি কী বুঝিয়েছেন, তিনিই জানেন, তবে তিনি গোলমালে পড়েছেন ইংরেজি

ব্যাকরণের নকল করতে গিয়ে। ইংরেজিতে 'He'(+পুরুষ), আর 'She' (–পুরুষ); কিন্তু বাঙলায় সে/তিনির ক্ষেত্রে এমন লিঙ্গভেদ নেই, যদিও বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতেই হয় তবে নির্দেশ করতে হবে যে 'সে/তিনি' (+/– পুরুষ), অর্থাৎ এগুলো পুরুষ ও স্ত্রী দু–লিঙ্গই নির্দেশ করে। ইংরেজি বাক্যের নকলে বাঙলা বাক্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি একটি বাক্য তৈরি করেছেন;—'ছবিটা রওশন দ্বারা অঙ্কিত হয়েছিল' (পৃ ৫৪৩)। এটা বাঙলা বাক্য? তিনি ধ'রে নিয়েছেন ইংরেজিতে যেহেতু কর্মবাচ্য হয় বাঙলায়ও হ'তেই হবে, তাই জোর ক'রে বানিয়েছেন বাক্যটি। এমন নকল করা বিশ্লেষণে ও উদাহরণে বাঙলা ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বের বই পূর্ণ। তিনি 'active'-এর অর্থ করেছেন 'সক্রিয়' (পৃ ৫৪৩), এটা ঠিকই; তবে এখানে এর অর্থ যে 'কর্তৃবাচ্য', তা তিনি বোঝেন নি। তিনি লিখেছেন, 'এই শ্রেণীর বাক্যকেই কেন্দ্রস্থানীয় বাক্য বলা যায় যদি তা কোন ঐচ্ছিক সূত্রের সহায়তা ছাড়া ব্যুৎপত্ত হয়' (পৃ ৫৪৪)। তাঁর সিদ্ধান্তের কথা ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু কথা হচ্ছে 'ব্যুৎপত্ত' কী জিনিশ? কোনো শব্দ আছে 'ব্যুৎপত্ত' ব'লে? না বুঝে কাজ করলে যা হয় তার নমুনা পাওয়া যায় ৫৪৫ পাতায়। তিনি লিখেছেন, 'রূপান্তরমূলক ব্যাকরণের পরিপ্রেক্ষিতে চমস্কি ব্যাকরণের সংজ্ঞা দিয়েছেন নিম্নরূপ : 'a finite state grammar is the simplest type of grammar, with a finite amount of apparatus, can generate an infinite number of sentences (1957-24)' (পৃ ৫৪৫)। এ–সংজ্ঞা প'ড়ে পাঠকদের মনে হবে ব্যাকরণ সম্বন্ধে চমস্কির এই ধারণা। কিন্তু চমস্কি ব্যাকরণ বলতে এ–বস্তু বোঝেন না, বোঝেন অন্য কিছু। চমস্কি রূপান্তর ব্যাকরণ প্রস্তাবের আগে কিছু সীমাবদ্ধ শক্তিসম্পন্ন ব্যাকরণ আলোচনা করেছেন, ও বাতিল করেছেন। তার একটি হচ্ছে 'finite state grammar' বা 'সসীম অবস্থার ব্যাকরণ'। যে–ব্যাকরণকে চমস্কি বাতিল ক'রে দিয়েছেন, তাকেই এ–ভাষাতাত্ত্বিক চালিয়ে দিয়েছেন চমস্কির নামে, কারণ চমস্কি নানা রকম ব্যাকরণের কথা বলেছেন, সেগুলোর শক্তি যাচাই করেছেন, কিন্তু এ–লেখক বুঝতে পারেন নি চমস্কি কোনটি রেখেছেন, আর বাতিল করেছেন কোনটি। তাঁর ভুলের আর আলোচনার প্রয়োজন নেই, কয়েক হাজার পাতা লাগবে তাতে। এখন দেখতে চাই জনাব মোরশেদের নকল, ভুল ও বিকৃত অনুবাদের নমুনা।

প্রথমে Winfred P Lehmann-এর *Historical Linguistics : An Introduction* (১৯৬৬) বই থেকে নকল ও বিকৃতি অনুবাদের পরিচয় নেয়া যাক। পাতার পর পাতা উদাহরণ দেয়া যায়, তবে পরিমিতির প্রয়োজনে প্রত্যেক বই থেকেই আমি কয়েকটি ক'রে উদাহরণ দেবো। লেহমান লিখেছেন, 'Formerly... Similarly *deer* = Germ. *Tier* 'animal' is now restricted in use for one of the commonest wild animals' (পৃ ২০১)। এটা জনাব মোরশেদের বিকৃত অনুবাদে হয়েছে : 'পূর্বে জার্মান tier রূপমূলের অর্থ ছিল 'জন্তু', বর্তমানে এই রূপমূলের অর্থ 'সাধারণ হিংস্র জন্তু' (পৃ ২৯)। ইংরেজি না বোঝায় লেহমানের 'commonest wild animal' তাঁর হাতে হয়েছে 'সাধারণ হিংস্র জন্তু'। লেহমান ব্যাপারটি পরোক্ষভাবে ব'লেই নকলকারীকে বিপদে ফেলেছেন। লেহমান বলেন যে আগে *Tier* বোঝাতো যে–কোনো জন্তু, আর এখন *Deer*

বোঝায় একটি অতি পরিচিত বন্যপ্রাণী অর্থাৎ 'হরিণ'। জনাব মোরশেদ লেহমানের সমীকরণটুকু বাদ দিয়ে 'Wild' শব্দের সব তাৎপর্য না বুঝে নকল করতে গিয়ে বিপদে পড়েছেন। লেহম্যান লিখেছেন, 'Such expansion may also be noted for entities with specific meaning which are not words or even morpheme. In English the *Fl*-cluster has been extended widely as in *flame, flare, flap, flex, flicker, flounce, flutter*, all of which have the meaning of motion, generally rapid' (পৃ-২০৩)। এর অর্থ ঠিকমতো না বুঝে নকল করতে গিয়ে প্রায় নিরর্থক বাক্য দিয়ে তাঁর অনুবাদ শুরু করেছেন : 'অনেক ক্ষেত্রে অর্থের সম্প্রসারণে অস্তিত্বের মধ্যে নির্দিষ্ট অর্থও লক্ষ্য করা যায়। এমন কি, এই শ্রেণীর অর্থ প্রকাশের সময় মুক্ত রূপমূলের ব্যবহার ছাড়াও অর্থ প্রকাশিত হতে পারে। যেমন, ইংরেজিতে *fl*-সংযুক্ত রূপমূলের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় নিম্নলিখিত রূপমূলের মধ্যে : flame, flare, flap, flex, flicker, flounce, flutter. প্রত্যেকটি রূপমূলের অর্থই সাধারণত দ্রুত গতিবেগ সংক্রান্ত' (পৃ ৩০)। 'অস্তিত্বের মধ্যে নির্দিষ্ট অর্থ' কথাটি লক্ষণীয়; এটা কোনো অর্থ প্রকাশ করে না। কারণ জনাব মোরশেদ 'entities with a specific meaning'-এর অর্থ বোঝেন নি। তিনি অভিধানে 'entity'র একটি অর্থ পেয়েছেন 'অস্তিত্ব', আর 'Specific'-এর অর্থ পেয়েছেন 'নির্দিষ্ট', এবং সপ্তম শ্রেণীর বালকের মতো অনুবাদ ক'রে গেছেন। এখানে 'entities with a specific meaning'-এর অর্থ হবে 'বিশেষ অর্থসম্পন্ন ভাষিক উপাদান', কিন্তু না বুঝে অনুবাদ করেছেন 'অস্তিত্বের মধ্যে নির্দিষ্ট অর্থ'। তিনি কখনো 'অস্তিত্বের মধ্যে নির্দিষ্ট অর্থ' দেখেছেন, বা বোধ করেছেন? এবার একটি চূড়ান্ত হাস্যকর অনুবাদের উদাহরণ দেখা যাক। লেহমান লিখেছেন, 'Often the shift is from a serene to an emotionally active context, which corresponds to the hyperbole of Literary analysis. *Astonish* somewhat like *stun*, once meant 'strike by thunder.' In Shakespeare's *King Henry the Fifth*, Act 5, Scene 1, Gower points out to Fluellen that the he astonished Pistol when he struck him a second time'(পৃ ২০৪)। জনাব মোরশেদ এর অনুবাদ করেছেন, 'সাহিত্যে রূপমূল ব্যবহারে অতিশোয়োক্তি অংশে অর্থ পরিবর্তন পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কিত। 'astonished' রূপমূলের অর্থ এক সময় ছিল 'বজ্র দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত'। সেক্সপীয়ারের 'কিং হেনরি দ্য ফিফথ' নাটকের পঞ্চম অংকের প্রথম দৃশ্যে এই শ্রেণীর ব্যবহার লক্ষণীয়, যেখানে গাওয়ার ফ্লুয়েলেনকে বলেছেন যে, যখন তিনি দ্বিতীয়বারের জন্যে আঘাতের সময় 'astonished Pistol' ব্যবহার করেছিলেন' (পৃ ৩১)। হায় প্রফেসর, হায় ভাষাতত্ত্বের পিএইচডি! প্রথমে তিনি 'পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কিত' ব'লে গোঁজামিল দিয়ে কোনো রকমে চালিয়েছেন, কিন্তু পরে 'astonished Pistol'-এ এসে আর বুঝে উঠতে পারেন নি কী করবেন। 'Pistol' যে একজনের (সৈনিকের) নাম, তা না বুঝে 'Pistol'কে পিস্তল মনে ক'রে অনুবাদক সরাসরি 'astonished Pistol' ব্যবহার ক'রে ছেড়েছেন। এ-মূর্খ পিস্তলের গুলিতে যে ভাষাতত্ত্ব খুন হয়েছে, তার খেয়াল তিনি করেন নি। সহজ বাক্য ও সহজ শব্দ অনুবাদেও তিনি ভুল করেছেন। লেহমান লিখেছেন, 'Italic was brought into the Italian peninsula in succissive waves

during the second millennium B.C., lile Greek into the Hellenic peninsula' (পৃ ৩০)। এর অনুবাদেও পাঁচখানা ভুল করেছেন জনাব মোরশেদ : 'যেভাবে বহিরাগতদের দ্বারা গ্রীসে গ্রীক আনীত হয়েছিল, ঠিক একইভাবে ইটালী উপমহাদেশে খ্রীষ্টপূর্ব দু' হাজার বছর আগে ইটালীয় আনীত হয়' (পৃ ৭৯)। 'second millennium B.C.' হয়েছে 'খ্রীষ্টপূর্ব দু' হাজার বছর আগে', কিন্তু কথাটি হচ্ছে 'খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকে' (এ-দুয়ে হাজার বছরের পার্থক্য ঘটতে পারে), আর 'Peninsula' হয়েছে 'উপমহাদেশ'। 'ইতালীয় উপমহাদেশ' একটি নতুন ভৌগোলিক আবিষ্কার। বিদ্যালয়ের ছাত্ররাও জানে 'Peninsula'র অর্থ 'উপদ্বীপ'। লেহমান লিখেছেন, 'Today Welsh may be the Celtic language with the greatest number of speakers. Breton, ...is still maintained in Brittany' (পৃ ৩২-৩৩)। জনাব মোরশেদ একে বিকৃত করেছেন এভাবে : 'বর্তমানে ওয়েলস ভাষাভাষীদের মধ্যে সেলটিক ভাষা ব্যবহারকারীদের প্রাধান্য লক্ষণীয়। ব্রেটন বর্তমানে ইংল্যান্ডের ব্রিটানি রূপের মধ্যে সংরক্ষিত' (পৃ ৮০)। লেহম্যানের বক্তব্য হচ্ছে কেলটিক ভাষাগুলোর মধ্যে ওয়েল্‌শ্‌ভাষীর সংখ্যাই সম্ভবত সর্বাধিক; আর জনাব মোরশেদের অনুবাদ থেকে বোঝা যায় ওয়েল্‌শ্‌ভাষীদের বড়ো অংশটি কেলটিক ভাষা বলে! হায়, না বুঝে নকলের পরিণতি! তিনি এও জানেন না যে ওয়েল্‌শ্‌ একটি কেলটিক ভাষা। আমরা কি বলতে পারি যে বাঙলাভাষীদের মধ্যে আর্যভাষা ব্যবহারকারীদের প্রাধান্য লক্ষণীয়?! তবে আরো মজার পরের বাক্যটি। লেহম্যান শুধু বলেছেন যে ব্রেটন (বা ব্র্যতঁ) এখনো ব্রিটানিতে প্রচলিত (তিনি আরো কিছু কথা বলেছেন, তবে তার অনুবাদ দুরূহ ব'লে জনাব মোরশেদ বাদ দিয়েছেন)। ক্ষতিপূরণ করতে গিয়ে ও ছাত্রদের কল্যাণের ইচ্ছেয় জনাব মোরশেদ একটু বেশি ও না-জানা তথ্য দিতে গিয়ে মূর্খতা প্রকাশ করে ফেলেছেন। তিনি জানিয়েছেন, 'ব্রেটন তখন ইংল্যান্ডের ব্রিটানি রূপের মধ্যে সংরক্ষিত।' কোথায় ইংল্যান্ড, আর কোথায় ব্রিটানি, আর কাকে বলে ব্রেটন বা ব্র্যতঁ। 'ব্রিটানি রূপ' ব'লে কিছু নেই, ওটি একটি ভূখণ্ড, আর তা ইংল্যান্ডে নয়, ফ্রান্সে অবস্থিত। লেহম্যানের বর্ণনায় ইংল্যান্ড শব্দটি আছে আর ব্রেটন, ব্রিটানি ব্রিটেনের মতো শোনায় ব'লে তিনি ভেবেছেন নিশ্চয়ই ভাষাটি টিকে আছে ইংল্যান্ডে। তাঁর ভূগোলও ভাষা ও ভাষাতত্ত্বের মতোই ভয়াবহ! লেহম্যান ছেড়ে এবার গেল্‌ব-এ যাওয়া যাক।

জনাব মোরশেদ 'লিখনরীতি' পরিচ্ছেদটি পুরোপুরি লিখেছেন I.J. Gelb-এর *A Study of Writing* (১৯৫২) বইট বিকৃত নকল ক'রে; কিন্তু স্বীকার করেন নি। এতো বড়ো একটি বই তিনি প'ড়ে উঠতে পারেন নি, তাই যেখান সেখান থেকে নকল করেছেন এলোমেলোভাবে, এবং ভুলে ভ'রে তুলেছেন তাঁর স্থূল বইটি। এ-অংশে তাঁর অনুবাদ শুধু ভুল নয়, কৌতুকজাগানোও; এমনকি অনুবাদতত্ত্বের জন্যেও এ-অংশটি ব্যবহার করা যায়। এ-অংশ থেকে ধারণা করা সম্ভব অনুবাদে কতো ধরনের ভুল হ'তে পারে। গেল্‌ব লিখেছেন, 'A more complicated mnemonic system is represented among the Peruvian Incas by the so-called *'quipu writing'*, in which accounts concerning objects and beings were recorded by means of

strings and knots of various length and colour'(পৃ ৪)। গেল্‌বের জটিল বাক্য ও বক্তব্য নিয়ে মুশকিলে পড়েছেন জনাব মোরশেদ, এবং কোনোমতে অনুবাদ করেছেন : 'পেরুভীয় ইনকাসরা 'কুইপি' লিখনের সাহায্যে বস্তু গুণতেন। এই প্রক্রিয়ায় দড়ি দিয়ে বিভিন্ন আকৃতির ও বর্ণের সাহায্যে গিঁট দেওয়া হত' (পৃ ১৮৯)। প্রথমেই লক্ষ্য করুন 'ইনকাসরা' শব্দটি। 'Incas' যে বহুবচনবাচক, তিনি তাও জানেন না; তাই বাঙলায় উপহার দিয়েছেন 'ইনকাসরা'র মতো দ্বৈতবহুবচনাত্মক অভিনব শব্দ, যাতে সমৃদ্ধ হলো বাঙলা ভাষা! ভাষাতাত্ত্বিকের কাছে জাতি এই তো চায়! যিনি 'Incas' একবচন না বহুবচন জানেন না, তাঁর কাছে গেল্‌বের বাক্যের শুদ্ধ অনুবাদ আশা করতে পারি না। তিনি আমাদের জানিয়েছেন 'এই প্রক্রিয়ায়' 'দড়ি দিয়ে' 'বিভিন্ন আকৃতির ও বর্ণের সাহায্যে' 'গিঁট দেওয়া হত'। প্রক্রিয়াটি খুবই অসাধারণ, সন্দেহ নেই, কারণ এ-প্রক্রিয়ায় 'দড়িতে গিঁট' দেয়া হতো না, 'দড়ি দিয়ে' গিঁট দেয়া হতো, আর ওই গিঁট 'বিভিন্ন আকৃতির ও বর্ণের' হতো না, তাতে 'আকৃতির ও বর্ণের সাহায্যে' গিঁট দেয়া হতো! আকৃতির সাহায্যে বা বর্ণের সাহায্যে গিঁট এখন কেউ দিতে পারে না, পেরুভীয়রাও পারতো না, তবে জনাব মোরশেদের বিস্ময়কর ভুল ও বিকৃত ভাষা এ-অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। গেল্‌ব কী বলেছেন, আর তিনি কী বুঝেছেন! তিনি বিশেষ বিপদে পড়েছেন, কেননা গেল্‌বের ভাষা একটু কঠিন। গেল্‌ব লিখেছেন, 'Writing in which signs, whether they retain their pictorial form or not, become ultimate secondary symbols for notions of linguistic value'(পৃ ৭)। তিনি এর বিকৃত নকল করেছেন এভাবে : 'লিখনরীতি, যার সাহায্যে চিহ্নের মাধ্যমে (তার মধ্যে চিত্রগত রূপ উপস্থিত বা অনুপস্থিত থাকতে পারত) মাধ্যমিক প্রতীকগত ধারণার মাধ্যমে ভাষাতাত্ত্বিক মূল্যায়ন লক্ষণীয়' (পৃ ১৯০)। তিনি ব্যাপারটিই বোঝেন নি; তিনি যেখানে 'secondary' শব্দের অর্থ জানেন না, সেখানে এ-বাক্যের অনুবাদ আশা করা যায় না তাঁর কাছে। 'secondary' তাঁর কাছে হয়েছে 'মাধ্যমিক', সম্ভবত 'মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা'র ধারণা থেকে শব্দটি তাঁর মাথায় ঢুকেছে; তবে এখানে এর অর্থ 'গৌণ'। 'Linguistic value' বলতে বুঝেছেন তিনি 'ভাষাতাত্ত্বিক মূল্যায়ন', যদিও এখানে মূল্যায়নের কোনো ব্যাপারই নেই। সারাটি বই জুড়ে তিনি 'secondary' শব্দের অর্থ করেছেন 'মাধ্যমিক'। যেমন একটু পরেই গেল্‌বের 'There is no limit to secondary transfers' (পৃ ৮) বাক্যের অর্থ করেছেন, 'মাধ্যমিক স্থানান্তরের কোন সীমানা নেই।' আসলে ভুল বোঝা ও বিকৃত অনুবাদের কোনো সীমানা নেই। গেল্‌ব লিখেছেন, 'The Year 1802-1803, symbolized by a horseshoe'(পৃ ৪২); তিনি একে পুরোপুরি পাল্টে দিয়েছেন নকলে : '১৮০২-১৮০৩ সাল ঘোড়ার খুরের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত' (পৃ ১৯২)। গেল্‌ব বলেছেন ঘোড়ার খুরের নাল ১৮০২-১৮০৩ সালের প্রতীক; তিনি বলেছেন ১৮০২-১৮০৩ সাল ঘোড়ার খুরের প্রতীক!! তিনি 'ঘোড়ার খুর' আর 'ঘোড়ার খুরের নাল'-এর পার্থক্য বোঝেন না, বোঝেন না কে কার প্রতীক। এর কিছু পরেই পাওয়া যায় একটি অনবদ্য অনুবাদ, ভাবলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। গেল্‌ব লিখেছেন, 'Observe the bow in

different positions in the picture for the year 1915-16' (পৃ ৪২)। তিনি এর অনুবাদ করেছেন,•'১৮১৫-১৬ সালের জন্যে আনত অবস্থার চিত্রটি গৃহীত' (পৃ ১৯৩)। শিশুরা যেমন এক শব্দের বিভিন্ন অর্থ নিয়ে মুশকিলে পড়ে এ-ছদ্মভাষাতাত্ত্বিক পড়েছেন তারও বেশি বিপদে। 'bow' বলতে গেল্‌ব বলেছেন 'ধনুকের' কথা, আর তিনি বুঝেছেন 'আনত আবস্থা'র কথা; গেল্‌ব পরের পাতায় ধনুকের ছবিও দিয়েছেন, কিন্তু তা কোনো উপকারে আসে নি। গেল্‌ব লিখেছেন, 'The Egyptian syllabary consists of about twenty -four signs, each with an initial consonant plus any vowel' (পৃ ৭৫)। না বুঝে তিনি এর অনুবাদ করেছেন, 'মিশরীয় অক্ষরমালাতে চব্বিশটি চিহ্ন অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেকটা অক্ষরের প্রথমে রয়েছে ব্যঞ্জনধ্বনি অথবা স্বরধ্বনি' (পৃ ২০০)। গেল্‌ব বলেছেন যে মিশরীয় অক্ষরের প্রতিটি একটি আদিব্যঞ্জনের সাথে যে-কোনো স্বরধ্বনি সমবায়ে গঠিত; আর তিনি বলেছেন, 'প্রত্যেকটা অক্ষরের প্রথমে রয়েছে ব্যঞ্জনধ্বনি অথবা স্বরধ্বনি।' এমনই বিকৃত তাঁর অনুবাদ, ও তাঁর *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব*। 'secondary' শব্দটির 'মাধ্যমিক' অনুবাদ আবার পাচ্ছি। গেল্‌ব লিখেছেন, 'Thus while a picture of the sun expresses first directly the word 'sun', it can also have the secondary meaning of 'bright' or 'day'(পৃ ৯৯)। তিনি এর অনুবাদ করেছেন, 'উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, সূর্যের ছবি প্রথমে প্রত্যক্ষভাবে 'সূর্য' শব্দ নির্দেশ করে, এবং এর মাধ্যমিক অর্থ হচ্ছে 'উজ্জ্বল' অথবা 'দিন'' (পৃ ২০৫)। 'মাধ্যমিক অর্থ' ব'লে যে কিছু হয় না, তাও তিনি বোঝেন না। গেল্‌বের ১৯১ পাতার একটি বাক্যের অর্থ না বুঝে তা তিনি তাঁর কিম্ভূত ভাষায় প্রকাশ করেছেন এভাবে : 'এই যুগের বৈশিষ্ট্য হল যে চিত্রের সাহায্যে অর্থ লিখিত হত' (পৃ ২২১)। ভেবে দেখুন, ভাষাতাত্ত্বিক বলছেন, 'অর্থ লিখিত হত', এ কি লেখার জিনিশ! প্রকাশ বা জ্ঞাপন করা, ও অর্থের মধ্যে পার্থক্যও তিনি বোঝেন না। গেল্‌ব লিখেছেন, 'The most primitive ways of communication by means of visible symbols-were achieved by means of the descriptive-representational and the identifying-mnemonic devices. Under the descriptive-representational device are included means of communication similar to drawings' (পৃ-১৯১)। 'In the identifying-mnemonic device, a symbol is used to help to record or to identify a person or an object'(পৃ ১৯২)। তিনি এর এমন বাঙলা করেছেন, যা প'ড়ে তিনি নিজেও কিছু বুঝবেন না। ভুলে, হাস্যকর ভুলে, পরিপূর্ণ তাঁর নকল : 'প্রাচীনকালে যোগাযোগের জন্যে দৃশ্যমান লাভ করা হত বর্ণনাত্মক প্রতিনিধিকর ও অভিন্নতাকারক স্মৃতি-সংক্রান্ত মাধ্যমের সাহায্যে। বর্ণনাত্মক প্রতিনিধিমূলক মাধ্যমের ক্ষেত্রে ড্রইং-এর সাহায্য লক্ষণীয়। অভিন্নতাকারক স্মৃতি-সংক্রান্ত মাধ্যমে একটি প্রতীক ব্যবহারের সাহায্যে বস্তু বা মানুষ চিহ্নিত হত' (পৃ ২২১)। গেল্‌বের ইংরেজি প'ড়ে পাঠক বুঝতে পারবেন, কিন্তু জনাব মোরশেদের বাঙলা বুঝবেন না, কেননা মোরশেদ না বুঝে আবোলতাবোল লিখে গেছেন। গেল্‌বের 'Visible symbol' হয়েছে 'দৃশ্যমান লাভ', গেল্‌বের 'representational' হয়েছে 'প্রতিনিধিকর', আবার 'প্রতিনিধিমূলক'। 'representational'-এর এক অর্থ যে 'প্রতীক বা চিত্রধর্মী', তা তিনি জানেন না, তিনি রাজনীতিক কারণে প্রচলিত 'প্রতিনিধিত্ব'-এর

AMARBOI.COM

সঙ্গে পরিচিত; তাই তৈরি করেছেন নিরর্থক 'প্রতিনিধিকর', 'প্রতিনিধিমূলক'। জনাব মোরশেদের জন্যে ভালো, বিশেষভাবে প্রণীত, ইংরেজি-বাঙলা অভিধান প্রকাশ করা উচিত বাংলা একাডেমীর। 'identifying' হয়েছে অভিন্নতাকারক', হয়তো শব্দটি অভিধানে আছে। কিন্তু এখানে 'অভিন্নতাকারক' বোঝানো হচ্ছে না, এখানে 'শনাক্তকরণ'-এর কথা বলা হচ্ছে। গেল্‌ব থেকে আর নয়। জনাব মোরশেদের 'লিখনরীতি' পরিচ্ছেদটি গেল্‌বের বইয়ের বিশৃঙ্খল বিকৃত নকল। এ-পরিচ্ছদ ও পুরো বইটি পড়ার সময় বার বার মনে হয় লেখনরীতি আবিষ্কৃত না হ'লেই ভালো হতো; তাহলে এমন বই লেখার সাধনা করতে হতো না মোরশেদ সাহেবকে। এ-আবর্জনা আর কি ঘাঁটার দরকার আছে? তবু আরো কয়েকটি বই থেকে নকলের কিছু উদাহরণ দিই।

মোরশেদ সাহেব তাঁর 'ভাষাতত্ত্ব চর্চার ইতিহাস' পরিচ্ছেদটি লিখেছেন প্রধানত Francis P. Dinneen, S.J.-এর *An Introduction to General Linguistics* (১৯৬৭) থেকে বিকৃতভাবে নকল ক'রে। এ-পরিচ্ছেদের শুরুতে 'প্রথাগত ব্যাকরণ' অভিধাটি উর্ধ্বকমার মধ্যে লিখেছেন, তাঁর বলা উচিত ছিলো এ-পরিভাষাটি কার। *বাক্যতত্ত্ব* বইটি থেকে নিয়েছেন ব'লে তিনি তা উল্লেখ করেন নি। ডিনিন লিখেছেন, 'The Sophists laid the groundwork for the technical vocabulary of rhetoric...one reason for their success was certainly their emperical method'(পৃ ৭৩)। জনাব মোরশেদ এর অনুবাদ করেছেন, 'সফিষ্টরা প্রয়োগগত শব্দের ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁদের সাফল্যের মূল কারণ হচ্ছে নিরীক্ষামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ' (পৃ ২২৮)। 'technical vocabulary' হয়েছে 'প্রয়োগগত শব্দ', আর 'emperical method' হয়েছে 'নিরীক্ষামূলক পদ্ধতি'। পরীক্ষানিরীক্ষা প্রভৃতি গালভরা শব্দ এখন চলছে চারপাশে, না বুঝেই তার একটিকে লাগিয়ে দিয়েছেন জনাব মোরশেদ; তিনি বোঝেন নি এখানে নিরীক্ষার কথা বলা হচ্ছে না, বলা হচ্ছে 'অভিজ্ঞতাবাদী' বা 'উপাত্তবাদী' পদ্ধতির কথা। লাতিন সমস্ত নাম তিনি উল্টেপাল্টে দিয়েছেন না জেনে। তাঁর হাতে প্রিসকিআন হয়েছে 'প্রিসিয়ান', দিক্কোলুস হয়েছে 'ডাইকোলাস' ইত্যাদি। পাতায় পাতায় তিনি ভুল অনুবাদ করেছেন। তিনি সোস্যুরের 'লঁগ' কে করেছেন 'ল্যাং', 'পারোল' কে করেছেন 'প্যাওল', 'লঁগাজ' কে করেছেন 'ল্যাঙ্গেগ' (দ্র ডিনিন, পৃ ১৯৬; মোরশেদ, পৃ ২৪৯)। ব্যাকরণবিদ ও ভাষাতাত্ত্বিকদের প্রায় সমস্ত নাম তিনি বিকৃত করেছেন। ডিনিন থেকে বিকৃত অনুবাদের আর একটি মাত্র উদাহরণ দেবো। ডিনিন লিখেছেন, 'Traditional grammar confuses levels of analysis that can be easily distinguished by using expressions such as "understood as," or " used in place of" to describe the overlap in the class membership of morphologically defined classess. In a sentence like "Walking is healthful," walking is often said to be "considered as" a noun or "taking the place of" a noun' (পৃ ১৬৭)। জনাব মোরশেদ এর উন্মত্ত অন্ধ অনুবাদ করেছেন এভাবে : 'প্রথাসিদ্ধ ব্যাকরণের আলোচনার সময় সমপদস্থ স্তরগুলো সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা হয় না। বরং অনেক ক্ষেত্রে 'এতে বোঝা যায়', 'এর পরিবর্তে ব্যবহৃত' এই-ভাবে পদগুলো ব্যবহারের ফলে শব্দতত্ত্বের বিচারের ক্ষেত্রে পদগুলোকে আংশিক আবৃত করা

হয়ে থাকে। যেমন (হাঁটা স্বাস্থ্যের জন্যে উপকারী) এই বাক্যে (হাঁটা) শব্দকে প্রথাসিদ্ধ ব্যাকরণে বিশেষ্য হিশেবে 'ধরা যেতে পারে' এই অভিধায় প্রযুক্ত হয়' (পৃ ৫৪১)। তাঁর অনুবাদ প'ড়ে মনে হয় দেবতারা যেখানে ভয় পায় সেখানে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন। ডিনিনের কথা কিছুই বোঝেন নি তিনি, কিন্তু ভাষাতত্ত্ব চর্চা ক'রে গেছেন। জনাব মোরশেদ একজন পুরোপুরি হাতুড়ে ভাষাতাত্ত্বিক। 'traditional grammar' হয়েছে 'প্রথাসিদ্ধ ব্যাকরণ'; 'distinguished' হয়েছে 'বিশ্লেষণ', না বুঝে একটি 'সমপদস্থ' এনেছেন, 'overlap' হয়েছে 'আংশিক আবৃত করা', 'morphologically defined' হয়েছে 'শব্দতত্ত্বের বিচারের ক্ষেত্রে', এবং না বুঝে একটি 'অভিধা' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এবার M.Swadesh-এর 'The Phonemic Principle'(১৯৩৪) প্রবন্ধ থেকে কৌতুককর নকলের একটি উদাহরণ দিই। সোয়াডেশ লিখেছেন, 'By a thorough-going comparison of all sets of words having a phontic resmblance, one arrives at a notion of the significant elemental sound types'(দ্র *Phonology*, সম্পাদক Erik C.Fudge (১৯৭৩, পৃ ৪০)। মোরশেদ সাহেব এর অনুবাদ করেছেন, 'সমস্ত শব্দের সদৃশ দলগুলোর সর্বত্রগামীয় তুলনার সাহায্যে ধ্বনিগত সাদৃশ্য থেকে ধ্বনির অর্থপূর্ণ উপাদান ধরা যায়' (পৃ ৩৮৯)। এর অর্থ কেউ বুঝবে না, কেননা মোরশেদ সাহেব মূলটি বোঝেন নি। না বুঝে নিরর্থক শব্দস্তূপ তৈরি করেছেন তিনি। 'thoroughgoing comparison'কে তিনি ক'রে তুলেছেন 'সর্বত্রগামীয় তুলনা'! হায়, ইংরেজি; হায় বাঙলা; হায়, ভাষাতত্ত্ব, হায় প্রফেসর; হায়, পিএইচডি!!! আরলটো, কিং, লায়ন্স ও অন্যান্যের বই থেকে তিনি যে-পরিমাণ বিকৃত নকল করছেন, তার বিবরণ দেয়ার দরকার নেই। ভাষাতত্ত্ব না বুঝে তিনি আধুনিক ভাষাতত্ত্বের বই লিখেছেন, ইংরেজি না বুঝে ইংরেজি থেকে সাড়ে ছ-শো পাতা নকল অনুবাদ করেছেন, ভাষাতত্ত্বের নামে—একটি প্রবাদ মনে পড়ে—বাঙালিকে তিনি হাইকোর্ট দেখিয়েছেন। এ-বিদ্যাটি পাঠকদের বিশেষ জানা নেই ব'লে মনের সুখে প্রতারণা করেছেন।

বইটির নকল, ভুল ও বিকৃত অনুবাদের বিস্তৃত বিবরণ দেয়ার জন্যে কয়েক হাজার পাতা দরকার। বইটি নকল করে লেখা হয়েছে, এটা খুব বড়ো অভিযোগ নয়; এটি যে পাতায় পাতায় অসংখ্য ভুলে পরিপূর্ণ এটাই মারাত্মক। কী পরিমাণ ভুল রয়েছে বইটিতে? আমি কয়েক পাতার ভুল হিশেব ক'রে দেখেছি বইটিতে প্রতি পাতায় কমপক্ষে পঞ্চাশটি ক'রে ভুল রয়েছে;—এ-ভুল বিষয়ের ভুল, শব্দপ্রয়োগের ভুল, বাক্যের ভুল, ও অনুবাদের ভুল। বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬২২। প্রতি পাতায় পঞ্চাশটি ক'রে ভুল ধরলে বইটিতে মোট তিরিশ হাজারেরও (৩০,০০০) বেশি ভুল রয়েছে। কোনো বইয়ে ভুলের এটিই বোধ হয় সর্বোচ্চ রেকর্ড। বইটি *গিনিজ বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস*-এ স্থান পাওয়ার যোগ্য। প্রশ্ন হচ্ছে একাডেমী এটি কী ক'রে ছাপলো? এটির পর্যালোচক ছিলো না? এটি পাঠ্যবই; এমন ভুলে-ভরা পাঠ্যবই যাঁরা ছাত্রদের হাতে তুলে দেন, তাঁরা কী ভূমিকা পালন করেন? বইটি অবিলম্বে প্রত্যাহার করা উচিত।

জনাব মোরশেদ বাঙলা, ভাষাতত্ত্ব, ইংরেজি কোনোটিই ঠিক মতো জানেন না

AMARBOI.COM

ব' লেই মনে হয়; তাই এমন একটি বই তিনি লিখেছেন। তাঁর আরো দুটি বই ছেপেছে একাডেমী;—একটি *বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনাম : গঠন ও প্রকৃতি* (১৯৮৫), অন্যটি *A Study of Standard Bengali and the Noakhali Dialect* (১৯৮৫)। *বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনাম* বইটি তাঁর পিএইচডি অভিসন্দর্ভের বাঙলা অনুবাদ। তাঁর অভিসন্দর্ভ *Relativization in Bengali* (১৯৮৬) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়েছে। তাঁর *বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনাম* ও *Relativization in Bengali* মেলালে দেখা যায় তিনি নিজের লেখা অনুবাদ করতেও ভুল করেছেন। এ-বইটিও ভাষা ও বিশ্লেষণের ভুলে, ও হাস্যকর পরিভাষায় পরিপূর্ণ। এখানে ওই ভুল দেখাতে যাবো না। তবে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ তুলতে চাই। *বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনাম*-এর FOREWORD-এ তাঁর গবেষণা পরিচালক লিখেছেন, 'During this time he read very widely...and displaying a voracious appetite for any book or article that might be relevant to his research.' তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগে *Relativization in Bengali* বিষয়ে পিএইচডি করেছেন ১৯৮৩ সালে। 'Relativization' প্রক্রিয়াটি একটি ব্যাপক প্রক্রিয়ার অংশ; তার নাম 'Pronominalization' বা 'সর্বনামীয়করণ'। একই এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের একই ভাষাবিজ্ঞান বিভাগে *Pronominalization in Bengali* নামে একটি পিএইচডি অভিসন্দর্ভ রচিত হয়েছিলো ১৯৭৬ সালে;—মোরশেদ সাহেবের পিএইচডি করার সাত বছর আগে। ওই অভিসন্দর্ভটির কপি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে আছে, যুক্তরাজ্যের আরো কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারেও আছে। সেটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়েছে ১৯৮৩ সালে। *Pronominalization in Bengali* অভিসন্দর্ভটিতে একটি দীর্ঘ পরিচ্ছেদ রয়েছে, যার নাম 'Relativization' পৃথকভাবে বলতে হয় 'Relativization in Bengali'। এ-অংশটি *Bangla Academy Journal*-এ (Vo. XI, NO. 1, 1984) বেরিয়েছিলো। জনাব মোরশেদের গবেষণা-পরিচালক ডঃ অ্যাশার বলেছেন যে মোরশেদ সাহেব তাঁর গবেষণার প্রাসঙ্গিক সব কিছু 'গোগ্রাসে' গিলেছেন, কিন্তু তাঁর সন্দর্ভের ও *বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনাম*-এর রচনাপঞ্জিতে *Pronominalization in Bengali*র কোনো উল্লেখ নেই। রচনাপঞ্জিতে দেখা যায় তিনি অস্ট্রেলীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অপ্রকাশিত সন্দর্ভ দেখেছেন, হিন্দি-উর্দু, এমনকি মারাঠির সম্বন্ধীকরপ্রক্রিয়া সম্পর্কে লেখা পড়েছেন, কিন্তু তিনি দেখেন নি, যা তাঁর সবচেয়ে দেখা দরকার, সেই বাঙলা সম্বন্ধীকরণ সম্পর্কে লেখা—যা লেখা হয়েছিলো তিনি যে-বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বিভাগে পিএইচডি করেছেন, সে-একই বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বিভাগে, তাঁর সাত বছর আগে। তিনি কেনো দেখলেন না? কোনো বিষয়ে গবেষণার বিশেষ রীতি রয়েছে। কোনো বিষয়ে গবেষণা করতে গেলে প্রথমে ওই বিষয়ে যে-কাজ হয়েছে, তার পরিচয় দিতে হয়। আগের গবেষণা যদি পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য হয় তবে আর নতুন গবেষণার সুযোগ থাকে না। একই বিষয়ে নতুন গবেষণা করতে গেলে দেখাতে হয় আগের গবেষণাসমূহের ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা। আগের গবেষণার ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা না দেখিয়ে যদি কেউ একই বিষয়ে গবেষণা করেন, তাহলে তাঁর গবেষণা গ্রহণযোগ্য হয় না, তাঁকে ডিগ্রি দেয়া হয় না। মোরশেদ সাহেব একই বিভাগে সাত

বছর আগে সমাপ্ত গবেষণার কোনো উল্লেখ করেন নি, তার ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা দেখান নি, তাই তাঁর *Relativization in Bengali* বিষয়ে গবেষণা ডিগ্রির জন্যে গ্রহণযোগ্য কিনা, তা বিবেচনার ভার আমি দেশের পণ্ডিতদের ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পণ্ডিত-গবেষকদের ওপর অর্পণ করছি। একই বিভাগে, ও একই বিষয়ে সম্পন্ন গবেষণা তিনি কেনো দেখলেন না? ডঃ অ্যাশার, তাঁর পরিচালক, সহজ সরল মানুষ, রূপান্তর ব্যাকরণে বিশেষজ্ঞও নন। তাঁর অধীনে জনাব মোরশেদ গবেষণা করেছেন 'বাঙলা সম্বন্ধীকরণ' প্রক্রিয়া সম্পর্কে, রূপান্তরমূলক পদ্ধতিতে। ডঃ অ্যাশারকে তিনি হয়তো সব কিছু জানান নি, ডঃ অ্যাশার দক্ষিণ ভারতীয় ভাষায় উৎসাহী, বাঙলায় নন। তবে তাঁর দায়িত্ব ছিলো। জনাব মোরশেদ যে *Pronominalization in Bengali* অভিসন্দর্ভের 'Relativization'-এর উল্লেখ করেন নি, তার বিশেষ কারণ রয়েছে। তাহলে তাঁর ডিগ্রি হতো না। *Pronominalization in Bengali* অভিসন্দর্ভের 'Relativization' পরিচ্ছেদের সাথে তাঁর *Relativization in Bengali*র অনেক কথা মিলে যায়। অর্থাৎ তিনি *Pronominalization in Bengali*র 'Relativization' পরিচ্ছেদ থেকে অনেক কিছু আত্মসাৎ করেছেন, কিন্তু স্বীকার করেন নি। এটি গবেষণা ও পিএইচডি ডিগ্রির পরিপন্থী অপরাধ, যার পরিণতি মারাত্মক। পাঠকেরা বই দুটি তুলনা ক'রে দেখবেন, পণ্ডিতেরা বিচার ক'রে দেখবেন। আমি এখানে শুধু *Pronominalization in Bengali*র 'Relativization' পরিচ্ছেদ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি : 'Relativization is the process which generates relative clauses. A relative clause in Bengali is an embedded sentence, in the surface, which acts as a modifier of a noun phrase. A relative clause contains a relativized noun phrase which is either a full noun phrase containing the relative deictic *ye*. or a relative pronoun such as *ye*, *yini* and *ya* '(পৃ ২২০)। এর সাথে মিলিয়ে দেখুন জনাব মোরশেদের বই থেকে নিচের উদ্ধৃতিটি : 'Relativization is a process whereby a sentence is embedded as a modifier in a noun phrase...the relative pronoun is normally followed by some other pronouns, so the one clause will have a relative pronoun, such as *Je*, *Jini*, or *Ja*'(পৃ ৫৩)। *ye*, *yini*, *ya* এবং *Je*, *Jini*, *Ja* হচ্ছে 'যে, যিনি, যা'। প্রথম গুচ্ছটি বানান অনুসারে লেখা (এভাবেই লেখা নিয়ম), আর দ্বিতীয় গুচ্ছটি উচ্চারণ অনুসারে লেখা (এড়ানোর জন্যে হয়তো এভাবে লিখেছেন)। দুটি বই ভালোভাবে মিলিয়ে দেখলে পাঠক ও পণ্ডিতেরা বুঝবেন জনাব মোরশেদ কিসের আশ্রয় নিয়েছেন। জনাব মোরশেদের এ-সন্দর্ভ লিখে পিএইচডি ডিগ্রি পেয়েছেন, তা কি সৎ পথে এসেছে? এ-প্রসঙ্গে একাডেমী প্রকাশিত তাঁর *A Study of Standard Bengali and the Noakhali Dialect* বইটির কথা আসে। এটি তিনি পশ্চিমের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি ডিগ্রির জন্যে উপস্থাপন করেছিলেন; ওই বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে পিএইচডির বদলে, সান্তনাসূচক, এমএ ডিগ্রি দিয়েছিলো। কেনো দিয়েছিলো, তা বোঝা যায় তাঁর *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব* প'ড়ে, ও *Relativization in Bengali* সন্দর্ভ রচনায় তিনি যে-পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন, তা অনুধাবন ক'রে। পিএইচডি ডিগ্রি এখন বেশ সুলভ হয়ে গেছে, কোনো কোনো দেশে আলুর মতো পিএইচডি উৎপাদন করা হয়;

যুক্তরাজ্যেও যে তা হচ্ছে, তা বোঝা যায় মোরশেদ সাহেবের *Relativization in Bengali* প'ড়ে। কিন্তু ডিগ্রি কি তাঁর প্রাপ্য?

[২] ***প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাশ্চাত্য দর্শন*** : আমিনুল ইসলাম

১৯৭৮-১৯৮৫ সালের মধ্যে আমিনুল ইসলামের তিনটি বই বেরিয়েছে একাডেমী থেকে : সাত বছরে তিনি প্রায় সমগ্র বিশ্বদর্শন প্রকাশ করেছেন বাঙলা ভাষায়। অল্প সময়ে অসামান্য কাজ করেছেন! তিনি কি মৌলিক গবেষণা থেকে লিখেছেন বইগুলো? একটি বইও তাঁর মৌলিক নয়, প্রতিটি বই লেখা হয়েছে ইংরেজিতে লেখা বই আত্মসাৎ ক'রে, যদিও তিনি তা স্বীকার করেন নি। তাঁর বইতে উৎসনির্দেশও বিশেষ নেই;— ৫৩২ পাতার এ-বইটিতে উৎসনির্দেশ আছে মাত্র ৫টি। এ-বইটি লিখেছেন তিনি Frank Thillyর *A History of Philosophy* (১৯৪৯), F. Copleston-এর *A History of Philosophy* (১৯৪৬), J.E. Erdmann-এর *A History of Philosophy* ও অন্যান্য বই নকল ক'রে। বেশি উদ্ধৃতি দেয়ার, স্থানাভাবে, সুযোগ নেই; আমি শুধু থিলি থেকে তিনি যে অবিকল নকল করেছেন, তা দু-একটি উদাহরণ দেবো। থিলি লিখেছেন, 'The theology of Scotus moves in the familiar atmosphere of Neoplatonism and Augustinian ideas. God is the beginning, middle, and end of all things; from him they come, in him and through him they exist, and to him they will return. He created the world out of nothing. He created the world according to the plan or eternal patterns in his mind (The logos), which is the expression of his being...God,then, is immanent in the world; but he is also transcendent. That is, Scotus is unwilling to conceive the universe as exhausting or even diminishing the devine nature. Just as one light can be seen and one voice heard by many persons without loss to the light or voice, so all things share in divine existence without depriving God of the fullness of his being'(পৃ ১৬৫)। অধ্যাপক ইসলাম নকল করেছেন এভাবে : ' (স্কাটাস) এরিজেনার ধর্মতাত্ত্বিক মত নব্যপ্লেটোবাদী ও অগাস্টিনীয় মতের সদৃশ। ঈশ্বর সবকিছুর উৎপত্তি, স্থিতি, ও সমাপ্তির কারণ; ঈশ্বর থেকে সবকিছুর উদ্ভব, ঈশ্বরেই তারা অস্তিত্বশীল এবং ঈশ্বরেই সব ফিরে যাবে। ঈশ্বর শূন্য থেকে জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর মনের পরিকল্পনা, বা চিন্তার আদর্শ (লোগোস) অনুসারে জগৎ সৃষ্টি করেছেন। লোগোস তাঁর সত্তারই প্রকাশ।...ঈশ্বর জগতে অনুস্যূত (immanent), কিন্তু তিনি আবার জগদাতীত (transcendent), অর্থাৎ জগতে ঐশী সত্তা সম্পূর্ণরূপে উজাড় হয়ে যায়—একথা মানতে এরিজেনা নারাজ। একই আলোক, একই সংগে বহুলোক যেমন দেখতে পারে, একই শব্দ বহু লোক যেমন শুনতে পারে, অথচ তাতে আলো বা শব্দের যেমন হ্রাস হয় না, ঠিক তেমনি সব জীব ঈশ্বরের সত্তার অংশীদার হলেও তাতে ঈশ্বরের সত্তার হানি ঘটে না (পৃ ৩৬৬-৩৬৭)। আরেকটি উদাহরণ। থিলি লিখেছেন, 'Time began with the creation of the world. God not only created the world, but is responsible for its existence at every moment of time : his creation is a continuous creation. He has chosen this world as the best of all

possible worlds. He can will only the best, since his will is determined by the good. His purpose in creation is to reveal himself in all possible ways, hence he creates all possible grades of being'(পৃ ১৯৬)। অধ্যাপক ইসলাম এর নকল করেছেন এভাবে : 'জগৎ সৃষ্টির সঙ্গেই সূত্রপাত হয় কালের। ঈশ্বর যে শুধু জগৎ সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হয়েছেন তা নয়; জগতের পরিচালনা ও সংরক্ষণের মূলেও তিনিই। আসলে সৃষ্টিকর্ম একটি অবিরাম প্রবাহ ও ধারাবিশেষ। ঈশ্বর এ জগতকে অন্যসব সম্ভাব্য জগতের চেয়ে উৎকৃষ্টতর বলে নির্বাচিত করেছেন। ঈশ্বর সব সময় সর্বোত্তমকেই চেয়ে থাকেন, এর কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা শুভ দ্বারা পরিচালিত ও নির্ধারিত। নিজেকে সর্বতোভাবে ব্যক্ত করাই ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মের উদ্দেশ্য। এ জন্যেই তিনি সর্বপ্রকার ও সর্বস্তরের সত্তা সৃষ্টি করেন।' আরো নমুনার জন্যে উৎসাহী পাঠক থিলির ২০৯, ২১৮, ২১৯ পাতার সাথে যথাক্রমে জনাব ইসলামের ৪৫৭, ৪৭১, ৪৭২ পাতা মিলিয়ে দেখতে পারেন।

[৩] *সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শন* : আমিনুল ইসলাম

এটিও অধ্যাপক ইসলাম উল্লিখিত বইগুলো ও আরো কয়েকটি বই নকল ক'রে লিখেছেন। থিলি থেকে তিনি প্রচুর নকল করেছেন। পরিমিতির জন্যে মাত্র একটি উদাহরণ দিচ্ছি। টমাস হিল গ্রিন সম্পর্কে থিলি লিখেছেন, 'The philosophical standpoint of Green is that of objective idealism, which he developed under the influence of the German idealists and in opposition to the traditional English conceptions of the world and of life. On the basis of Kant's criticism and the idealistic metaphysics of his successors, he attacks the empericism of Hume, the hedonism of Mill, and the evolutionism of Spencer, and seeks to supplement natural science with spiritualistic metaphysic. His philosophy is an attempt to do justice to the opposing tendencies of his time,—to rationalism and empericism, religion and science, Pantheism and theism, Greek culture and christianity, the theory of perfection and Utilitarianism, Libertarianism and determinism, individualism and universalism. Man for Green is not merly a child of nature : how could a being that is merely a result of natural forces form a theory of those forces as explaining himself ? Man is a spiritual being and as such not a member of the series of natural events (phenomena). There is in him a principle not natural, and the specific function of this principle is to render knowledge possible. The same spiritual principle that makes knowledge possible has another expression, which consists in the consciousness of a moral ideal and the determination of human action thereby. Without the assumption of such a spiritual self, there can be neither knowledge nor morality'(পৃ ৫৫১)। জনাব ইসলাম এর নকল করেছেন এভাবে : 'টমাস হিল গ্রীন (১৮৩৬–১৮৮২)–এর দার্শনিক মতকে বস্তুগত ভাববাদ (Objective Idealism) বলে অভিহিত করা যায়। জার্মান ভাববাদীদের প্রভাবে, এবং জগৎ ও জীবন সম্পর্কে গতানুগতিক ব্রিটিশ মতবাদের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর ভাববাদ গড়ে তুলেন (sic)।

কান্টের সবিচার ভাববাদ, এবং কান্টের অনুগামীদের ভাববাদী অধিবিদ্যার সমর্থন করে গ্রীন হিউমের অভিজ্ঞতাবাদ, মিলের সুখবাদ এবং স্পেনসারের বিবর্তনবাদকে আক্রমণ করেন। বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদ, ধর্ম ও বিজ্ঞান, সর্বেশ্বরবাদ ও ঈশ্বরবাদ, গ্রীক সংস্কৃতি ও খ্রীষ্টধর্ম, ভাববাদী নীতিবিদ্যা ও উপযোগবাদ, ব্যক্তিবাদ, ও প্রতিষ্ঠানবাদ প্রভৃতি সমকালীন বিরুদ্ধবাদী মতবাদসমূহের সমন্বয় বিধানের চেষ্টা করেছিলেন তিনি। তাঁর মতে, মানুষ প্রকৃতির একটি নিছক সৃষ্টিই নয়, কারণ সে যদি তা-ই হতো, তাহলে সে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের সাহায্যে নিজেকে ব্যাখ্যা করার উপযোগী কোনো মতবাদ গড়ে তুলতে পারত না। মানুষ একটি আধ্যাত্মিক সত্তা, এবং এজন্যই প্রাকৃতিক ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে মানুষকেও একটি প্রাকৃতিক সত্তা বা ঘটনা বলে ব্যাখ্যা করা যায় না। মানুষের মধ্যে এমন একটি নীতি বা শক্তি রয়েছে যা প্রাকৃতিক নয়। এ নীতি বা শক্তির বিশেষ কাজই হলো জ্ঞানকে সম্ভব করে তোলা। জ্ঞানের অন্তর্নিহিত যে আধ্যাত্মিক নীতি রয়েছে, তারও একটি নৈতিক কাজ, নৈতিক আদর্শের চেতনা রয়েছে। এ চেতনার আলোকেই মানুষের কার্যকলাপ নির্ধারিত হয়ে থাকে। এ ধরনের একটি আধ্যাত্মিক অহংকে বাদ দিয়ে জ্ঞান বা নৈতিকতা, এদের কোনটিই সম্ভব নয়' (পৃ ১৫৪)।

[৪] ***মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন*** : আমিনুল ইসলাম

এ-বইটি লিখেছেন তিনি M.Fakhryর *A History of Islamic Philosophy* (১৯৭০), G.D Kheirallahর *Islam and the Arabian Philosophy* (১৯৩৮), বিশেষ ক'রে M.M. Sharif সম্পাদিত *A History of Muslim Philosophy* (Vol : 1, 1963)-এর বিভিন্ন নিবন্ধ নকল ক'রে। Ahmed Fouad El-Ehwany, Abdurrahman Badawi, Bakhtyar Husain Siddiqi প্রমুখের লেখা থেকে তিনি নির্বিচারে নকল করেছেন। শরিফ সম্পাদিত গ্রন্থে আল-কিন্দি সম্পর্কে Ahmed Fouad El-Ehwany লিখেছেন, 'Al-Kufah and al-Basrah in the eighth and ninth centuries, were the two rivalling centres of Islamic culture. Al-Kufah was more inclined to rational studies; and in this intellectual atmosphre, al-Kindi passed his early boyhood. He learnt the Quran by heart, the Arabic grammar, literature, and elementary arithmatic. He, then, studied Fiqh and the new born discipline called *Kalam*. But it seems that he was more interested in sciences and philosophy, to which he consecrated the rest of his life'(পৃ ৪২১)। ইসলাম সাহেব এটা নকল করেছেন এভাবে : 'আট ও ন' শতকের দিকে কুফা ও বসরা ছিল ইসলামী সংস্কৃতির দুটি প্রতিযোগী কেন্দ্র। এ দুয়ের মধ্যে কুফা ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক অধ্যয়নের প্রতি অধিকতর নিবেদিত; আর সেই বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশেই অতিবাহিত হয় আল-কিন্দির শৈশব। শৈশবেই তিনি কোরআন মুখস্থ করেন, এবং আরবী ভাষা ও গণিতে শিক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর তিনি ফিকহ্ ও কালামতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন। তবে বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রতিই তাঁর আগ্রহ ছিল সমধিক, এবং এ দুটি বিষয়ের প্রতিই তিনি নিবেদন করেন তাঁর পরবর্তী কর্মময় জীবন' (পৃ ১৫২)। নকলের আরো নমুনার জন্যে শরিফ সম্পাদিত বইটির ৪২১, ৪২২, ৪২৩, ৪২৮, ৪৪৬, ৪৪৭, ৪৭৩, ৫৬৮, ৫৬৯, ৬১৮ পাতার

সঙ্গে যথাক্রমে ইসলাম সাহেবের বইটির ১৫২, ১৫৩, ১৫৭, ১৭৩, ২১০, ৩৪৩, ২৭৬ পাতা মিলিয়ে দেখুন। ইসলাম সাহেবের তিন খণ্ডের সমগ্র দর্শনকে বলতে পারি 'নকলদর্শনসমগ্র'।

[৫] *গ্রীক দর্শন* : **প্রজ্ঞা ও প্রসার** : মোহাম্মদ আবদুল হালিম

এ-বইটি W.T. Stace-এর *A Critical History of Greek Philosophy* (১৯৩৪) বইটির অবিকল নকল। হালিম সাহেব মাঝে মাঝে মূল বইয়ের বিভিন্ন অংশ বাদ দিয়েছেন, তবে যে-অংশ নিয়েছেন তা প্রায় অবিকল নকল করেছেন। স্টেস হেরাক্লিতাস সম্পর্কে লিখেছেন, 'Heracleitus was born about 535 B.C., and is believed to have lived to the age of sixty. This places his death at 475 B.C. He was thus subsequent to Xenophanes, contemporary with Parmenides, and older than Zeno. Heracleitus was a man of Ephesus in Asia Minor...He appears to have been a man of aloof, solitary, and scornful nature. He looked down, not only upon the common herd, but even upon the great men of his race. He mentions Xenophanes and Pythagoras in terms of obloquy. Homer, he thinks, should be taken out and whipped'(পৃ ৭২)। হালিম সাহেব এর নকল করেছেন এভাবে : 'হিরাক্লিটাস খ্রীষ্টপূর্ব ৫৩৫ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ষাট বৎসর পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব ৪৭৫ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি জেনোফিনিসের পরবর্তী পারামনাইডিসের সমসাময়িক ও জেনোর বয়োজ্যেষ্ঠ। হিরাক্লিটাস এশিয়া মাইনরের ইফিসাসের অধিবাসী। তিনি নির্জন ও নিঃসঙ্গ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি একজন অবজ্ঞাকারী ব্যক্তি ছিলেন। মানুষকে অবজ্ঞা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা তাঁর একটা সহজাত প্রবৃত্তি ছিল। শুধু সাধারণ মানুষকেই নয়, তাঁর সময়কার অতি সম্মানিত ব্যক্তিদেরকেও তিনি কটাক্ষ করতে ছাড়েন নি। তিনি জেনোফিনিস ও পীথাগোরাসকে তীব্র নিন্দা করতেও কসুর করেন নি। হোমর (Homer)-কে ধরে এনে বেত্রাঘাত করা উচিত বলে তিনি মনে করেন' (পৃ ৩০)।

[৬] *ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস* : সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন

এ-বইটি Emile Legouis-এর *A Short History of English Literature* (১৯৩৪, ১৯৮১)-এর নকল। তবে Legouis, Cazamian ও Vergnas-এর *A History of English Literature* (১৯২৬, ১৯৬৪) থেকেও কিছুটা নেয়া হয়েছে। লেখক লেগুইর বইটি ধারাবাহিকভাবে নকল করেছেন, উপমারূপকও বাদ দেন নি, কোথাও কোথাও অনুবাদে ভুলও করেছেন। কিছুটা ভুল অনুবাদের উদাহরণ দিই। লেগুই লিখেছেন, 'No Knowledge of Anglo-saxon poetry is needed in order to read Chaucer; but it is impossible to understand the origin of his work without knowing somthing of the French poetry which preceded it' (পৃ ১৬-১৭)। এর অন্যমনস্ক ভুল অনুবাদ করেছেন লেখক এভাবে : 'অ্যাংলোস্যাকসন না জেনেও চসারের কাব্য অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব, কিন্তু ফরাসী কবিতা এবং সাহিত্য যে ব্যক্তির জানা নেই তার পক্ষে চসারের রাজ্যে প্রবেশ অসম্ভব (পৃ ৯)। লেগুই 'চসারের রাজ্যে প্রবেশের' কথা

বলেন নি, বলেছেন চসারের কাব্যের উৎসের কথা। Legouis, Cazamian ও Vergnas-এর *A History of English Literature*-এ আছে : 'The one of these characteristics which is most widely found, and which is most thrown into relief by a study of Anglo-Saxon, is undoubtedly clarity. To turn from *Beowulf*, or even the *The Battle of Maldon*, to the *Chanson de Roland* is to come out of darkness into light' (পৃ ৫৬)। অধ্যাপক হোসেন এর নকল করেছেন এভাবে : 'অ্যাংলো-স্যাকসনের সঙ্গে ফরাসী ভাষার তুলনা করলে যে বৈশিষ্ট্যটি সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেটা হচ্ছে প্রকাশভঙ্গির প্রাঞ্জলতা। *Beowulf* অথবা, *Battle of Maldon* পাঠের পর *Chanson de Roland* পাঠ করতে গেলে মনে হয় যেন অন্ধকার থেকে একটা উজ্জ্বল আলোকময় পরিমণ্ডলে প্রবেশ করছি' (পৃ ৯)। সারাটি বইই নকল।

[৭] *সাহিত্যকোষ* : কবীর চৌধুরী

এ-বইটি M.H. Abrams-এর *A Glossary of Literary Terms* (১৯৭১) বইটির নকল। অধ্যাপক চৌধুরী অবশ্য ভূমিকায় বলেছেন, 'মূল উৎস হিশেবে আমি যে গ্রন্থটির উপর নির্ভর করেছি তা হল এম এইচ এ্যাব্রামস রচিত *এ গ্লসারি অব লিটারারি টার্মস*, ...অনেক ক্ষেত্রে আমি প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ করে দিয়েছি।' কিন্তু কথা হচ্ছে আমাদের একজন অধ্যাপক কেনো মার্কিন একজন সহকারী অধ্যাপকে.. বইয়ের ওপর নির্ভর করবেন, 'অনেক ক্ষেত্রে আক্ষরিক অনুবাদ' করবেন? এর জন্যে কি অ্যাব্রামস বা তাঁর প্রকাশকের অনুমতি নেয়া হয়েছিলো? অধ্যাপক চৌধুরী আরো বলেছেন, 'কোন কোন ক্ষেত্রে মূল তথ্য নিয়ে নিজের মতো ক'রে তা সাজিয়েছি। কখনো কখনো নতুন তথ্য যোগ করেছি আমার নিজের পঠন-পাঠনের ভিত্তিতে।' বইটি প'ড়ে মনে হয় 'পঠন-পাঠনের ভিত্তি'তে 'নতুন তথ্য' যোগ না করলেই ভালো হতো। যেখানে তিনি নতুন তথ্য যোগ করেছেন, সেখানেই কিছু না কিছু ত্রুটি ঘটেছে। মূল বই যেখানেই জটিল গভীর হয়ে উঠেছে, সে-অংশই অধ্যাপক চৌধুরী বাদ দিয়েছেন, মনে হয় তিনি এমন ধারণা পোষণ করেন যে বাঙলায় জটিল গভীর ব্যাখ্যার দরকার নেই, ভাসাভাসা ব্যাখ্যা দিলেই চলে। আক্ষরিক অনুবাদ করতে গিয়ে অধ্যাপক চৌধুরী মাঝে মাঝেই ভুল করেছেন। যেমন, Aesthetics and Decadence সম্বন্ধে অ্যাব্রামস লিখেছেন, 'Its roots lie in the German theory, proposed by Kant (1790), that aesthetic contemplation is 'disinterested'(পৃ ১)। অধ্যাপক চৌধুরী এর আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন, 'এর শেকড় আমরা দেখি কান্ট প্রস্তাবিত (১৭৯০) একটি জর্মন তত্ত্বে যেখানে সর্বপ্রকার নন্দনতাত্ত্বিক বিবেচনা সম্পূর্ণ 'স্বার্থবিবর্জিত' (পৃ ১)। 'disinterested'-এর আক্ষরিক অনুবাদ হয়তো 'স্বার্থবিবর্জিত', কিন্তু এখানে হবে 'নিরাসক্ত'। নন্দনতত্ত্বে স্বার্থপরায়ণতার বা বিবর্জনের কথা ওঠে না। অ্যাব্রামস লিখেছেন, 'Alliteration is the repitition of speech-sounds in a sequence of nearby words'(পৃ ৭)। অধ্যাপক চৌধুরী এর আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন, 'অনুপ্রাস : পরপর কিংবা খুব কাছাকাছি অবস্থিত শব্দাবলীতে উচ্চারণ-ধ্বনির পৌনপুনিক ব্যবহার' (পৃ ৫)। 'speech-sound'-এর বাঙলা কি 'উচ্চারণ-ধ্বনি'? 'উচ্চারণ-ধ্বনি' কথাটি নিরর্থক; এর

বাঙলা হবে 'বাক্‌ধ্বনি' বা 'বাগ্‌ধ্বনি'।

[৮] *দর্শনকোষ* : সরদার ফজলুল করিম

এ-বইটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত Rosenthal ও Yudin সম্পাদিত *A Dictionary of Philosophy* (১৯৬৭) বইটির নকল। অধ্যাপক করিম *A Dictionary of Philosophy*র প্রথম অন্তর্ভুক্তি Abelard থেকে শেষ অন্তর্ভুক্তি Zoroastrianism পর্যন্ত নকল করেছেন। ভুল অনুবাদও করেছেন মাঝে মাঝে। *Dictionary*তে উরিয়েল একোস্তা সম্পর্কে আছে : 'In 1623 he wrote a treatise on *sobre a mortalidade da alma homen* in which he denied the immortality of the soul and life beyond the grave'(পৃ ৮)। অধ্যাপক করিম এর অনুবাদ করেছেন, '১৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে আত্মার অবিনশ্বরতার উপর 'Sobre a martali dade da alma do homen' নামক গ্রন্থ রচনা করেন এবং দাবী করেন যে, দেহের মৃত্যুর পরে আত্মার অবিনশ্বরতা বলে কিছুই নাই' (পৃ ৭)। বইটি 'আত্মার অবিনশ্বরতার' ওপর নয়, 'নশ্বরতার ওপর', এটা অনুবাদক খেয়াল করেন নি। আরেকটি উদাহরণ দিই। 'Aesthetics' সম্বন্ধে *Dictionary*তে আছে : 'Aesthetics originated about 2,500 years ago, in the period of slave-owning society in Babylon, Egypt, India, and China. It was greatly developed in ancient Greece, in the works of Heraclitus, Democritus, Socrates, Plato, Aristotle, and others; in ancient Rome, in the works of Lucretius, Horace, and others' (পৃ ১০)। *দর্শনকোষ*-এ পাওয়া যায় এর নকল : 'সৌন্দর্যতত্ত্বের উদ্ভব প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে ব্যাবিলন, মিসর, ভারতবর্ষ এবং চীনের দাস-প্রধান সমাজে লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে গ্রীসের হিরাক্লিটাস, সক্রেটিস, প্লেটো, এ্যারিস্টটল এবং অপরাপর দার্শনিকের রচনায় সৌন্দর্যতত্ত্বের জটিলতর বিকাশের আমরা সাক্ষাৎ পাই। প্রাচীন রোমের দার্শনিক লুক্রেশিয়াস এবং হোরেসও সৌন্দর্যতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন' (পৃ ১৪)। সারাটি বইই *Dictionary*র নকল ব'লে আর উদ্ধৃতির দরকার নেই।

[৯] *দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষাকোষ* (২য় খণ্ড) : সাইয়েদ আবদুল হাই

এ-বইটিতে পাওয়া যায় নকলের নকল; এটিকে, প্লাতোর ভাষায়, বলতে পারি সত্য থেকে দ্বিগুণ দূরবর্তী। যেমন, 'রেনেসাঁস' সম্পর্কে Rosenthal ও Yudin সম্পাদিত Dictionaryর ৩৮৭-৩৮৮ পাতা নকল ক'রে সরদার ফজলুল করিম লিখেছেন, 'এই যুগের দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : (১) পৃথিবী ব্যাখ্যায় কপারনিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব; (২) লিউনার্ডো দাভিঞ্চি এবং গেলিলিওর অঙ্ক শাস্ত্রের উপর গবেষণা এবং প্রকৃতির ব্যাখ্যায় আঙ্কিক গবেষণার প্রয়োগ; (৩) জগৎ ঈশ্বরের উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে এই ধর্মীয় ধারণার স্থানে জগতের পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক বিধানসমূহের আবিষ্কার' (পৃ ৩৫৪)। এ-অংশকে সাধু ভাষায় নকলের সাধু কাজটি করেন অধ্যাপক সাইয়েদ হাই এভাবে : 'এই যুগের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইল : (১) পৃথিবীর ব্যাখ্যায় কপারনিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব; (২) লিওনার্ডো দাভিঞ্চি ও গ্যালিলিওর অংক

শাস্ত্রের উপর গবেষণা এবং প্রকৃতির ব্যাখ্যায় আঞ্চলিক (sic; মুদ্রণদোষে বা নকলের অসাবধানতায় 'আঙ্কিক' হয়েছে 'আঞ্চলিক') গবেষণার প্রয়োগ; (৩) জগৎ ঈশ্বরের উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত এই ধর্মীয় ধারণার স্থানে জগতের পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক বিধানসমূহের আবিষ্কার' (পৃ ৮৬৫)।

[১০] *প্রসঙ্গ : বাঙলা ভাষা* : নরেন বিশ্বাস

এ-বইটি কেনো ছাপা হলো, তা বোঝাই দুরূহ। এ-লেখক ইংরেজিতে বিশ্বাস করেন না, তাই তিনি নকল করেছেন বাঙলা বই থেকেই। 'নিবেদন'-এ লেখক তাঁর এগারোজন ছাত্রছাত্রীকে আশীর্বাদ করেছেন তাঁরা বইয়ের পাণ্ডুলিপি—'সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি'—প্রস্তুত ক'রে দিয়েছে ব'লে। ছাত্ররা স্যারকে সুনীতিকুমার ও অন্যান্যের বই থেকে শব্দের তালিকা নকল ক'রে দিয়েছে, আর তিনি তাতে কয়েকটি প্রবন্ধ ভ'রে তুলেছেন। এখানে আমি শুধু দুটি প্রবন্ধ উল্লেখ করবো। লেখক 'বাঙলা ভাষায় প্রাণিনাম বাচক শব্দ' প্রবন্ধটি নকল করেছেন বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের *বাগর্থ* (১৯৭৭) বইয়ের 'শব্দে ও প্রবচনে প্রাণী-নাম' প্রবন্ধ থেকে। 'ভূমিকা'য় ডঃ আহমদ শরীফ বলেছেন, 'বাঙলাভাষায় প্রাণিনামবাচক শব্দ' প্রবন্ধটি অত্যন্ত চিত্তচমকপ্রদ।' লেখকও গৌরববোধ করেছেন প্রবন্ধটি লিখে। তিনি বলেছেন, 'বাঙলা ভাষায় প্রাণিনাম বাচক শব্দ' প্রবন্ধে আমি বাঙালী পাঠক-সমাজকে বাঙলা ভাষার ঋদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রাণিকুলের অবদানকে উদার স্বীকৃতিদানের একান্ত আহ্বান জানিয়েছি।' তবে তিনি মূল লেখক বিজনবিহারী ভট্টাচার্যকে স্বীকৃতি দেন নি। নকলের দু-একটি উদাহরণ দিই। বিজনবিহারী লিখেছেন, 'নির্বুদ্ধিতার দিক দিয়ে গোরুকেও গাধার শামিল করা হয়। গোমূর্খ শব্দ গোরুর গোত্বের প্রাচীন প্রমাণ। ...গোরুর নিরীহতার আভাস আছে 'গোবেচারা' শব্দে।...গো-জাত 'গোবা', 'গোবু' প্রভৃতি শব্দ নির্বোধের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়। হবুচন্দ্র রাজার যিনি মন্ত্রী ছিলেন তাহার নাম গবুচন্দ্র। ...গোরুর পায়ের ধূলি উড়ে বলিয়া সন্ধ্যার নাম 'গোধূলি'। কেহ অনেক খাদ্য মুখে পুরিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া খাইলে বলি 'গোগ্রাসে' গিলিতেছে। এক জাতীয় সাপের নাম হইল 'গোক্ষুরা' তাহা হইতে গোখরো। কেন? না, তাহার মাথায় যে চিহ্ন আছে তাহা দেখিয়া কাহারও কোনোকালে গোরুর ক্ষুরের মত মনে হইয়াছিল। ...গোরুর মত মুখ বলিয়া কুমিরের নাম 'গোমুখ'। ...জানালার নাম 'গবাক্ষ'। এক সময়ে গোরুর চোখের আকৃতি অনুসারে বাতায়ন নির্মিত হইত' (পৃ ১২০-১২১)। এসব তরল নকল ক'রে নরেনবাবু লিখেছেন, 'লোকটা গোমূর্খ এখানে গোরুর নির্বুদ্ধিতার (ধারণা) থেকে শব্দটি নির্মিত, আবার যখন বলা হয় 'আহা গোবেচারা' তখন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে...গোরুর নিরীহতার সকরুণ চিত্রটি। ...কেউ যদি প্রচুর খাবার মুখে পুরে...খুব ব্যস্তভাবে খেতে শুরু করে... আমাদের বিস্ময় ভাষারূপ পায়, দেখ দেখ কেমন 'গোগ্রাসে' গিলছে। ...বিষধর 'গোখরা' সাপ হয়তো একদিন গো-পদ (ক্ষুর) চিহ্ন মস্তকে ধারণ করেই 'গোক্ষুরা' নাম প্রাপ্ত হয়েছিল। ...কুমীরের মুখ যেহেতু কিছুটা গোরুর মুখের মত, তাই কুমীরের অন্য নাম 'গোমুখ'। ...গোরুর চোখের পরিকল্পনায় ...মানুষ বাতায়ন নির্মাণ করেছিল,

...জানালার আকৃতি পরিবর্তিত হলেও 'গবাক্ষ' নামটি অপিবর্তিত রয়ে গেছে। ...গোরুর...ক্ষুরের আঘাতে পথের ধূলি উড়িয়ে ছুটে যায় গৃহপানে...তাইতো গ্রাম বাঙলার এ সন্ধ্যা অবশ্যই 'গাধূলি' (পৃ ৮৬-৮৭)। পাঠক প্রবন্ধ দুটি পড়লেই নকলের পাণ্ডিত্য উপলব্ধি করবেন। নরেন বাবু 'বাঙলা ভাষার শব্দ' প্রবন্ধটি লিখেছেন পার্বতীচরণ ভট্টচার্যের *বাংলাভাষা* (১৯৭৬) বইয়ের 'শব্দপ্রসঙ্গ' প্রবন্ধটি থেকে অকৃপণ নকল ক'রে। একটি উদাহরণ দিই। পার্বতীচরণ 'তিব্বতী-চীনা শব্দ' সম্পর্কে লিখেছেন, 'তিব্বতী-চীনা শাখার শব্দ বাংলা ভাষায় অত্যন্ত কম। তাদের কোন বিশেষ প্রভাবও বাংলা ভাষায় নেই। ...আধুনিক চীনা 'চু'। চীনের সমুদ্র উপকূলের দেশগুলিতে বলে 'তে'। এই 'তে' 'টে' হয়ে সপ্তদশ শতাব্দীতে সমগ্র য়ুরোপে ছড়িয়েছে কোথাও টে কোথাও টী রূপে; জার্ম টে Der tee, ফরা তে the, ইং tea। ...উত্তর চীনের ছা, চা হয়ে সমগ্র ভারতে চা অথবা চায় হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। হাল জমানায় একটি শব্দ আমদানি হয়েছে চীনের বাগভঙ্গিমায়। শব্দটি খোশামুদে সুতরাং প্রিয়পাত্র অর্থে 'চাম্‌চা'। আসলে চীনা শব্দটি হচ্ছে চিং ছা—যার অর্থ তাজা বা Green tea। চীনা শব্দ 'দাও' বাংলায় কাটারি অর্থে গৃহীত। ...চীনা শব্দ 'তাইফাং' জাপানে হয়েছে 'তাইফুন'—Typhoon। আরব পারস্য তুর্কিস্তানে এই শব্দ তুফান হয়ে ফার্সীর মধ্য দিয়ে বাংলায় একাধিপত্য ক'রে চলেছে (পৃ ২৫৭-২৫৮)। এ-অংশ নকল ক'রে নরেনবাবু তাঁর পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করেছেন এভাবে : 'বাঙলা ভাষায় তিব্বতী-চীনা (ভাষা) শাখার শব্দ খুবই কম। বাঙলা ভাষায় এর প্রভাব তেমন লক্ষ্যযোগ্য নয়। ফলে সঙ্গত করণেই দু'চারটে শব্দের উদাহরণ এখানে সংযোজিত হলো। যেমন—উত্তর চীনের শব্দ 'ছা' (Tea) বাঙলা ভাষায় 'চা', চীনা শব্দ 'চিংছা' যার অর্থ হচ্ছে তাজা চা (Green tea) এর থেকে বাঙলায় 'চাম্‌চা (খোশামুদে বা চাটুকার) এবং বাঙলাদেশের ভাষায় চীনা শব্দ 'দাও' (কাটারি) অবিকৃতভাবে কাটারি অর্থেই ব্যবহৃত। চীনা 'তাইফাং' শব্দটি জাপানে হয়েছে 'তাইফুন' (Typhoon) এবং আরব পারস্যে এই শব্দ 'তুফান'এ রূপান্তরিত হয়ে ফরাসীর (Sic; লেখক হয়তো ফারসি ও ফরাশির পার্থক্য বোঝেন না) মধ্যদিয়ে নদীবহুল বাঙলাদেশে 'তুফান' হয়েই ঢুকেছে' (পৃ ৯)। খুবই মৌলিক ভাষাতত্ত্ব পাওয়া গেছে এখানে।

[১১] *চরিতাভিধান* : শামসুজ্জামান খান, সেলিনা হোসেন সম্পাদিত

এ-চরিতাভিধানখানিতে দু-হাতে নকল করা হয়েছে *সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান* (১৯৭৬) থেকে। বেশি উদাহরণে যাচ্ছি না; মাত্র একটি উদাহরণ দিচ্ছি। *মেঘনাদ সাহা* সম্পর্কে সংসদ *বাঙালী চরিতাভিধানে* আছে : 'এই সময়ে বাঘা যতীন, পুলিন দাস প্রভৃতি বিপ্লবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার অপরাধে তিনি ফিনাল পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি লাভে বঞ্চিত হন। ...গবেষণার বিষয় ছিল রিলেটিভিটি, প্রেসার অফ লাইট ও অ্যাস্ট্রোফিজিক্স। এরপর ১৯২০ খ্রী 'থিওরি অফ থার্মাল আয়নিজেশন' বিষয়ে গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও পরিচিতি পান। ...শিক্ষক হিশেবে তিনি পৃথিবীজোড়া খ্যাতি পেয়েছেন। তাঁর সম্পর্কে আইনস্টাইন বলেন, 'Dr. M.N. Saha has won an

honoured name...' ১৯৩৮ খ্রী ডঃ মেঘনাদ কলিকাতায় এসে বিজ্ঞান কলেজের পালিত অধ্যাপক হন ও পরে গড়ে তোলেন 'ইনিস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স'। ...বক্তৃতায় সীমাবদ্ধ না রেখে 'ন্যাশনাল ইনিস্টিটিউট অফ সায়েন্স' প্রতিষ্ঠা করেন এবং পণ্ডিত জওহরলালকে 'শিল্প প্রসার ও জাতীয় পরিকল্পনার কথা' জানান। 'সায়েন্স অ্যান্ড কালচার' পত্রিকা মারফত দামোদর উপত্যকা, সংস্কার, ওড়িশার উন্নয়ন, খাদ্য ও দুর্ভিক্ষ, ভারতের জাতীয় গবেষণা সমিতি, নদী-উপত্যকা উন্নয়ন ইত্যাদি ভারতের বিভিন্ন সমস্যা বিষয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের প্রথম সূত্র এমনি একটি প্রবন্ধ এবং এরকম আর একটি প্রবন্ধের জন্যই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্র (১৯৩৮) নেহেরুকে সভাপতি করে একটি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করেন। ...দিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবনে পরিকল্পনা কমিশনের সভায় যাবার পথে মৃত্যু। মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউটের নামকরণ হয় 'সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স' (পৃ ৪১৯)। এর বিশ্বস্ত নকল পাওয়া যায় *চরিতাভিধান*-এ : 'এই সময়ে বাঘা যতীন, পুলিন দাস প্রমুখ বিপ্লবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার অপরাধে ফিনান্স পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি লাভ থেকে বঞ্চিত। গবেষণার বিষয় ছিল রিলেটিভিটি, প্রেসার অব লাইট ও অ্যাস্টোফিজিক্স। ১৯২০-এ 'থিওরী অব থার্মাল আয়োনিজেশন' বিষয়ে গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও পরিচিতি লাভ। ...১৯৩৮-এ কলকাতায় বিজ্ঞান কলেজে পালিত অধ্যাপক নিযুক্ত। অক্লান্ত প্রচেষ্টায় গড়ে তোলেন 'ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স'। ...তাঁর চিন্তাকে শুধু বক্তৃতা, বিবৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স' প্রতিষ্ঠা করেন এবং জওহরলাল নেহেরুকে শিল্প প্রসার ও জাতীয় পরিকল্পনার কথা জানান। 'সায়েন্স এ্যান্ড কালচার' পত্রিকা মারফত দামোদর উপত্যকা সংস্কার, উড়িষ্যার উন্নয়ন, খাদ্য ও দুর্ভিক্ষ, ভারতের জাতীয় গবেষণা সমিতি, নদী উপত্যকা উন্নয়ন ইত্যাদি ভারতের বিভিন্ন সমস্যা বিষয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের প্রথম সূত্র এমন একটি প্রবন্ধ। ১৯৩৮-এ এই রকম আর একটি প্রবন্ধের জন্যেই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্র নেহেরুকে সভাপতি করে একটি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করেন। ...শিক্ষক হিশেবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেয়েছিলেন। আইনস্টাইন বলেছিলেন "Dr. M.N. Saha has won an honoured name...।" মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউটের নামকরণ হয় 'সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স'। মৃত্যু দিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবনে পরিকল্পনা কমিশনের সভায় যাবার পথে' (পৃ ২০৩)। ধরা পড়ার ভয়ে আগের জিনিশ পিছে আর পিছের জিনিশ আগে চালাচালি করা হয়েছে কিছুটা, তাতে নষ্ট হয়ে গেছে জীবনক্রম।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এ-বইগুলো (এবং এমন আরো হাজারখানেক বই) সম্পর্কে কী সিদ্ধান্ত নেবে বাংলা একাডেমী? বইগুলো বিচারের জন্যে বাংলা একাডেমীকে গঠন করতে হবে অসংখ্য তদন্ত পরিষদ, এবং আগামী একদশক একাডেমীকে ব্যস্ত থাকতে হবে তদন্তে, তদন্তে ও তদন্তে। বাংলা একাডেমীর এ-বইগুলো (এবং এমন আরো হাজারখানেক বই) বিক্রি বন্ধ ক'রে দিতে হবে অবিলম্বে; একাডেমীর বিক্রয়

বিভাগটিকে লুপ্তও ক'রে দিতে হ'তে পারে, কেননা ওটির দরকার পড়বে না কয়েক বছর। তবে একটি বইকে—*আধুনিক ভাষাতত্ত্ব* বইটিকে প্রত্যাহার, এমনকি নিষিদ্ধ ক'রে দিতে হবে চিরকালের জন্যে, কারণ ওটি বইয়ের ছদ্মবেশে বইয়ের বিপরীত বস্তু। এমন ভুলভ্রান্তিপূর্ণ বই ছাত্রদের হাতে তুলে দেয়া অমার্জনীয় অপরাধ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টিও আকর্ষণ করতে চাই এ-দিকে; —বিশ্ববিদ্যালয়ের এখন ভালোভাবে বিচার ক'রে দেখার সময় এসে গেছে তার পণ্ডিত অধ্যাপকেরা জ্ঞানচর্চা ও পুস্তকপ্রণয়নের নামে লিপ্ত রয়েছেন কোন বৃত্তিতে।

পাদটীকা : সৈয়দ আলী আহসানের কুম্ভিলক বৃত্তি

তথাকথিত জাতীয় অধ্যাপক ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান সৈয়দ আলী আহসান কুম্ভিলক হিশেবে বিশেষ পরিচিত। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি পরের গদ্য-পদ্য-গবেষণা সব কিছুই অপহরণ করেছেন। কিন্তু কখনো স্বীকার করেন নি। *অনেক আকাশ* কাব্যগ্রন্থে তিনি ইভান গলের কবিতা নিজের ব'লে চালিয়েছেন। তবে 'জাতীয় কবি' কাজী নজরুল ইসলামকে অপহরণকারী হিশেবে অভিযুক্ত করতে তিনি দ্বিধা বোধ করেন নি। *নজরুল ইসলাম* (১৩৬১, মখদুমী অ্যান্ড আহসানউল্লাহ্ লাইব্রেরী, ঢাকা) নামে গুরুত্বহীন একটি বইয়ে তিনি এ-অভিযোগ তোলেন। তিনি হুইটম্যানের 'পাইয়োনিয়ারস! ও পাইয়োনিয়ারস!' ও নজরুলের 'অগ্রপথিক' কবিতা দুটি তুলনা ক'রে দেখান যে নজরুল হুইটম্যানের নকল করেছেন। নজরুলের 'অগ্রপথিক' সম্বন্ধে সৈয়দ আলী আহসান বলেন, 'দীর্ঘ ইংরেজী কবিতার প্রত্যেক স্তবক 'প্রতিচরণ' কখনো বা শব্দ পর্যন্ত ভাষান্তরিত হ'য়েছে। এতে অগৌরবের কিছু নেই : কিন্তু স্বীকৃতি প্রয়োজন ছিলো' (*নজরুল ইসলাম*, পৃ ২৩)। উল্লেখ করা যেতে পারে যে নজরুল পত্রিকায় প্রকাশের সময় হুইটম্যানের কাছে ঋণ স্বীকার করেছিলেন; কিন্তু সৈয়দ আলী আহসান তা উপেক্ষা ক'রে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নজরুলের বিরুদ্ধে এ-অভিযোগ তোলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ)* নামে বাংলা সাহিত্যের একটি ইতিহাস রচনা করেন। বইটির প্রকাশক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫৬)। বইটির 'কলিকাতা-কেন্দ্রিক নতুন সাহিত্য-জীবন' (সপ্তম পরিচ্ছেদ) নামক পরিচ্ছেদটি লেখেন সৈয়দ আলী আহসান। পরিচ্ছেদটি তিনি জে সি ঘোষের *Bengali Literature* (১৯৪৮, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস : লন্ডন) নামক বইয়ের 'Calcutta Period' (পঞ্চম) পরিচ্ছেদটি পুরোপুরি নকল ক'রে লেখেন। এ-বিষয়ে আগেও অভিযোগ উঠেছে, কিন্তু তিনি মূল লেখকের কাছে আজো ঋণ স্বীকার করেন নি। তাঁর কুম্ভিলকতার কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো।

জে সি ঘোষ লিখেছেন : 'It was the birthplace of all the important religious, social, educational, and literary movements... The old literature was mainly the work of village poets writing for village folk, and it retained its essential rustic character even when it was produced under direct aristocratic patronage

in the courts of nawabs and rajas. But the new literature that begins with the nineteenth century is mostly the work of writers who lived in Calcutta and wrote for urban readers. Being urban these writers are more cultivated and refined than their predecessors, and have a wider range of interest' (*Bengali Literature*, 1948,98). সৈয়দ আলী আহসান এ-অংশটুকু এভাবে অপহরণ করেন : 'উনিশ শতকের সর্বপ্রকার ধর্মীয়, সামাজিক, শিক্ষাগত, এবং সাহিত্য-আন্দোলনের কেন্দ্র হল কলকাতা। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য গ্রাম্য পরিবেশে প্রধানতঃ গ্রাম্য কবিদেরই রচনা। যে সময় এ সাহিত্য রাজ-আনুকূল্য সমৃদ্ধমান হচ্ছিলো তখনও এর মৌলিক গ্রাম্য দেশজভাব নষ্ট হয় নি। কিন্তু উনিশ শতকের নতুন সাহিত্য নাগরিকজনের জন্য লেখা। সাহিত্যিক এবং কবিরাও ছিলেন নাগরিক সংস্কৃতি-পুষ্ট। নাগরিক সংস্কৃতি-পুষ্ট বলেই উদার এবং প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাঁরা সাহিত্য সাধনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। পরিমার্জিত রুচি সংগত সহজ ভাষায় তাঁরা সাহিত্য সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করলেন' (*বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ৫ম সংস্করণ, ১৩৮৫, পৃ ২৩১)।

জে সি ঘোষ লিখেছেন, 'Mudhusudan had a very unhappy life, though this was in the main due to his inordinate wordly ambition and his careless and improvident ways. The son of a well-to-do lawyer, he was born in the village of Sagardari in the district of Jessore. Sagardari stands on the river Kapotaksa... He began to write verse in English, and to dream of coming to English. The following was written at the age of seventeen :

I sigh for Albion's distant shore,...

The boy had no lack of ambition, and sent poems to *Blackwood's Magazine* and *Bentley's Miscellany*. Byron was the idol of Madhusudan's youth... in the course of which he studied no less than twelve languages : Bengali, English, Persian, Sanskrit, Tamil, Telugu, Latin, Greek, Hebrew, French, German, Italian' (*Bengali Literature*, pp. 137-139). সৈয়দ আলী আহসান এভাবে এর নকল করেন : 'মধুসূদনের জীবনে শান্তি ও সুখভোগ ছিলো না। উচ্চাশা ও বিশৃঙ্খল জীবন-যাপনই মূলতঃ তাঁর সর্বনাশের জন্য দায়ী। তিনি ছিলেন যশোরের সাগরদাঁড়ী গ্রামের এক ধনী আইনজীবীর পুত্র। কপোতাক্ষ নদীর তীরে সাগরদাঁড়ী গ্রাম।...ইংরেজীতে কবিতা লেখা আরম্ভ করেন এবং ইংলেন্ডে যাবার জন্য ব্যকুল হন। সতেরো বছর বয়সে লেখা এক ইংরেজী কবিতায় এ-ব্যাকুলতার পরিচয় আছে– I Sigh for Albion's distant shore,...মাইকেলের উচ্চাশার অন্ত ছিল না। বালক বয়সেই Blackwood's Magazine এবং Bentley's Miscellany-তে ইংরেজী কবিতা পাঠাতে আরম্ভ করেন। এ-বয়সে বায়রন ছিল তাঁর প্রিয় কবি।...কলেজে অধ্যয়ন কালে ন্যূনধিক বারোটি ভাষা আয়ত্ত করেন–বাংলা, ইংরেজী, ফারসী, সংস্কৃত, তামিল, তেলেগু, ল্যাটিন, গ্রীক, হীব্রু, ফরাসী, জার্মান, ইটালিয়ান' (ওই, পৃ ২৪২-২৪৩)। এ-কুন্তিলকবৃত্তির স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি উপাচার্য, উপদেষ্টা, জাতীয় অধ্যাপক ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যানের পদ অলঙ্কৃত করেন।

বাঙলা ব্যাকরণ রচনার সমস্যা

'বাঙ্গালা ভাষায় কিছু কম আড়াই শত বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখিত হইয়াছে।' —এ-বাক্যটি দিয়ে ১৯০১ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী শুরু করেছিলেন তাঁর মূর্তিভাঙা প্রবন্ধ 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' (১৩০৮)। এক যুগ পরে, ১৯১৩তে, যোগেশচন্দ্র রায় *বাঙ্গালা ভাষা* (১৩১৯) নামের ব্যাকরণের ভূমিকায় জানান যে ব্যাকরণটি লেখার সময় তিনি দেখেছেন মাত্র চারটি ব্যাকরণ। শাস্ত্রীর উক্তি নির্দেশ করে বাঙলা ব্যাকরণের আগাছাধর্মী প্রাচুর্য, আর যোগেশচন্দ্রের সাক্ষ্য নির্দেশ করে বাঙলা ব্যাকরণের আকাল; তবে বাঙলা ব্যাকরণের এলাকা এমন প্রাচুর্য ও আকালের এলাকা নয়। আঠারো-উনিশশতকে ইংরেজি ও বাঙলায়, এবং বিশশতকে বাঙলায় লেখা হয়েছে প্রচুর বাঙলা ব্যাকরণ। বাঙলা ব্যাকরণ সাধারণত লেখা হয়েছে শিক্ষার্থীদের লক্ষ্যে রেখে, বাঙলা ভাষার গভীর শৃঙ্খলা উদঘাটন এগুলোর লক্ষ্য নয়। শাস্ত্রী অভিযোগ করেছিলেন : 'গত দশ বৎসরের মধ্যেই ইহাদের অধিকাংশ প্রাদুর্ভূত হইয়া বঙ্গীয় বালকগণের মস্তিষ্ক বিকৃত এবং তাঁহাদের অভিভাবকগণের পয়সা অপহরণ করিতেছেন। এতগুলি ব্যাকরণ বাহির হইয়াছে বলিয়া বাঙ্গালীর গৌরব করিবার কিছুই নাই; কারণ সমস্ত বাঙ্গালা ব্যাকরণগুলিই দুই শ্রেণীর লোক কর্তৃক দুই প্যাটেন্টে প্রস্তুত হইতেছে; একটি মুগ্ধবোধ-প্যাটেন্ট গ্রন্থকার পণ্ডিতগণ, আর একটি হাইলি-প্যাটেন্ট গ্রন্থকার মাষ্টারগণ।' আঠারো-উনিশশতকে ইংরেজিতে বাঙলা ব্যাকরণ লিখেছিলেন হ্যালহেড (১৭৭৮ : *A Grammar of the Bengal Language*), কেরি (১৮০১ : *A Grammar of the Bengalee Language*), গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য (১৮১৬ : *A Grammar in English and Bengali*), কিথ (১৮২০ : *A Grammar of the Bengali Language*), হটন (১৮২১ : *Rudiments of Bengali Grammar*), রামমোহন রায় (১৮২৬ : *Bengali Grammar in the English Language*), শ্যামাচরণ সরকার (১৮৫০ : *A Grammar of the Bengalee Language*), বীম্‌স্ (১৮৯১ : *A Grammar of the Bengali language, Literary and Colloquial*), যদুনাথ ভট্টাচার্য (১৮৭৯ : *Introduction to Bengali Grammar*), কে পি ব্যানার্জি (১৮৯৩ : *Rudiments of Bengali Grammar in English*) প্রমুখ; এবং বাঙলায় লিখেছিলেন রামমোহন রায় (১৮৩৩ : *গৌড়ীয় ব্যাকরণ*), শ্যামাচরণ সরকার (১৮৫২ : *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*), ব্রজনাথ বিদ্যালঙ্কার (১৮৭৮ : *ব্যাকরণ-সেতু*), নিত্যানন্দ চক্রবর্তী (১৮৭৮ : *ব্যাকরণ-প্রবেশ*), নীলমণি মুখোপাধ্যায় (১৮৭৮ : *বোধ-সার*), কেদারনাথ তর্করত্ন (১৮৭৮ : *ব্যাকরণ-মঞ্জরী*), চিন্তামণি গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮১ : *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*), প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন (১৮৮৪ : *সাহিত্য-প্রবেশ*), নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ (১৮৯৮, ১৪শ মুদ্রণ : *ভাষাবোধ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*), বীরেশ্বর পাঁড়ে (১৮৯৯ , ২য় সংস্করণ : *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*) প্রমুখ। বিশশতকে বাঙলায় বাঙলা ব্যাকরণ লিখেছেন যোগেশচন্দ্র রায় (১৩১৯ : *বাঙ্গালা ভাষা* : প্রথম ভাগ; ১৩২০ : *বাঙ্গালা ভাষা* : দ্বিতীয় ভাগ), জগদীশচন্দ্র ঘোষ (১৩৪০ : *আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ*), মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৩৪২ : *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*), কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন (১৯৩৭

: *সরল বাঙ্গালা ব্যাকরণ*), সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৯ : *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*; ১৩৬৩ : *সরল ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*), উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (১৯৪০ : *বাংলাভাষার ব্যাকরণ*), মুহম্মদ এনামুল হক (১৯৫২ : *ব্যাকরণ-মঞ্জরী*), কালিদাস রায় (? : *নবপ্রবেশিকা ব্যাকরণ*), মুনীর চৌধুরী ও অন্যান্য, পুনর্মুদ্রণ ১৯৭২ : *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*) প্রমুখ। এসব ব্যাকরণ প্রথাগত, ছাত্রপাঠ্য, ও নানাভাবে ত্রুটিপূর্ণ। এগুলোর প্রধান ত্রুটি তাত্ত্বিক, আর গৌণ কিন্তু মারাত্মক ত্রুটি বর্ণনা ও ব্যাখ্যার।

ব্যাকরণ বলতে আমরা যা বুঝি, তা হচ্ছে প্রথাগত আনুশাসনিক ব্যাকরণ, যার প্রধান লক্ষ্য শুদ্ধ শব্দ গঠনের কৌশল শেখানো। এ-ব্যাকরণ কিছু প্রথাগত বিধিনিষেধের তালিকা প্রস্তুত ক'রে ব্যবহারকারীদের ওই সব বিধিনিষেধ মেনে চলার নির্দেশ দেয়। প্রথাগত আনুশাসনিক ব্যাকরণের উদ্দেশ্য ভাষা বিশ্লেষণ বা বর্ণনা করা নয়, এর লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের কিছু বিধি শেখানো, যা ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীরা শুদ্ধভাবে ভাষাপ্রয়োগে সক্ষম হবে ব'লে মনে করা হয়। প্রথাগত ব্যাকরণরচয়িতারা ও ব্যবহারকারীরা একে গণ্য ক'রে থাকেন ভাষাধর্মগ্রন্থ ব'লে, যার বিধি মেনে চলা অবশ্য কর্তব্য, যার বিধি থেকে বিচ্যুত হ'লে ঘটে ভাষিক পাপ। ভাষার সব স্তরের অনুশাসন রচনাও এ-ব্যাকরণের লক্ষ্য নয়; শুধু শব্দের স্তরটি অসম্পূর্ণরূপে বর্ণনা ক'রেই প্রথাগত আনুশাসনিক ব্যাকরণের দায়িত্ব সম্পন্ন হয়। বাঙলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণরচয়িতারা ছিলেন বিদেশি; তাঁরা প্রধানত ইংরেজি ভাষা ও ব্যাকরণের আদলে রচনা করেন বাঙলা ভাষার বিধিবিধান, এমনকি গ্রিক ও লাতিন ব্যাকরণরচয়িতা থ্রাক্স ও প্রিসকিআনের কিছু ধারণাও ঢুকিয়ে দেন বাঙলা ব্যাকরণে। তাঁদের পর আসেন দেশি ব্যাকরণবিদেরা, যাঁরা বাঙলাকে বিকৃত সংস্কৃত ব'লে গণ্য ক'রে বাঙলার ওপর আরোপ করেন সংস্কৃত বিধিবিধান। এরপর রচিত হ'তে থাকে সংস্কৃত ও ইংরেজি ব্যাকরণের মিশ্র কাঠামোতে বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ, যা এখন চলছে। ব্যাকরণ যেহেতু প্রধানত বিদ্যালয়ের কোমলমতি শিক্ষার্থীদেরই পাঠ্য, তাই বাঙলা ব্যাকরণরচয়িতারা বাঙলা ভাষার মৌলিক ও আভ্যন্তর সূত্র উদঘাটনের চেষ্টা করেন নি; এখন একেবারেই করেন না। তাঁরা সাধারণত পুরোনো ব্যাকরণ থেকে বিভিন্ন বিষয় সংগ্রহ ক'রে প্রকাশ করেন নিজেদের ভাষায়। তাই বাঙলা ব্যাকরণ হয়ে উঠেছে বাঙলা ভাষার খণ্ডিত, ও অনেকাংশে বিভ্রান্তিকর, প্রথাগত বিধিসংকলন, যা ছাত্রদের কিছুটা উপকার করে; কিন্তু বাঙলা ভাষার বিভিন্ন স্তরের শৃঙ্খলা উদঘাটন করে না।

উনিশশতকের শেষ দশকে উদ্যোগ নেয়া হয় অপ্রথাগতভাবে বাঙলা ভাষা বর্ণনাবিশ্লেষণের; বিশশতকের প্রথম দশকে দেখা দেন কয়েকজন বিশ্লেষক, যাঁরা অভিনবভাবে বাঙলা ভাষা বর্ণনাবিশ্লেষণের চেষ্টা করেন। তাঁদের বলতে পারি 'নবব্যাকরণবিদ'। এ-সময় ছিলেন একটি পুরোনো ব্যাকরণবিদগোত্র, যাঁরা বাঙলাকে সংস্কৃতের দুহিতা বা বিকৃত সংস্কৃত ব'লে গণ্য ক'রে বাঙলা ভাষার ওপর চাপিয়ে রাখতে চান সংস্কৃত বিধিবিধান। নবব্যাকরণবিদেরা বাঙলাকে গণ্য করেন একটি স্বাধীন স্বায়ত্তশাসিত ভাষারূপে, এবং তার জন্যে দাবি করেন স্বায়ত্তশাসিত ব্যাকরণ। পুরোনো, সংস্কৃতপন্থী, গোত্রে ছিলেন শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীনাথ সেন প্রমুখ;

আর নবব্যাকরণবিদ গোত্রে ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ. সংস্কৃতপন্থীদের কাছে বাঙলা ছিলো সংস্কৃতেরই কথ্য-বিকৃত-প্রাকৃতরূপ, যাকে সংস্কার ক'রে পুনরায় সংস্কৃত ক'রে তোলা সম্ভব ও উচিত। শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রীর (১৩০৮ : 'নূতন বাঙ্গালা ব্যাকরণ', ও 'ব্যাকরণ ও বাঙ্গালা ভাষা') মতে বাঙলা ভাষা 'সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন'; আর 'ইহার গতি, স্থিতি সমুদয়ই সংস্কৃতের অনুরূপ।' তাঁর মতে বাঙলা 'একপ্রকার কালান্তর প্রচলিত সংস্কৃত ভাষা'। শ্রীনাথ সেনও (১৩১৬ : 'প্রাকৃত ব্যাকরণ ও অভিধান') মনে করেন যে 'বঙ্গভাষা সংস্কৃতের একপ্রকার কথিতাকার', এবং 'সংস্কৃত আমাদের সাহিত্যের ভাষা, বাঙ্গালা তাহার কথিত আকার'। তিনি বাঙলাকে বলেন 'বর্ত্তমান প্রাকৃত'। তিনি আরো বলেন যে 'কথিত ভাষার ব্যাকরণ হয় না, এবং হইতে পারে না।' তিনি মনে করেন যে 'বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত ব্যাকরণের দ্বারা প্রশমিত হইতে পারে এবং তাহা হইলেই ইহার কল্যাণ'; আর বাঙলা ব্যাকরণ 'সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুষঙ্গী হইতে পারে, স্বতন্ত্র ব্যাকরণ হইতে পারে না।'

নবব্যাকরণবিদেরা নিশ্চিত ও নির্ভুলভাবে ধ'রে নিয়েছিলেন যে বাঙলা একটি স্বতন্ত্র স্বায়ত্তশাসিত ভাষা; সংস্কৃতের সাথে তার সম্পর্ক সুদূর। তখনকার প্রথাগত ধারণা—বাঙলা সংস্কৃতের দুহিতা—গ্রহণযোগ্য ছিলো না তাঁদের কাছে; এবং প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণগুলোকে বাতিল ক'রে দিয়ে তাঁরা অভিনব বর্ণনামূলক ভঙ্গিতে বর্ণনা করতে শুরু করেন বাঙলা ভাষা। রবীন্দ্রনাথ 'বাংলা উচ্চারণ' (?১২৯৮) প্রবন্ধে বলেন, 'প্রকৃত বাংলাব্যাকরণ একখানিও প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃতব্যাকরণের একটু ইতস্তত করিয়া তাহাকে বাংলাব্যাকরণ নাম দেওয়া হয়।' দ্বিজেন্দ্রনাথ 'উপসর্গের অর্থবিচার' (১৩০৪) প্রবন্ধে অভিনব পদ্ধতিতে বর্ণনা করেন বাঙলা উপসর্গগুলো; কোনো আক্রমণ না ক'রেই তিনি দেখিয়ে দেন প্রথাগত উপসর্গবিধির অসারতা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৩০৮ : 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ') প্রচণ্ড আক্রমণ করেন প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণ ও ব্যাকরণবিদসম্প্রদায়কে, দেখান প্রথাগত ব্যাকরণের বিভিন্ন ভ্রান্তি ও স্ববিরোধিতা; বাতিল ক'রে দেন ছাত্রপাঠ্য ব্যাকরণবইগুলোকে। তিনি ব্যাকরণগুলোকে নিন্দাসূচক দুটি, *হাইলি* ও *মুগ্ধবোধ*, প্যাটেন্টে ভাগ ক'রে বলেন, 'এক প্যাটেন্টের গ্রন্থ খুলিলেই বর্ণের উচ্চারণস্থান ও নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়; অপর প্যাটেন্টের ব্যাকরণ খুলিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, শব্দসমূহ পাঁচ ভাগে বিভক্ত—বিশেষ্য বিশেষণ সর্বনাম ক্রিয়া অব্যয়। ক্রমে এক প্যাটেন্টে সংস্কৃত সূত্রগুলির তর্জমা, আর এক প্যাটেন্টে ইংরেজী রুলগুলির তর্জমা।...অনেকে আবার দুই প্যাটেন্ট মিশাইয়া এক প্রকার খিচুড়ী প্রস্তুত করেন। সে অতি উৎকৃষ্ট পদার্থ।' এখন বাজারে এ-'উৎকৃষ্ট পদার্থে'র নিকৃষ্টরূপই চলছে, এবং ছাত্ররা বাধ্য হয়ে খাচ্ছে ও রুগ্ন হচ্ছে।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'বাঙ্গলা ব্যাকরণ' (১৩০৮) নামের একটি অসাধারণ প্রবন্ধে প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণগুলোকে 'শিশুতোষ' আখ্যা দিয়ে এমন ব্যাপকগভীর ব্যাকরণের প্রস্তাব দেন, যে-ব্যাকরণকাঠামো তখনো পৃথিবীর কোনো প্রান্তে দেখা দেয় নি। তিনি বলেন, 'আমি যে-ব্যাকরণের কথা বলিতেছি, তাহার উদ্দেশ্য নিয়ম রচনা

AMARBOI.COM

নহে; নিয়ম প্রণয়ন নহে; নিয়ম আবিষ্কার।' ত্রিবেদী বিজ্ঞানী ছিলেন, তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন বিজ্ঞানসম্মত ব্যাকরণের; তা ছাত্রপাঠ্য নয়, ভাষাবিজ্ঞানীর ব্যাকরণ। ওই ব্যাকরণ অনুশাসন রচনা করে না, বিধিনিষেধ প্রচার করে না; তা উদঘাটন করে ভাষার আভ্যন্তর শৃঙ্খলা। ত্রিবেদী স্বপ্ন দেখেছিলেন বর্ণনামূলক ব্যাকরণের, তবে তা পরবর্তী কালের মার্কিন সাংগঠনিক বর্ণনামূলক ব্যাকরণ নয়, তা সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ। তখনো কেউ, পৃথিবীর কোনো প্রান্তে, সৃষ্টিশীল ব্যাকরণতত্ত্ব প্রস্তাব করেন নি; ওই ব্যাকরণের রূপ সম্পর্কে কারো কোনো ধারণা ছিলো না। ত্রিবেদীও শুধু স্বপ্ন দেখেছিলেন, কিন্তু ওই ব্যাকরণের কাঠামো কী হবে সে-সম্পর্কে কোনো ধারণা করতে পারেন নি তিনি; কোনো তত্ত্ব তিনি প্রস্তাব করেন নি। তবে তাঁর কিছু প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছিলেন অভিনবরূপে বর্ণনার অনুপুঙ্খতা। নবব্যাকরণবিদেরা বৈয়াকরণ ছিলেন না, তাঁরা প্রধানত ভাষাবিজ্ঞানীও ছিলেন না; তাই তাঁরা উদ্যোগ নেন নি বাঙলা ভাষার কোনো পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনার। তবে তাঁরা এমন কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন যেগুলোতে আবিষ্কৃত হয় বাঙলা ভাষার কিছু অদৃশ্য সূত্র। এক দশকের মতো সময় তাঁরা ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় নিয়োজিত থেকে ফিরে যান নিজ নিজ এলাকায়, এবং বাঙলা প্রথাগত ব্যাকরণের ধারা বইতে থাকে প্রথাগতভাবে।

বাঙলা ভাষা এখনো এক প্রায়-অচেনা মহাদেশের মতো। এর বিশাল এলাকার সামান্যই আমাদের জানা; আর যেটুকু জানা, তাও বিজ্ঞানসম্মতভাবে নয়। বাঙলা, প্রতিটি মানবভাষার মতোই, এক ব্যাপক-জটিল সংশ্রয়; তা কেউ একা বা এক দশকে সম্পূর্ণরূপে বর্ণনাবিশ্লেষণ করতে পারেন না। আর এর কোনো এলাকা কেউ একবার বর্ণনা করেছেন ব'লে ওই এলাকা যে আবার বা বারবার বর্ণনাবিশ্লেষণের বিষয় হ'তে পারবে না, তাও নয়; বরং বারবার বর্ণনাবিশ্লেষণেই তার সংগোপন সূত্র আবিষ্কৃত হ'তে পারে ঠিকভাবে। বাঙলা ভাষা, যে-কোনো প্রপঞ্চের মতোই, বর্ণিত হ'তে পারে বিভিন্ন তাত্ত্বিক কাঠামো ও পদ্ধতিতে। প্রথমে বিবেচনা করা যাক বাঙলা ভাষার অবয়ব। বাঙলার, প্রতিটি মানবভাষার মতোই, রয়েছে চারটি স্তর : আর্থস্তর, বাক্যস্তর, রূপস্তর, ও ধ্বনিস্তর। ভাষা প্রয়োগের সময় এ-চারটি স্তরকে মানুষ ব্যবহার করে একই সাথে; কিন্তু ভাষাবর্ণনার সময় এগুলোকে বর্ণনা করতে হয় পৃথকভাবে, এবং বিধান করতে হয় এগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য। প্রতিটি স্তরই ব্যাপক ও জটিল; কারো একার পক্ষে এক জীবনে একটি স্তরও অনপুঙ্খ বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

যে-কোনো ভাষার উল্লিখিত প্রতিটি স্তরের বর্ণনা ও শৃঙ্খলার সূত্র উদঘাটনের, অর্থাৎ ব্যাকরণ রচনার রয়েছে বিভিন্ন তাত্ত্বিক কাঠামো ও প্রণালিপদ্ধতি। প্রথাগত তাত্ত্বিক কাঠামোতে স্তরগুলো বর্ণনাবিশ্লেষণ করা যায় একভাবে, সাংগঠনিক বর্ণনামূলক কাঠামোতে আরেকভাবে, রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল তাত্ত্বিক কাঠামোতে আরেকভাবে। এ-বর্ণনাবিশ্লেষণ *কালকেন্দ্রিক* বা *সিনক্রোনিক*, অর্থাৎ বিশেষ এককালে ভাষাটি যে-অবস্থায় আছে, এটা তার বর্ণনা, বা ব্যাকরণ। এ-স্তরগুলো *ডায়াক্রোনিক* অর্থাৎ *কালানুক্রমিক*ভাবেও বর্ণনা করা যায়,-এবং রচনা করা যায় ভাষার ঐতিহাসিক ব্যাকরণ, বা ইতিহাস। ভাষার কালকেন্দ্রিক বর্ণনায় যে-তিনটি তাত্ত্বিক কাঠামো

প্রয়োগ করা যায়, সেগুলো সমান শক্তিশালী নয়; তাই সেগুলোর বর্ণনাও সমান যোগ্যতাসম্পন্ন নয়। প্রথাগত ব্যাকরণকাঠামোতে বাঙলা ভাষার চারটি স্তরের শৃঙ্খলা উদঘাটনের, অর্থাৎ বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ রচনার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে, যেমন চলছে তিন শতাব্দী ধ'রে। প্রথাগত ব্যাকরণকাঠামোতে বাঙলা ভাষার শব্দ বা রূপস্তরটি মোটামুটি বর্ণনা করা হয়েছে; তবে এ-বর্ণনা নানাভাবে ত্রুটিপূর্ণ, বিশৃঙ্খল; এবং এখন আর গ্রহণযোগ্য নয়। অন্য স্তর তিনটি, ধ্বনি, বাক্য, ও অর্থ, প্রথাগত কাঠামোতে ভালোভাবে বর্ণনা করাই অসম্ভব; কেননা এ-স্তর তিনটির শৃঙ্খলা উদঘাটনের জন্যে প্রথাগত ব্যাকরণবিদেরা কোনো শক্তিশালী তত্ত্ব ও প্রণালি উদ্ভাবন করেন নি। সাংগঠনিক বর্ণনামূলক কাঠামোতে মোটামুটিভাবে বর্ণনা করা যায় ভাষার ধ্বনি ও রূপস্তর; তবে গত কয়েক দশকে প্রমাণিত হয়েছে যে মার্কিন সাংগঠনিক বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান ছিলো তত্ত্ব ও পদ্ধতিগতভাবে ভ্রান্ত। সাংগঠনিক কাঠামোতে বাঙলা ভাষার ধ্বনিস্তরটি কিছুটা বর্ণনা করা হয়েছে। অন্য স্তরগুলো ভালোভাবে বর্ণনার শক্তিও সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের নেই; এখন কেউ সাংগঠনিক রীতিতে ভাষা বর্ণনা করে না। রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণকাঠামোতে উদঘাটিত হয়েছে বাঙলা বাক্যস্তরের এক ক্ষুদ্রাংশের সূত্র; আর অন্য স্তরগুলো সামান্যও বর্ণিত হয় নি। অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্বকালের প্রথাগত ব্যাকরণ, বিশশতকের ত্রিশচল্লিশের দশকের সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান, ও সাতান্নো-উত্তর রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ, এ-তিন ব্যাকরণকাঠামোর কোনোটি অবলম্বন ক'রেই বাঙলা ভাষা ব্যাপকভাবে বর্ণিত-বিশ্লেষিত হয় নি। তাই বলতে পারি যে বাঙলা ভাষার বিভিন্ন স্তর অবর্ণিতই রয়ে গেছে, বাঙলা ভাষার নিয়ম শৃঙ্খলার অধিকাংশই আজো অনুদঘাটিত। কালানুক্রমিকভাবেও বাঙলা ভাষার এ-স্তরগুলোর শৃঙ্খলা উদঘাটিতি হয় নি। এ-ই সব নয়; বর্ণনার অপেক্ষায় রয়েছে বাঙলা ভাষার আরো বহু এলাকা : বাঙলার মাসরূপ, আঞ্চলিক রূপ, সামাজিক রূপ, লেখ্যরূপ, লিপিপদ্ধতি ও আরো বহু এলাকা আছে বর্ণনার অপেক্ষায়।

বাঙলা ভাষার এতো এলাকার মধ্যে প্রথম দরকার তার সমকালীন অবস্থার শৃঙ্খলা উদঘাটন, অর্থাৎ তার ব্যাকরণ রচনা। 'ব্যাকরণ' শব্দটি পুরোনো ভারতে বোঝাতো শব্দবিদ্যা, বা শুদ্ধ শব্দের গঠনবিধি; পতঞ্জলি তাই 'ব্যাকরণ' শব্দের বদলে ব্যবহার করেছিলেন 'শব্দানুশাসন' নামটি। এখন 'ব্যাকরণ' শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক, এবং কখনো-কখনো বিভ্রান্তিকর। এক অর্থে 'ব্যাকরণ' হচ্ছে ভাষার শৃঙ্খলা; শুধু ভাষা কেনো, যে-কোনো প্রপঞ্চের আভ্যন্তর শৃঙ্খলাকেই ব্যাকরণ বলতে পারি। তাই বলতে পারি 'সমাজের ব্যাকরণ', 'রাজনীতির ব্যাকরণ', 'ব্যবসার ব্যাকরণ' ইত্যাদি। আরেক অর্থে 'ব্যাকরণ' হচ্ছে ওই শৃঙ্খলার বর্ণনা, বিবরণ, বিশ্লেষণ, সূত্র উদঘাটন, অর্থাৎ ব্যাকরণবই। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিলো 'ব্যাকরণ' সম্পর্কে; ওই ভাষাবিজ্ঞান এমন ধারণা তৈরি করেছিলো যেনো 'ব্যাকরণ' ও 'ভাষাবিজ্ঞান' ভিন্ন জিনিশ। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান এমন ধারণা তৈরি করেছিলো যে ভাষাবিজ্ঞানের কাজ ভাষার ধ্বনি, রূপ প্রভৃতি স্তর বর্ণনা করা, আর ব্যাকরণের কাজ অন্য কিছু। তবে ভাষার বিভিন্ন স্তরের বর্ণনা, সেগুলোর শৃঙ্খলা আবিষ্কার ও সামঞ্জস্য বিধান

ভাষাবিজ্ঞানের কাজ, অর্থাৎ ভাষাবিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে ভাষার ব্যাকরণ রচনা।

সব ভাষারই প্রচুর প্রথাগত ব্যাকরণ রচিত হয়েছে, কেননা এটাই ভাষাবর্ণনার প্রাচীনতম তত্ত্ব; এবং এর লক্ষ্য ভাষীদের কল্যাণসাধন। প্রথাগত ব্যাকরণে শুদ্ধতার ধারণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তব জীবনে শিক্ষিত মানুষকে অন্তত একটি ভাষার 'শুদ্ধ রূপ' ব্যবহার করতে—লিখতে, পড়তে, ও বলতে জানতে হয়; যে জানে না, সে সামাজিক জীবনে নানা সংকটের মুখোমুখি হয়। তাই প্রথাগত ব্যাকরণ কোনো ভাষা বিজ্ঞানসম্মতভাবে বর্ণনা করতে না পারলেও ভাষীদের ভাষিক শুদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন করে, ভাষার গৃহীত শুদ্ধ রূপটি আয়ত্ত করতে বাধ্য করে, এবং তার সামাজিক প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে। পৃথিবীর প্রধান ভাষাগুলোর অসাধারণ কিছু প্রথাগত ব্যাকরণ রচিত হয়েছে; যেমন ইংরেজি ভাষার গুরুত্বপূর্ণ প্রথাগত ব্যাকরণ লিখেছেন ইয়েসপারসেন (১৯২৭ : *A Modern English Grammar*), কারমে (১৯৩১ : *A Grammar of the English Language*), এবং সম্প্রতি কুইর্ক ও অন্যান্য (১৯৮৫ : *A Comprehensive Grammar of the English Language*)। বাঙলা ভাষার এ-মানের কোনো প্রথাগত ব্যাকরণ লেখা হয় নি, এমনকি সুনীতিকুমারের *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণও* (১৯৩৯) ওই মান অর্জন করতে পারে নি। বাঙলা প্রথাগত ব্যাকরণবিদেরা যে গুরুত্বপূর্ণ প্রথাগত ব্যাকরণও লিখতে পারেন নি, এর মূলে রয়েছে সামাজিক, জ্ঞানগত, ও তাত্ত্বিক কারণ। আমাদের সমাজ অত্যন্ত প্রথাগত, আমরা বিশ্বাস করি প্রথার পুনরাবৃত্তিতে, আমরা সাধারণত অভিনব কিছু সৃষ্টি করার সামাজিক প্রেরণা পাই না। বাঙালির জ্ঞানের জগতটি এ-কারণেই সীমাবদ্ধ, বেশ পঙ্গু; বাঙালি প্রধান জ্ঞানীরাও জ্ঞানের মৌলিক পথে বেশি হাঁটেন না, তাঁরা মৌলিক জ্ঞান সৃষ্টি করেন না। প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণের একটি কাঠামো উনিশশতকেই দাঁড়িয়ে যায়, এবং এরপর আর কেউ ওই ছক ভাঙার সাহস করেন নি; তাঁরা অনুকরণ করেছেন পূর্ববর্তীদের। তাই প্রথাগত ব্যাকরণ হয়ে উঠেছে পুনরাবৃত্তিজীর্ণ। এখন যাঁরা ছাত্রপাঠ্য প্রথাগত ব্যাকরণ লেখেন, তাঁরা লেখেন শিক্ষাবোর্ডের আদেশ অনুসারে; তাঁরা প্রায় সবাই প্রথাগত ব্যাকরণ সম্পর্কেও কোনো সুষ্ঠু ধারণা পোষণ করেন না। তাঁরা পূর্ববর্তীদের ব্যাকরণ আবার নিজের ভুল ভাষায় লেখেন ব্যবসায়িক কারণে, তাই এসব ব্যাকরণ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শোচনীয়রূপে মর্মস্পর্শী। প্রথাগত ব্যাকরণের ব্যর্থতার তাত্ত্বিক কারণও রয়েছে, তা হচ্ছে কোনো ভাষারই বিজ্ঞানসম্মতভাবে শৃঙ্খলা উদঘাটনের শক্তি এর নেই।

বাঙলা ব্যাকরণ রচনার একটি বড়ো সমস্যা হচ্ছে 'ব্যাকরণ' সম্পর্কে আমাদের ভুল ও বিভ্রান্তিকর পূর্বধারণা। বাঙলা ব্যাকরণ সম্পর্কে যখনি কোনো আলোচনা হয়, তখনি দেখা যায় সবাই ব্যাকরণ সম্পর্কে প্রায়-নিশ্চিত পূর্বধারণা পোষণ করেন; সবাই জানেন ব্যাকরণ কী, ব্যাকরণে কী থাকবে; সমস্যা শুধু এটুকু যে তাঁরা ওই ব্যাকরণ লিখে ওঠার অবকাশ পাচ্ছেন না। এক দশক আগে বাংলা একাডেমী আমাকে একটি বাঙলা ব্যাকরণ লিখে দিতে বললে আমি কয়েক খণ্ডে একটি বাঙলা ব্যাকরণ লেখার প্রস্তাব দিই। বাঙলা ভাষা সম্পর্কে এতো কী লেখার আছে ভেবে তাঁরা খুব বিস্মিত হন, এবং আমাকে অনুরোধ করেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ব্যাকরণটির মতো একটি ব্যাকরণ

লিখে দিতে। আমি তাঁদের জানাই অমন একটি ব্যাকরণ প্রকাশের ইচ্ছে থাকলে বাংলা একাডেমীর জন্যে শ্রেষ্ঠ কাজ হবে ওই ব্যাকরণটি পুনর্মুদ্রণ করা। এ-ঘটনাটি উল্লেখ করলাম এজন্যে যে এটা আমাদের বাঙলা ব্যাকরণ সম্পর্কে পূর্বধারণার চমৎকার পরিচয় দেয়, এবং নতুন ব্যাকরণ লেখার পথ রোধ করে। ব্যাকরণকে ভাষিক ধর্মগ্রন্থ মনে করাও এক সমস্যা; আমরা মনে করি ধর্মগ্রন্থ যেমন একটি ব্যাকরণও হবে একটি, এবং তার সব বিধি চিরন্তন। ভাষা স্থির উপাত্ত নয়, তাই ভাষার সূত্র বারবার উদঘাটন করা দরকার; অর্থাৎ একই ভাষার ব্যাকরণ লিখতে হবে দশকে দশকে।

বাঙলা ভাষার খাঁটি, গভীর, ব্যাপক, পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ লেখার কথা বলা হচ্ছে এক শতাব্দী ধ'রে, কিন্তু আজো ওই স্বপ্নের ব্যাকরণ রচিত হয় নি। এর কারণ এ নয় যে মেধাবী কেউ বা অনেকে ছিলেন না; এর কারণ অনেকেরই পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণের স্বপ্ন ছিলো, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ সম্পর্কে কারো সুষ্ঠু ধারণা ছিলো না। উনিশবিশশতকে বিভিন্ন ভাষার বড়ো বড়ো ব্যাকরণবই লেখা হয়েছে, তবে সেগুলোও পূর্ণাঙ্গ নয়। কারণ মানবভাষা বর্ণনাব্যাখ্যার, তার আভ্যন্তর শৃঙ্খলা উদঘাটনের উপযুক্ত তত্ত্ব তখনো দেখা দেয় নি। বাঙলা ভাষার পূর্ণাঙ্গ বা 'বর্ণনামূলক যোগ্যতাসম্পন্ন' কোনো ব্যাকরণ যে লেখা হয় নি, তার কারণ ওই ব্যাকরণের তাত্ত্বিক কাঠামো তখনো প্রস্তাবিত হয় নি। যে-ব্যাকরণ চাই, অথচ যার রূপ সম্পর্কে কোনো ধারণা গড়ে উঠতে পারি নি, যার তত্ত্ব উপস্থাপিত হয় নি, সে-ব্যাকরণ কিছুতেই লেখা সম্ভব নয়। সুষ্ঠু তত্ত্ব ছাড়া যেমন কোনো বিশ্বপ্রপঞ্চই ব্যাখ্যা করতে পারি না, তেমনি মানবভাষা সম্পর্কে সুষ্ঠু তত্ত্ব ছাড়া রচনা করতে পারি না বিশেষ ভাষার সুষ্ঠু ব্যাকরণ। তবে ১৯৫৭র পর ওই তাত্ত্বিক সংকট কেটে গেছে, চমস্কির প্রস্তাবিত রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণতত্ত্বে পাই সে-ব্যাকরণের রূপ, যার স্বপ্ন পৃথিবী ভ'রে অনেকে, এবং বাঙলায় রামেন্দ্রসুন্দর, দেখেছেন।

বাঙলা ভাষার যে-ব্যাপক গভীর ব্যাকরণের আমরা কথা ভাবছি, যার কথা ভেবেছেন নবব্যাকরণবিদেরা, তা প্রথাগত কাঠামোতে রচিত হ'তে পারে না; কেননা প্রথাগত ব্যাকরণের সে-শক্তি নেই। ওই ব্যাকরণ সাংগঠনিক বর্ণনামূলক কাঠামোতেও রচিত হ'তে পারে না; কারণ ভাষা সম্পর্কে কোনো সুষ্ঠু তত্ত্ব সৃষ্টি করতে পারে নি সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান। তবে গত ছ-দশকে যদি বাঙলা ভাষা সাংগঠনিক কাঠামোতে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হতো, তাহলে উপকার হতো; কিন্তু তা হয় নি, এবং এখন আর ওই কাঠামোতে ফিরে যাওয়া সুবুদ্ধির পরিচায়ক নয়। ভাষা সম্পর্কে সুষ্ঠু তত্ত্ব হচ্ছে চমস্কীয় রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণতত্ত্ব; গত তিন দশকে তাঁর তত্ত্বও নানাভাবে সংশোধিত হয়েছে। প্রস্তাবিত হয়েছে *কারক-ব্যাকরণ*, ও *সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্ব*। এখন চমস্কীয় সৃষ্টিশীলতার তত্ত্ব, কারক-ব্যাকরণ, ও সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্বের সমবায়ে এমন ব্যাকরণকাঠামো সৃষ্টি করা সম্ভব, যার সাহায্যে রচনা সম্ভব পূর্ণাঙ্গ, গভীর, বিস্তৃত বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ।

এ-সমবায়ী কাঠামোতে যদি আমরা বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ লিখতে চাই, এবং লেখা অত্যন্ত দরকার, তাহলে সে-ব্যাকরণের রূপ কী দাঁড়াবে, তার একটি রূপরেখা

পেশ করছি। এ-ব্যাকরণের থাকবে চারটি কক্ষ : আর্থ কক্ষ, বাক্য কক্ষ, রূপতাত্ত্বিক কক্ষ, ধ্বনিতাত্ত্বিক কক্ষ, অর্থাৎ এ-ব্যাকরণ উদঘাটন করবে বাঙলা ভাষার অর্থ, বাক্য, শব্দ, ও ধ্বনিশৃঙ্খলার সমস্ত সূত্র। আর্থ কক্ষের কাজ হবে বাঙলা ভাষার সমস্ত শব্দ, ও বাক্যের আর্থ শৃঙ্খলার সূত্র রচনা; বাক্য কক্ষের কাজ হবে বাঙলা ভাষার সমস্ত শুদ্ধ ও কেবল শুদ্ধ বাক্যের গঠনপ্রক্রিয়ার সূত্র রচনা; রূপতাত্ত্বিক কক্ষের কাজ হবে বাঙলা ভাষার সমস্ত শুদ্ধ শব্দের গঠনপ্রক্রিয়া উদঘাটন ও তার সূত্র রচনা; ধ্বনিতাত্ত্বিক কক্ষের কাজ হবে বাঙলা ধ্বনিশৃঙ্খলার সূত্র রচনা। বাঙলা ভাষার প্রতিটি স্তরে—আর্থ, বাক্য, রূপ, ধ্বনিস্তরে রয়েছে অজস্র প্রক্রিয়া; সেগুলোর সূত্রের সংখ্যাও বিপুল। কোনো একজন ভাষাবিজ্ঞানীর পক্ষে সমস্ত স্তরের সমস্ত প্রক্রিয়ার শৃঙ্খলা উদঘাটন সম্ভব নয়। এটা অসম্ভব শুধু বাস্তব বা শারীরিক কারণেই নয়, এটা অসম্ভব প্রধানত জ্ঞানগত কারণে। কোনো ভাষাবিজ্ঞানী ভাষার সমস্ত স্তর বর্ণনার জ্ঞানগত শক্তি রাখেন না। অর্থবিজ্ঞানী বর্ণনা করতে পারেন অর্থ, বাক্যবিজ্ঞানী বাক্য, রূপবিজ্ঞানী রূপ বা শব্দ, আর ধ্বনিবিজ্ঞানী বর্ণনা করতে পারেন ধ্বনিশৃঙ্খলা। তাই বাঙলা ব্যাকরণ রচনার জন্যে দরকার চারশ্রেণীর ভাষাবিজ্ঞানী।

বাঙলা ব্যাকরণের যে-চারটি স্তরের কথা বলেছি, তার মাঝে দুটি স্তরের বিচিত্র শৃঙ্খলার সূত্র উদঘাটন, আমার ধারণা, এখন সম্ভব নয়। এ-স্তর দুটি হচ্ছে আর্থ ও ধ্বনিস্তর। আমি যতোটা জানি রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্বে দক্ষ ভাষাবিজ্ঞানী বাঙলাদেশে এখনো তৈরি হন নি। এ-দুটি স্তর বর্ণনার জন্যে দক্ষ ভাষাবিজ্ঞানী তৈরি করা দরকার। যখন ওই স্তর দুটি বর্ণনার যোগ্যতাসম্পন্ন ভাষাবিজ্ঞানী তৈরি হবেন বাঙলাদেশে, তখন তাঁরা বর্ণনা করবেন ওই স্তর দুটির শৃঙ্খলা। এখন বাঙলা ভাষার ব্যাকরণের অন্য দুটি স্তর, বাক্য ও রূপ, বর্ণনার কাজ শুরু হ'তে পারে, কেননা এ-দুটি স্তর বর্ণনার যোগ্য ভাষাবিজ্ঞানী রয়েছেন; এবং এ-স্তর দুটিও যদি বর্ণিত হয়, তাহলেও বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ রচনার কাজ অর্ধেক সম্পন্ন হবে। প্রশ্ন ওঠা উচিত যে ওই ব্যাকরণে বাক্য ও রূপস্তরের কোন কোন শৃঙ্খলা বর্ণনা করা হবে? এর সহজ উত্তর হচ্ছে গবেষণা শুরু করার আগে ভাষাবিজ্ঞানীও জানেন না তিনি কী বর্ণনা করবেন। তবে বাক্যশৃঙ্খলা উদঘাটন করতে গেলে অবশ্যই প্রথম পেশ করতে হবে তাত্ত্বিক কাঠামো, এবং যেহেতু ব্যাকরণটি লেখা হবে রূপান্তরমূলক কারক-ব্যাকরণকাঠামোতে, তাই প্রমাণ করতে হবে কারক-ব্যাকরণের যোগ্যতা, বিশেষ ক'রে প্রমাণ করতে হবে কেনো এ-কাঠামো বাঙলা ভাষার জন্যে উপযুক্ততম। তারপর সম্ভবত আলোচিত হবে বিশেষ্যপদ, কারক, বিভক্তি বা কারকচিহ্ন, কর্তা, কর্ম, কর্তাক্রিয়ারূপের সঙ্গতি, সর্বনামীয়করণ, পারস্পরিক সর্বনামীকরণ, সম্বন্ধীকরণ, সম্পূরকীকরণ, নিষেধজ্ঞাপন, যৌগিকীকরণ, বিশেষ্যীকরণ, প্রশ্নকরণ, আদেশজ্ঞাপন, সম্বন্ধপদ, ও আরো বহু কিছু। রূপতাত্ত্বিক শৃঙ্খলা উদঘাটন করতে গেলে পেশ করতে হবে রূপতাত্ত্বিক কাঠামো, ব্যাখ্যা করতে হবে রূপ ও শব্দের সম্পর্ক-অসম্পর্ক, তারপর হয়তো বর্ণিত হবে সমাস বা যুগ্মীভবন, বিশেষ্যীভবন, বিশেষণীভবন, ক্রিয়াভবন, ক্রিয়াবিশেষণীভবন, উপসর্গ, ও আরো নানা শৃঙ্খলা।

AMARBOI.COM